সপ্তরথী

শংকর

সাহিত্যম্ ॥ ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৬৩
মাঘ ১৩৬৯

প্রকাশক
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান
নির্মল বুক এজেন্সি
২৪বি কলেজ রো
কলকাতা ৭০০ ০০৯

নির্মল পুস্তকালয়
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা
দিলীপ দে
লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্স
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক
প্রিন্টিং সেন্টার
১ ছিদাম মুদি লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

ইন্ডিয়া

"বাঙালি জাতটার কিসসু হবে না, স্যার। বেঙ্গলিদের টুয়েল্‌ভ-ও-ক্লক অনেক আগেই বেজে গিয়েছে।"

গণেশ গাঙ্গুলির এ-কথা বলবার অধিকার আছে, কারণ তিনি এই আপিসের লেবার অফিসার। লেবার কথাটা সমস্ত ইন্ডিয়ায় অশ্লীল হয়ে গিয়েছে, তাই গণেশ বাবুর খেতাব হয়েছে এইচ-আর-ডি-ও—মানবসম্পদ উন্নয়ন অফিসার, অর্থাৎ হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভলপমেন্ট অফিসার।

বাঙালিদের সম্বন্ধে খুব দুঃখ গণেশ গাঙ্গুলির মনে। "এত বড়ো পাজি জাত স্যার, এইচ-আর-ডিটা ঠিক রেখে নাম দিয়েছে হায়ার্ড রাস্কেলস্ ডিপার্টমেন্ট, যাকে বলা যায় কিনা ভাড়াটে রাস্কেলদের ডিপার্টনেন্ট। নতুন নামটা দিয়েছে কর্মচারী ইউনিয়নের পরিতোষ মিত্তির, পাজির পাঝাড়া বললে লোকটাকে কিছুই বলা হয় না, স্যার।"

"তা আপনি ওদের বোঝাবার চেষ্টা করেননি মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যাপারটা কি? এদেশে কেন এর বিশেষ প্রয়োজন?" এই অফিসের সায়েব কুমারেশ চ্যাটার্জি তাঁর মোটা ফ্রেমে বাঁধানো পুরু কাচের চশমার মধ্য দিয়ে তাকালেন গণেশ গাঙ্গুলির মুখে।

"সেই চেষ্টাই তো চালিয়ে যাচ্ছি স্যার, নিরন্তর। ওদের বলছি, কোম্পানি মানে এযুগে আর পয়সা বানাবার কল নয়। কোম্পানির হাতে আছে কয়েকটা সম্পদ—অর্থসম্পদ, জ্ঞানসম্পদ, যন্ত্রসম্পদ আর মানবসম্পদ। এই সীমিত সম্পদগুলোর পরিপূর্ণ ব্যবহার করে যে-বাড়তি সম্পদের সৃষ্টি হবে তা দেশের দশের কাজে লাগবে।"

সায়েব অর্থাৎ কুমারেশ চ্যাটার্জি বললেন, "খুব সোজা করে বলতে হবে, না-হলে আজকাল মানুষের মাথায় কিছু ঢুকতে চায় না।"

"আর কত সহজ করব স্যার? সহজ করতে-করতে একেবারে রামকৃষ্ণদেবের লেভেলে চলে এসেছি। বলেছি, অর্থ, জ্ঞান, যন্ত্র এসব যদি

মাছ মাংস তরিতরকারি হয় তা হলে এই মানবসম্পদ হল উনুন—শ্রমশক্তিতে সব কিছু ভেজে, সেদ্ধ করে, সাঁতলে বাজারে নিয়ে আসতে হবে, বাজার ইজ আওয়ার লাক্সমি!”

একটু ঢোঁক গিললেন গণেশ গাঙ্গুলি। “এত বড়ো আস্পর্ধা স্যার, পরিতোষ মিত্তির বলে কিনা তাহলে হাতধোবার জন্যে হপ্তায় দু'খানা লাক্স সাবান দিন প্রত্যেক এমপ্লয়িকে। আমরাই তো আপনাদের সম্পদ, আমাদের ভাঙিয়েই তো আপনারা নবাবী করছেন, মুনাফা লুটছেন।”

গণেশ গাঙ্গুলি চেষ্টা করেছিলেন বোঝাতে, লাক্সমি হচ্ছেন লক্ষ্মী, সম্পদের দেবী। লক্ষ্মীছাড়াদের এই দুনিয়ায় কিছু হবে না।

কুমারেশ একটু হেসে ফেলল। “কর্মীদের সঙ্গে যতখানি সম্ভব কম ইংরিজি বলা দরকার। স্থানীয় ভাষা অথবা হিন্দি খুব কাজে দেয়।”

“দেয়-না স্যার, এসপ্যারনটোতে কথা বললেও মধু থাকলে ওরা বুঝে নেবে। দিন না স্যার, জার্মান ভাষায় একটা সার্কুলার, আজ হাফ-হলিডে, আপিস যদি দশ মিনিটে খালি না হয়ে যায় তাহলে এই গণেশের নামে একটা কুকুর রাখবেন।”

জিভ কাটল কুমারেশ। “সিদ্ধিদাতা গণেশ, সাফল্যের দেবতা, তাঁর নামে কুকুর রাখবে কে?”

“আপনি না রাখলেও ওই নেতারা রাখবে। দেবদ্বিজে কারও এক-ড্রপার ভক্তি নেই। ফরেনে কে কবে ডজন-ডজন লোককে খুনখারাপি করে গদি অধিকার করেছিল তাদের ছবি টাঙিয়ে রাখছে আপিসে, ধূপধুনো দিচ্ছে।”

কুমারেশ আবার হাসল। দায়িত্ব না-থাকলেই মানুষ দায়িত্বহীন হয়ে পড়ে, কুমারেশের জীবনেই এর প্রমাণ আছে। দায়িত্ব জিনিসটা ভারী পেপারওয়েটের মতন, মানুষকে উড়তে বাধা দেয়। এই যাদের কথা বলছেন গণেশ গাঙ্গুলি, দায়িত্ব পেলে তারা কীরকম হয়ে যেত তা জানতে ইচ্ছে করে।

গণেশ গাঙ্গুলি বললেন, “অন্য ব্যাপারে এরা ভীষণ দায়িত্বশীল, স্যার। আপনি রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত সন্ধ্যার দায়িত্ব দিন, নাটক নামাতে বলুন, গেটমিটিংয়ের অনুরোধ করুন—একেবারে এ-ওয়ান, দুনিয়ার কোথাও

এদের প্রতিদ্বন্দ্বী পাবেন না।"

আবার হাসল কুমারেশ। গণেশ গাঙ্গুলি দুঃখ করলেন, "এগারোটা কাক মরলে একটা এইচ-আর-ডি-ও হয়। ওরা বলে, ওদের আমি কী করে ডেভেলপ করব স্যার? সম্পদের নাম করে কীসের ওপর যে পড়ে গিয়েছি! এই যখন আপনি ডাকলেন তখন নেতারা আমার ঘরে বসে কোম্পানির চা খেয়ে কোম্পানির অফিসারের সামনে কোম্পানির নিন্দে করছে। এখনও আবার বসে আছে, স্যার।"

কুমারেশ সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "আপনি ওদের সঙ্গে কথা সেরে আসুন। ইউনিয়ন মিটিং থেকে আধখেঁচড়া বেরিয়ে না-আসাই ভালো।"

গণেশ গাঙ্গুলি চলে গেলেন, আর কুমারেশ ভাবতে লাগল, সত্যিই কি বাঙালিদের কাজের মনোবৃত্তি কি চলে গিয়েছে না, অন্য কোথাও কোনো গোলমাল হচ্ছে? সমস্যাগুলো মানুষকে ঠিকমতন বোঝানো হচ্ছে না?

টেবিলে একটা কমপিউটার বসানো হয়েছে। যন্ত্রটার মনিটারের দিকে একটু তাকিয়ে নিল কুমারেশ, ঠিক যেন টি-ভি স্ক্রিন। এই স্ক্রিন এখন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে—বাড়িতে টেলিভিশন এবং কর্মক্ষেত্রে এই কমপিউটার নামক কাজ-ঘোড়া। ওয়ার্ক হর্স কথাটা অন্য জায়গা থেকে আমদানি করা হয়েছে, এদেশে ঠিক চলে না, বলা উচিত ছিল কাজের বলদ।

কুমারেশ একবার তার সাধের সঙ্গিনী কমপিউটার (পি. সি-র) কি বোর্ডের ওপর হাত বুলিয়ে নিল। টক্‌টক্ কয়েকটা বোতাম টিপল, স্ক্রিনে কীসব লেখা ফুটে উঠল। কিন্তু কমপিউটারও যেন এই সকালে কথা শুনতে চাইছে না, হুকুম তামিল না করে, জানাচ্ছে আপনার নির্দেশ আমার মগজে ঢুকছে না।

কর্মীদের ওপর রাগ করা যায়, কমপিউটারের ওপর রাগ করে লাভ নেই। কারণ ঠিক পথে সব আইন বাঁচিয়ে নির্দেশ না দিলে কমপিউটার কিছুতেই কথা শুনবে না। নিশ্চয় কুমারেশই কোনো ভুল করে বসেছে। মানুষ এই ব্যাপারে অনেক সহৃদয়। কুমারেশ তার সেক্রেটারিকে বলেছিল, রতন সেনগুপ্তকে দিন ফোনে। রতন সেনগুপ্ত কানপুরের, এখানে রতন বিশ্বাস। সেক্রেটারি কোনো কথা না-বলেই কুমারেশের ভুল সংশোধন

করে নিয়েছিলেন। কমপিউটার তা করবে না।

এরপর কফির হুকুম দিল কুমারেশ চ্যাটার্জি। কফির কাপে চামচ নাড়তে-নাড়তে কুমারেশ ভাবতে লাগল বাঙালিদের সম্বন্ধে। এ-জাতের কিসসু হবে না, হওয়া সম্ভব নয়। ইরাবতীকেও একদিন কুমারেশ এই কথা বলেছিল।

ইরাবতী অবশ্য একমত হয়নি। সে জিজ্ঞেস করেছিল, "দুনিয়ায় এত লোক থাকতে বাঙালিরা কী স্পেশাল দোষ করল?"

"দোষ দেখতে পাচ্ছ না তুমি, ছোট জায়গায় বসে আছ বলে, ইরা। বাঙালিরা আজকাল গতর নাড়তে চায় না। তুমি ক্যালকাটা পোর্টের দিকে, ক্যালকাটার গারবেজ বিনগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো।"

ইরাবতী তর্ক মন্দ করে না। নিজের ওপর ভরসা রেখে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, "ক্যালকাটা পোর্টের ওয়ার্কারদের সিংহভাগ কোন কোন রাজ্য থেকে এসেছে সেটা আগে বলো। কলকাতার সাফাই কাজে যারা চাকরি করছে তাদের ক'জনের মাতৃভাষা বাংলা তার হিসেব দাও।"

এই কথা কানে না-তুলেই কুমারেশ বলেছিল, "এত বড়ো যে পাটশিল্প তা কীভাবে ধ্বংস হয়ে গেল।"

"পাটের কারখানায় আমার মামা কাজ করতেন। আমি দিনের পর দিন ওঁর কোয়ার্টারে থেকেছি। ওখানে বাঙালি খুঁজে পাওয়া যায় না।" ইরাবতী বলতে চাইছে, "অন্য দেশের লোকেরা এখানে যেসব ভুল করে তার জন্যে দোষ চাপে বাঙালির ঘাড়ে।"

কিন্তু কর্মীরা যেখান থেকেই আসুক তাদের তাতায় এখানকার নেতারা। এদের দোষেই ভালো লোক খারাপ হয়ে যায় এ-কথা স্বীকার করতেই হবে ইরাবতীকে। কিন্তু ইরাবতী বাংলার বাইরে মানুষ হয়েছে, ফলে তার টান বাঙালিদের ওপর একটু বেশি। ইরাবতীর বক্তব্য, বাঙালিদের মধ্যে যেমন খারাপ লোক আছে তেমন ভালো লোকও আছে। জাত সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়ে কোনো লাভ নেই। বরং যারা ভালো কাজ করে তাদের আমরা খুঁজে বের করি না কেন? সম্মান করি না কেন?

আসলে গণেশ গাঙ্গুলিদের মতন লোকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে, যদি

মানবসম্পদের ওপরে কারও অবিশ্বাস এসে গিয়ে থাকে তা হলে সে কী করে মানবসম্পদের উন্নয়ন করবে?

এরপরও কথা বাড়ত হয়তো, কিন্তু ইরাবতীকে ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল। কুমারেশ আর দ্বিধা করেনি, ওকে কাছে টেনে নিয়ে একটু চুম্বন করেছিল। ইরাবতী বাধা দেয়নি, বরং একটু প্রশ্রয়ও ছিল তার দিক থেকে। বড় ব্রাইট মেয়েটি, এমন রমণীয় সান্নিধ্যে শুধু সেক্স থাকে না, বাড়তি কিছু একটা পাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেই বাড়তি ব্যাপারটা বড্ড ভালো লাগে।

বাড়তি ব্যাপারটার প্রসঙ্গে ইরাবতী একটু কৌতূহলী হয়েছিল। যে-অবস্থায় কুমারেশ ও ইরাবতী পড়েছে তার মধ্যে কোথাও ফাঁকি ছিল না, জোর-জবরদস্তি ছিল না, কেমন সহজভাবেই সব জেনেশুনেও ওদের সম্পর্কের ট্রলিটা নির্ধারিত রেল লাইন ধরে তরতর করে এগিয়ে গিয়েছে। সাগরপারে এমন কোনো সম্পর্ক হলে কেউ এ-নিয়ে মাথা ঘামাতো না। ওখানে অজস্র পুরুষ ও নারী স্বেচ্ছায় বিয়ের হাঙ্গামায় না-গিয়েও শয্যাসুখ ও সংসারসুখ উপভোগ করছে যার নাম লিভিং টুগেদার বা একত্র বসবাস।

এ-বিষয়ে খবরের কাগজের একটা কাটিং কুমারেশ উপহার দিয়েছিল ইরাবতীকে। ইরাবতী সেটা মন দিয়ে পড়েছিল। তারপর নিজেই বলেছিল, “একটা তফাত আছে, কুমারেশ। ওখানে অবিবাহিত অবস্থায় অথবা ডাইভোর্স নিয়ে যে-কোনো স্বাধীনতা ভোগ করা যায়, অন্য মানুষরা অপরের সম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু...’

এই কিন্তুটাই এখানে ছোটখাট ব্যাপার নয়। ইরাবতী বিবাহিতা, যদিও সে একলা থাকে।

ইরাবতীর মধ্যেও পরস্পর বিরোধিতা আছে। এমন আধুনিকা, এমন সহজ ভাবভঙ্গি, কুমারেশসান্নিধ্যে, বিয়ে ভাঙবার আবেদন আদালতে রয়েছে, কিন্তু এখনও সিঁথির কোণে ছোট্ট এবং সরু একটা সিঁদুরের দাগ রয়েছে। ইরাবতীর মাথাটা বুকের কাছে নিয়ে আদর করবার সময় তার কাছ থেকে চুম্বন ভিক্ষা করার সময় কুমারেশ সেই দাগটা নিয়ে বিব্রত বোধ করেছে!

ইরাবতী আদর প্রত্যাখ্যান করেনি, চুম্বনের অনুমতি দিয়েছে, অথচ এই

নিয়ে গদগদও হয়নি, যে যাকে পছন্দ করে তাদের সম্পর্কের স্বাভাবিক প্রকাশ ও পরিণতি বলে ধরে নিয়েছে। তারপর কুমারেশকে বলেছে, "বিয়েটা তো এখনও ভাঙেনি, কুমারেশ। কোর্টের একটা হুকুম দরকার হবে, তারপর মুছে যাবে ওই দাগটা।"

তারপর একটু কী ভেবে শ্যামাঙ্গিনী তন্বী সুদেহিনী ইরাবতী বলেছে, "আমাকে তো ঐ দাগ মুছতেও হবে না।" ইঙ্গিতে ইরাবতী বলতে চেয়েছে, তারপরেই তো তোমার সঙ্গে বিবাহ।

ইরাবতী বা কুমারেশ কারও স্মরণে ছিল না, ডাইভোর্সের পরের দিনই আবার বিয়ে করা যায় না। কিছুদিনের আইনগত অপেক্ষা প্রয়োজন হয়। ইরাবতী অবশ্য নিয়মকানুন নিয়ে মাথা ঘামাবে না, ডাইভোর্সের পরের মুহূর্ত থেকে কুমারেশকে স্বামী বলে মেনে নেবে। শ্রীরাধিকা এখন তো দিয়েছে কুমারেশকে কৃষ্ণের অধিকার।

সেদিন কুমারেশের ইচ্ছে ছিল ইরাবতীর নিবিড় উষ্ণ সান্নিধ্যেই আরও অনেক সময় কেটে যাক। দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসুক, বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা হোক, সন্ধ্যা হারিয়ে যাক গভীর রাতের বুকে। তারপর ভোর হোক, ইরাবতী তখন বিছানা ছেড়ে উঠে কুমারেশকে এককাপ চা করে দিক সম্পর্কটা সবরকমভাবে পাকা হয়ে উঠুক। তারপর মন চাইলে কুমারেশ ফিরে যাবে নিজের বাড়িতে।

কিন্তু ইরাবতী কিছুটা সাবধানী। তার সারাক্ষণের কাজের মেয়েটা এই ফ্ল্যাটেই থাকে। তাকে সে তো অন্যত্র রাত কাটাতে বলতে পারে না। আমার ওপর ভীষণ অনুগত, অ্যান্ড এ বেঙ্গলি ফ্রম বারাসাত। কমবয়সী মেয়ে, দিদিমণির নিবিড় সান্নিধ্যে কাউকে দেখলে ভীষণ ভয় পেয়ে যাবে।

বেশ, তাহলে কুমারেশের ফ্ল্যাটও রয়েছে, ছোট ফ্ল্যাট। কিন্তু সেখানে আবার কুমারেশের বৃদ্ধা মা বসবাস করছেন। কুমারেশ আধুনিক, কুমারেশ মাঝে-মাঝে স্মোক করে, সামাজিক ড্রিংক করে, প্রেম করে ইরাবতী মিশ্রর সঙ্গে, কিন্তু অপরের স্ত্রীকে বাড়িতে এনে একই-শয্যায় রাত্রিবাস, মায়ের ওপর ভীষণ এফেক্ট হতে পারে।

মতলব এঁটে মাকে একদিনের জন্যে মাসি অথবা পিসির বাড়িতে চালান করা যেতে পারে। তাতে নিঃসঙ্গ জননী হয়তো মানসিক সুখই পাবেন।

কিন্তু কুমারেশের ফ্ল্যাটটা একদম মধ্যবিত্ত বাঙালি কালচারের কেন্দ্রভূমি। গড নোজ শিক্ষিত বাঙালিরা এই মূল্যবোধ কোথা থেকে পেয়েছে এবং কেন তাকে আঁকড়ে ধরে আছে এতদিন ধরে। পড়শিরা যখন ঠাকুমার খোঁজ করতে এসে বাড়িতে ইরাবতীকে দেখবে কিংবা স্রেফ 'শুনবে' তখন ফলাফল আরও খারাপ হবে।

কোনো পড়শি বলবে না, কুমারেশ চ্যাটার্জি একজন বয়োপ্রাপ্ত পুরুষ, নিজের পরিশ্রমে নিজের রোজগারে সে এই ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে, ইরাবতী মিশ্র একজন গ্রোন-আপ মহিলা, তাঁকে জোর করা হয়নি, ভয় দেখানো হয়নি, মিথ্যা লোভ দেখানো হয়নি—স্রেফ কুমারেশের আমন্ত্রণেই সে চলে এসেছে এই ফ্ল্যাটে বন্ধুর সান্ধ্য সান্নিধ্য ও রাতের বিশ্রামের আশায়। কোথাও কোনো জোর থাকবে না, এমনকি ইরাবতী বেডরুমে একলা থাকবে কিনা সেটাও সে ঠিক করবে ডিনারের পরে—তার মনের ইচ্ছে, শরীরে ইচ্ছে সবকিছুই সম্মান করবার মতন সভ্যতা ও সংযম অবশ্যই রয়েছে কুমারেশ চ্যাটার্জির মধ্যে।

ইরাবতী তাকাচ্ছে কুমারেশের দিকে। "কী মশাই? চটে গেলে নাকি? বাঙালিরা গোল্লায় গিয়েছে তা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কোনোদিনই সম্ভব হবে না, তা হলে তো আমার প্রিয় একটি লোককেই ছোট করতে হয়। কাজে-কর্মে, চলনে-বলনে আমার হবু স্বামীর থেকে সেরা লোক কোথায় আছে?"

ইরাবতীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে রেখেছে কুমারেশ। এমন সুন্দর একটা অঙ্গকে অবহেলা করেছে এলাহাবাদের পীতাম্বর মিশ্র। ইরাবতীর আঙুলগুলো যে ঈশ্বরের শিল্পকর্ম তা পীতাম্বর মিশ্রের কি খেয়াল হয়নি? জানলে নিশ্চয় অনেক বেশি আদরযত্ন করত ইরাবতীকে। তাকে হাতের পাঁচ বলে ধরে নিত না। শুধু হাতের আঙুল নয়, ইরাবতীর সমস্ত শরীর, শুধু শরীর নয় ইরাবতীর শরীরের ভিতরের অশরীরী মানুষটা ঈশ্বরের শিল্পকর্ম, দুটোর মধ্যেই এমন কিছু আছে যা সর্বত্র সচরাচর খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাই সেবার ইরাবতী যখন পরিষ্কার জিজ্ঞেস করল তখন বিস্ময় অনুভব করল কুমারেশ। ইরাবতীর চমৎকার সোজাসুজি কথাবার্তা। কুমারেশ যে

মজেছে তা সে বুঝে নিয়েছে। নিজেও সে তৈরি। কিন্তু ইরাবতী তো অনূঢ়া কুমারী নয়, তার শরীরটা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তাই সে জিজ্ঞেস করেছিল। শরীরের বিস্ময় ও রহস্য যখন আর থাকবে না তখন কুমারেশের আরও কিছু অনুসন্ধানের থাকবে কি না?

ভীষণ প্লিজড্ হয়েছিল কুমারেশ সোজাসুজি এই প্রশ্নে। ইরাবতীর ঝকঝকে তকতকে শরীরটা সুন্দর কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড, কিন্তু ওর মনটা চিরসুন্দর, ওখানে এতদিন প্রেম তেমন প্রবেশ করেনি। ইরাবতীকে—টু-ইন-ওয়ান ইরাবতীকেই খুঁজে পেতে চাইছে কুমারেশ।

এলাহাবাদে মানুষ হয়ে, দিল্লি এবং কলকাতায় ঘরসংসার ও কাজকর্ম করেও ইরাবতী প্রকৃত অর্থে আধুনিকা। বিয়ে করেছে, কিন্তু ভরণপোষণের বদলে শরীরটাকে ভর্তার কাছে বন্ধক রাখবার জন্য নয়। মনের মধ্যে কোনো একটা বুদবুদ এতদিন লুকিয়ে ছিল। আচমকা এই কুমারেশের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সেই বাব্‌লটা বুদবুদের ধর্ম অনুযায়ী উপরে উঠে এসেছে। ইরাবতীর কোনো হাত ছিল না। যথাসময়ে কুমারেশ চ্যাটার্জির চোখে সেই বুদবুদ ধরা পড়েছে, সে কাছে এসেছে কিছুক্ষণের জন্যে। ব্যাঙ্গালোরের সেই হোটেলে পরিণতিটা ঘটল। পরিণতি কথাটা যদি একটু বেশি হয়ে যায় তা হলে বলা চলে ব্যাঙ্গালোরে আবিষ্কার, দ্য ডিসকভারি অফ ইরাবতী অ্যান্ড কুমারেশ।

ব্যাপারটা দুনিয়ার চোখে খুবই সহজ ও সাধারণ। হোটেলের ২১১ নম্বর ঘর নিয়েছিল কুমারেশ চ্যাটার্জি—জি পি এস অ্যান্ড কোম্পানির কলকাতা অফিসের সায়েব। সেই কোম্পানির ট্রাভেল এজেন্সির কাজ করেছে হেলেনিক ট্র্যাভেলস—ইরাবতী যার কর্মী। বড় অফিস নয় জি পি এস আন্ড কোম্পানির, তবু বেশ কয়েকবার কর্মসূত্রে দেখা হয়েছে ইরাবতীর সঙ্গে, কানপুর থেকে কুমারেশ কলকাতায় বদলি হয়ে আসবার পরে। তারপর কোথায় কী করে যে ইরাবতীর বুদবুদটা কুমারেশের নজরে পড়ে গেল।

আরও বেশ কিছুদিন পরে, বসন্তের ব্যাঙ্গালোরে দেখা, একটু আকস্মিকভাবেই। কুমারেশ এসেছে কোম্পানির কাজে আর ইরাবতী এসেছে ট্রাভেল কনফারেন্সে। যখন দেখা হবার তখন এইভাবেই দেখা

হয়ে যায়।

ব্যাপারটা যখন একটু গড়িয়েছে তখনই কুমারেশ একদিন ইরাবতীকে রিকোয়েস্ট করে বলেছিল, "প্রিজ বন্ধুত্বের একটা প্রাইসট্যাগ আছে। একটু দাম দিতেই হবে। আমাদের অফিসের ট্রাভেলের কাজে তোমার যোগাযোগটা না থাকলেই ভালো হয়। লোকে তাহলে ভুল বুঝবার অবকাশ পাবে না।"

ইরাবতী সোজা ছাঁচের মেয়ে, ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছিল। বাঙালিরা কেচ্ছা বানাবার জন্যে ছুঁকছুঁক করছে। কোনো একটা সুযোগ পেলেই হলো। ইরাবতী কিন্তু কুমারেশকে আরো অবাক করে দিয়েছিল। কুমারেশের অনুরোধ ছিল, হেলেনিক ট্রাভেলসের অন্য কেউ তাদের অফিসের অ্যাকাউন্টটা হ্যান্ডল করুক। ইরাবতী বলেছিল, কুমারেশের কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়ের সম্পর্কটাই সে রাখবে না। কিছু আর্থিক ক্ষতি হবে, কিন্তু হোক—ইরাবতী অন্য কোনোভাবে উসুল করে নেবে।

তারও কিছুদিন পরে এই দেখা ব্যাঙ্গালোরে। ভাগ্যচক্র বলা যেতে পারে। একই ফ্লোরে ২৪১ নম্বর ঘরে উঠেছে মিসেস ইরাবতী মিশ্র। দু'জনের দেখা হলো হোটেলের লিফ্‌টে। দু'জনেই চাবিটা এমনভাবে ধরেছে যাতে পরস্পরের চাবির নম্বরটা দেখা যায়।

তারপরেও দ্বিধা ছিল। চমৎকার ভব্যতা দেখিয়েছে কুমারেশ। নিজে হুড়মুড় করে নক করেনি ২৪১ নম্বরে। দু'জনে অবশেষে দেখা হয়েছে লাউঞ্জে। কুমারেশ বলেছে, তার ঘরের নম্বর। আর বিনিময়ে ইরাবতী দিয়েছে তার ঘরের নম্বর, সেই সঙ্গে ফোন করার অগ্রিম অনুমতি।

এরপর কুমারেশ ফোন করেছে। জিজ্ঞেস করেছে, "কোথায় চা খাবেন? চব্বিশ ঘণ্টার কফি শপে?" ইরাবতী ব্যাপারটা কুমারেশের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। "যেখানে বলবেন, কোনো জায়গাতেই আপত্তি নেই।"

তারপর কুমারেশের ঘর। দরজা সামান্য খোলা রেখেই কুমারেশ আপ্যায়ন করেছে তার মহিলা অতিথিকে। কিন্তু হোস্টের সৌজন্যসীমা অতিক্রম করেনি কুমারেশ, যদিও ওর চোখেও একটা রঙিন বুদবুদ আবিষ্কার করেছিল ইরাবতী মিশ্র। কুমারেশ বুঝিয়ে দিয়েছে সে কিছুতেই ভব্যতার সীমা অতিক্রম করবে না। তবে সে ফোন করবে নিশ্চয়ই।

একটু পরেই ফোন এসেছে ২৪১ নম্বর ঘরে। কুমারেশ খোঁজ করছে, নিজের ঘরে নিরাপদে পৌঁছেছে কিনা ইরাবতী।

"কী রকম আছেন?" জিজ্ঞেস করেছে ইরাবতী।

"ভালো ছিলাম একটু আগে কিন্তু এখন নেই", উত্তর দিয়েছে কুমারেশ।

"তা হলে চলে আসুন, আর এক কাপ কফির জন্যে," মোহময় আহ্বান জানিয়েছে ইরাবতী।

তারপরেই ব্যাপারটা দ্রুত এগিয়ে গিয়েছে। কলকাতায় যে-বরফ একটু-একটু করে জমছিল তাই আচমকা গলতে আরম্ভ করেছে।

অবশেষে শরীর ও মনের কথা উঠেছে। ইরাবতী সোজা মানুষ। কুমারেশ নিতান্ত কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তার শরীরের সন্ধান করলে সে আপত্তি জানাবে না। কিন্তু মনের সঙ্গে সম্পর্কটা ভীষণ দরকারি—কয়েক বছরের বিবাহিত জীবনের প্রয়োজন হয়েছে ইরাবতীর এই সামান্য সত্যটুকু আবিষ্কার করতে যে মনের আঠা ছাড়া দুটো শরীরের দীর্ঘস্থায়ী জোড় হয় না। সেক্স যেমন কাছে টানে তেমন কিছুক্ষণ পরেই পরস্পরকে ছিটকে সরিয়ে দেয়।

কুমারেশ অস্বীকার করবে না সেইদিনই সে প্রথম ইরাবতীর নরম শরীর স্পর্শ করেছে। চরমতম অভিজ্ঞতার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠে সে কিন্তু নিজেকে ছোট করেনি। ইরাবতী কৃতজ্ঞতা বোধ করেছে। কুমারেশ তার খুব কাছে চলে এসেছে তার ধৈর্যের জন্যে। কুমারেশকে সে আবিষ্কার করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে এবং আশা করেছে সেও এবার বুঝে নিক ইরাবতীকে।

এসব তো আগেকার কথা। তারপর ঘটনা অনেকদূর গড়িয়েছে। ডাইভোর্সের জন্য ইরাবতী আবেদন করেছে আদালতে। ইরাবতী উঠে এসেছে তার নিজস্ব ফ্ল্যাটে। আইনকানুনের হাঙ্গামা মিটল বলে।

মাঝে-মাঝে ওখানে চলে আসে কুমারেশ। আজকাল সঙ্গলিপ্সা প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে, কিন্তু উপায় নেই।

ইরাবতীকে একদিন দুপুরে নিজের ফ্ল্যাটেও নিয়ে গিয়েছে কুমারেশ। মাকে তেমন কিছু বলা হয়নি। মা তো চাইছেন, কুমারেশ ঘরসংসার করুক।

যা কাজকর্মে খাটুনি, একটা কাছের মানুষ দরকার। বউমা আসুক, সন্তান আসুক। ইরাবতীর মতন মেয়ে অবশ্যই মায়ের পছন্দ, কিন্তু মা তো আসল ব্যাপারটা জানে না। প্রথম পক্ষের স্বামী, ডাইভোর্সের আবেদন, এসব শুনলে তো কথাই নেই।

মিসেস মিশ্র বলেই ইরাবতীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে কুমারেশ। অতিথিকে মা চা খাইয়েছেন, তারপর যখন কুমারেশ একটু ভিতরে গিয়েছে তখন বলেছে, "দেখো না একটা ভালো মেয়ে আমার এই ছেলের জন্যে।"

"কেমন মেয়ে পছন্দ?" জিজ্ঞেস করেছে ইরাবতী।

"এই তোমারই মতন। রঙ আর-একটু ফর্সা হলে আরও ভালো। গড়ন-পিটন ভালো পাওয়া খুব শক্ত হয়ে উঠছে, মা," কুমারেশের মা বলেছিলেন।

এই নিয়ে পরে দু'জনের মধ্যে খুব হাসাহাসি হয়েছিল। ইরাবতী তার প্রিয়কে আলিঙ্গনে আবদ্ধ রেখেই বলেছিল, "গড়ন-পিঠন তো চলে যাবে, কিন্তু রঙ?"

কুমারেশ জানে ব্যাপারটা। "আমার এক দিদি ছিল, ভীষণ সুন্দরী। মা সেই কথা কিছুতেই ভুলতে পারেন না।"

ইরাবতী এবার কুমারেশের আদর ও আলিঙ্গন গ্রহণ করতে-করতে বলেছিল, "ছেলে যে ডুবে-ডুবে কী করছে মা তো জানেন না। একে কালো মেয়ে, তার ওপর সেকেন্ডহ্যান্ড—মা যখন শুনবেন!"

কুমারেশ তর্ক করার চেষ্টা করেনি, ইরাবতীকে আলিঙ্গন ও আদরের মধ্য দিয়েই তার উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে।

এই যে সব বিবাহবহির্ভূত অভিজ্ঞতা তার জন্যে বিন্দুমাত্র দ্বন্দ্ব নেই ইরাবতীর মনে। কুমারেশকে এই অবস্থায় দেখলে কত লোক বলবে, বাঙালির ছেলে গোল্লায় গিয়েছে, পরস্ত্রীর সঙ্গে কেচ্ছা করছে। কিন্তু পীতাম্বর মিশ্রজীর ভিতরের কথা তারা তো জানে না। দিল্লিতে অ্যাফেয়ার করেছে, কলকাতায় করেছে, একটুও দয়ামায়া নেই মানুষটার মনে। অনেক সহ্য করার পরেই-না ইরাবতীর বিরক্তির বাঁধ ভেঙেছে। লোকটার সঙ্গে আইনের সম্পর্ক শেষ হলে বাঁচে ইরাবতী। এদেশে সব কিছুতেই বড্ড সময় লাগে—বিয়ে হতেও লাখ কথা, বিয়ে ভাঙতে অন্তত দশলাখ কথা।

আর ইতিমধ্যে এই ভয়ে-ভয়ে অনিয়মে থাকা। এক রাত্রে শরীরটা খারাপ হলে কাছাকাছি কেউ নেই। একটা নিজের মানুষ কাছাকাছি না হলে চলে?

ইরাবতী একদিন বলেছিল কুমারেশকে, "শরীর ও মন দুটো দিয়েই ভগবান একালের মেয়েদের বিপদে ফেলেছেন।" দুটোকে একসঙ্গে বুঝে এদেশের পুরুষ মানুষরা এখনও চলতে শিখছে না।

কুমারেশ সেদিন একটা ককটেল থেকে ফেরার পথে ইরাবতীর ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। বলেছিল, "মনকে যে চুমু খাওয়া যায় না, ইরা।"

কে বললে যায় না? এই তো কুমারেশ ক্ষণে-ক্ষণে ইরাবতীর বাহির ও অন্তর দুই স্পর্শ করে চলেছে অবলীলাক্রমে যা ওই পীতাম্বরজীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। মনের দরজা দিয়ে শরীরে ঢোকা যায়, কিন্তু শরীরের দরজা দিয়ে জোর করে মনে ঢুকতে গেলে বিপর্যয় ঘটে যায়। একথা লোকটা বুঝত না। পীতাম্বর তাই ধরে নিয়েছে, কুমারেশ তার দেহ দিয়েই স্বামীস্ত্রীর জতুগৃহে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

ইরাবতীর কথা যখন মনে হলো তখন একবার তাকে ফোন করা যাক। এই সময়টা ফোনের পক্ষে সুবিধেজনক—কুমারেশের লেডি সেক্রেটারি একটু বেরিয়েছে অনুমতি নিয়ে।

ইরাবতীর বাড়িতে ফোন নেই, তাই অফিসেই কথাবার্তা হয়। ইরাবতী নিশ্চয় খুব চিন্তা করেছে গতকাল। অফিস থেকে সোজা ওর ওখানে যাবার কথা ছিল।

"যাব কি? ইরা, অফিসের মিটিং শেষ হতেই চায় না।" বেরুবার জন্যে সত্যিই ছটফট করেছে কুমারেশ, কিন্তু বেরুবার উপায় ছিল না। যখন মিটিং শেষ হয়েছে তখন রাত ন'টা, তারপর ইরাবতীর ফ্ল্যাটে পৌঁছতে লাগত আরও চল্লিশ মিনিট। রাত ন'টা চল্লিশ মিনিটে নিঃসঙ্গ অনাত্মীয়া মহিলার ফ্ল্যাটে যাওয়ার বিপদ থাকতে পারে।

ইরাবতী অবুঝ নয়। চিন্তা হয়েছে, একটু দুঃখও পেয়েছে। বলেছে, "আমাকে একটা ফোন নিতেই হবে বাড়িতে, যার নম্বর শুধুমাত্র তুমি জানবে।"

"খু-উ-ব ভালো হয়, ইরা।"

"এলে না কেন রাত পৌনে-দশটায়?"

"তোমার অসুবিধের কথা ভেবে, ইরা।"

"আর ভালো লাগে না, এইভাবে। কবে যে তুমি আসবে গটগট করে, আর ফিরবে না রাত্রে।"

"সত্যি, আর ভালো লাগে না। আমার মন বন্দি রয়েছে তোমার ভ্যানিটি ব্যাগে, আর শরীর রয়েছে এই কর্মস্থলে।"

"ভ্যানিটি ব্যাগে বন্দি করে তোমায় কখনও রাখব না। তুমি থাকবে আমার সর্বত্র পারফিউমের মতন। বাই দ্য বাই, তুমি যে পারফিউমটা দিয়েছো, কী অদ্ভুত। ফরাসি পারফিউমের যে 'সংসার' নাম হতে পারে ভাবিনি। এত দামী পারফিউম তুমি কিনবে না।"

মন দিয়ে সংসার করবার জন্যে ইরাবতী ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ইরাবতী প্রশ্ন করছে না, কিন্তু কুমারেশ বুঝছে তার আজ যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু একটা ককটেল মিটিং আছে। "নিমন্ত্রণকার্ডে লোকটা ভুল করে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস লিখেছে।"

"যাবে নাকি ইরাবতী?"

ইরাবতীর তো ইচ্ছে করে, এমন হিরের টুকরো পুরুষমানুষের সঙ্গে ককটেলে যাবার জন্যেই তো ইরাবতীকে বিশ্ব সংসারে পাঠিয়েছেন ভগবান।

কুমারেশের মনে পড়ল উকিলের কথা। উকিল বলেছে, এখন প্রকাশ্যে ওঁর সঙ্গে অবশ্যই ঘুরে বেড়াবেন না। মামলায় জটিলতা আসতে পারে।

ইরাবতী বলল, "কী হিপোক্রিট এই সোসাইটি। আমার বেহেড স্বামীটি এতদিন ধরে বিভিন্ন মেয়ে নিয়ে বেলেল্লাপনা করল, কেউ কিছু কথা তুলল না। আর আমি যাকে স্বামী নির্বাচন করে বসে আছি তার সঙ্গে বেরনো বারণ।"

"জানো কুমারেশ, এই পীতাম্বরের কাণ্ড। একবার এয়ারপোর্টের কাছে এক হোটেলে একটা টোটালি আননোন মেয়ের সঙ্গে...।"

"ওসব মনে রাখতে নেই, ইরাবতী। উকিল চাইছেন মামলাটা ভালোয়-ভালোয় হয়ে যাক, তৃতীয় কোনো পক্ষ থাকলে...।"

"আমি কিছু বুঝতে পারি না কুমারেশ এই ইন্ডিয়ায় ব্যাপার-স্যাপার। তুমি ও আমি চুপিচুপি ঘরে বসে থাকলে আপত্তি নেই, যত আপত্তি এই মিস্টার অ্যান্ড মিসেস হয়ে পার্টিতে গেলে।"

ককটেল শেষ করে ইরাবতীর বাড়িতে ওখানে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। দু'জনের দিকে মিনিট কয়েক তাকাতে-তাকাতেই ঘড়ির কাঁটা নিষিদ্ধ সীমানায় ঢুকে পড়বে। আর বাড়ির ওই সারাক্ষণের কাজের মেয়েটি চোখ রগড়াতে-রগড়াতে কী ভেবে বসবে।

"ওকে তাড়িয়ে দাও ইরাবতী। সারাক্ষণ একটা আজেবাজে দূরত্ব আমাদের মধ্যে রেখে দেওয়ার কোনো মানে হয় না।"

"দু'দিন বাদে ওই মেয়েটা তোমাকে জামাইবাবু বলে ডাকবে, হাঙ্গামাগুলো চুকে গেলেই। তখন ভীষণ কাজে লাগবে মেয়েটা। তোমার, আমার এবং তোমার মায়ের।"

মায়ের কথাটা এখনও জোর করে বলতে পারছে না কুমারেশ। একজনের বিয়ে-করা বউকে ছেলে আবার বিয়ে করলে কী যে তাঁর মনোভাব হবে তা আন্দাজ করা শক্ত। মেয়ের ব্যাপারে ভীষণ ভুগেছে মা।

তা হলে ককটেলের আগেই যেতে হয় ইরাবতীর কাছে। ইরাবতী অফিস থেকে একটু আগেই টুক করে কেটে পড়বে কুমারেশকে রিসিভ করবার জন্যে। ইরাবতী শুনেছে ককটেল আছে তার পরেই। সে বলল, "আজ তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব। এসো কিন্তু।"

"কিন্তু ওই মেয়েটা?"

"মেয়েটা ওই সময় কোথায় যাবে? কিন্তু না বলে ও কখনও আমার বেডরুমে ঢুকবে না, এমনই ট্রেনিং, তোমার কোনো অসুবিধে হবে না।"

টেলিফোন নামিয়ে অফিসের ফাইল পড়তে শুরু করল কুমারেশ। ইন্টারনাল অডিটের গোপন ফাইল।

ঠিক এগারোটায় দরজায় নক করে সুরজিৎ সরকার ঘরে ঢুকে পড়ল। সুরজিৎ ক'দিন এখানে ঘরোয়া অডিট করছে।

সুরজিৎ বলল, "আমরা ছিলাম ইনোজ ফ্রুট সল্ট। পুরনো দিনে বিজ্ঞাপন বেরোত, ভিতরকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে—ফর ইনারক্লিনলিনেস।"

মুখের দিকে তাকাল কুমারেশ। "এখন?"

"এখন মিস্টার চ্যাটার্জি, মানুষের ভিতরটা এত ময়লা হয়ে গিয়েছে যে সল্ট খাইয়ে পরিষ্কার রাখা অসম্ভব। এখন এই অডিটররা হলো ডিটেকটিভ, কাম সিক্রেট এজেন্ট, কাম ম্যানেজার। আমেরিকায় ইতিমধ্যেই থ্রিলার লেখা হচ্ছে এই অডিটরের দৃষ্টিকোণ থেকে।"

"এখানেও তো লেখা যেতে পারে, আপনার মতন ব্রাইট লোক রয়েছেন।"

"এখানে লেখা চলত কিন্তু মুশকিল হলো, ছিঁচকে চোর ধরবার জন্যে আমরা রয়েছি যাতে বড় চোর ডিস্টার্বড না হয়। এখানে বলা চলতে পারে 'চোরের মধ্যে চোর'—অথবা দৈত্যের মাথায় উকুন।"

কুমারেশ ওকে বেশি প্রশ্রয় দিল না। বলল, "তা হলে কাজ আরম্ভ করে দেওয়া যাক।"

সুরজিৎ বলল, "বাঙালিদের আর পদার্থ বলতে কিছু নেই মিস্টার চ্যাটার্জি। আগে বাঙালিদের মধ্যে জন্মেছেন রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, এটসেটরা।"

"এটসেটরা বলে কোনো বাঙালির নাম তো শুনিনি!"

"আপনি আর হাসাবেন না। সমস্ত বাঙালি জাতটাই এখন এটসেটরা ইত্যাদির মধ্যে পড়ে গিয়েছে। আর এটসেটরার মধ্যে জন্ম নিচ্ছে, অপদার্থ, কুঁড়ে, বাক্‌সর্বস্ব বাঙালি। তারাও সৎ নয়। অপদার্থতা ও অসততা হলো ডায়াবিটিশ ব্লাডপ্রেসার কম্বিনেশন।"

নিমাই মাইতির কেসটা রয়েছে প্রথমে। অফিসের টি-বয়—একটা ঘরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সারাদিন চা তৈরি করে কর্মীদের জন্যে এবং অতিথিদের জন্যে।

"চুরি করে ফাঁক করে দিয়েছে, মিস্টার চ্যাটার্জি। কনডেন্সড্ মিল্কের নেশা করে ফেলেছে, আধা টিন ওই জিনিস খেয়ে ফেলে। তা শুধু খাওয়া নয়। চা নয় তো—গঙ্গাজল বলে এর থেকে আমি ভালো আছি। যত কাপ চা আর যত চা-পাতা লাগে তার কোরিলেশন খুঁজে পাচ্ছি না।"

নেকস্‌ট কেস, কেরানি সত্যেন বোস। "এমন শ্রদ্ধেয় নামটা একেবারে খারাপ করে দিল। মিথ্যে ওভারটাইম বিল করেছে সত্যেন। অফিসে

থেকেছে আধঘণ্টা লিখেছে আড়াইঘণ্টা। আমি নিজে ওকে ক্যাচ করেছি। যদি কেস করতে হয় তার জন্যে প্রমাণ রেখেছি, কখন আমাদের আচার্য সত্যেন বোসটি আপিস থেকে বেরিয়েছে। হেভি লস, ভেরি হেভি লস, টু দ্য কোম্পানি।"

রামকৃষ্ণ হাজরা ক্লার্ক। "অফিসের কাজে সেকেন্ড ক্লাশের ট্রামে ভ্রমণ করে ট্যাক্সির বিল ধরিয়ে দিয়েছে আপিসে। এই শহরে যত ট্যাক্সি বিল হচ্ছে সবাই যদি ট্যাক্সি চড়তো তা হলে দশগুণ ট্যাক্সি লাগত।"

"কীসব নাম বাপ-মায়েরা দিয়েছিলেন এবং কী কাজকর্ম দেখুন, মিস্টার চ্যাটার্জি। হাতে হাতে শাস্তি দেবার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। মিস্টার গণেশ গাঙ্গুলি বলছিলেন, একটা আদর্শ স্থাপন করার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। সেই সঙ্গে যদি কিছু লোক হাল্কা হয়ে যায় মন্দ কী?"

এখনই কোনো অর্ডার দিচ্ছে না কুমারেশ। সুরজিৎ সরকারের সঙ্গে অন্য কথাও আছে। কিছু টাকা রাজনৈতিক পার্টি তহবিলে দেওয়ার কথা, সেটা কীভাবে ম্যানেজ করা যায়? সুরজিৎ সরকার তুখোড় ছেলে, বললে, "কোনো চিন্তা নেই, যত টাকা বলবেন, ফল্‌স ভাউচার করে তুলে দেব। ম্যানেজমেন্টের জন্য টাকা বের করে নেবার ব্যাপারে আমি স্পেশালিস্ট হয়ে গিয়েছি, মিস্টার চ্যাটার্জি।"

নিমাই, সত্যেন, রামকৃষ্ণ। তিনটি নাম আওড়াচ্ছে কুমারেশ। এরা ভীষণ দায়িত্বহীন। এরা কেন বোঝে না, অন্যায়ের পথ ধরে আমরা নতুন শতাব্দীতে পৌঁছতে পারব না। কমপিটিশনের যুগ, কোম্পানির কোথাও ফুটো থাকলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব হবে না।

সেক্রেটারি সুনীতা রাও ফিরে এসেছে। কুমারেশ ভাবছে এই নিমাই মাইতি ছেলেটি কী ভীষণ দায়িত্বজ্ঞানহীন।

কিন্তু সুনীতা খবর দিল, এই নিমাই তো কিছুদিন আগে বোনকে একটা কিডনি দিয়ে এসেছে। কাউকে কিছু বলা নেই কওয়া নেই, কয়েক সপ্তাহ ছুটি নিয়ে ভেলোরে চলে গেল, ফিরে এলো কিডনি দিয়ে! ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়। বলল, মায়ের পেটের বোন, তাকে তো বাঁচাতে হবেই।

গণেশ গাঙ্গুলি মন্তব্য করলেন, "বোকা। ইন্ডিয়ার জন্যে আরও সমস্যা তৈরি করা, স্যার। এই বোনকে আমি দেখেছি—রোগা কুড়কুড়ে, ট্যারা।

প্রাণে না হয় বাঁচল কিন্তু ওকে কে বিয়ে করবে বলুন তো? মাঝখান থেকে এই নিমাইটার শরীর খাবলে গেল। ঠিক মতো ভেবে দেখলে বোকামি ছাড়া কিছুই বলা যায় না।"

"সত্যেন বোস! কোথায় বৈজ্ঞানিক সত্যেন আর কোথায় কেরানি সত্যেন! ফলস্ ও-টির সময় এত বুদ্ধি, কিন্তু অন্য সময় মাথায় গোবর। মাকে চিকিৎসার জন্যে নার্সিংহোমে দিয়েছিল। কেন রে বাপু? এতসব সরকারি হাসপাতাল রয়েছে। ওখানে মানুষ মরছে, তা কী হয়েছে? অমর হবার জন্যে তো কেউ দুনিয়ায় আসেনি। মায়ের বয়স সিক্সটি, সত্যেন ধার করে নার্সিংহোমে ঢুকিয়েছিল। এখন বোঝো বাবুগিরির ফল! মা টাঁসলেন, কিন্তু রেখে গেলেন দেনা। রোগী মরে গেলেও তো নার্সিংহোম কোনো কনসেশন দেয় না।"

"রামকৃষ্ণ হাজরা?" জানতে চাইছে কুমারেশ।

"এদের ডেভেলপ্ করার দায়িত্ব স্বয়ং গণেশঠাকুরও পারবেন না, স্যর। আপিসে সকালবেলায় এসে ঘুমোয়। ঘুমের দোষ নয়। থাকে বেঁচিতে। একটা ছেলে হয়েছে, ঘন-ঘন মূর্ছা যায়। সেই ছেলে আগলে রাতে রামকৃষ্ণকে বসে থাকতে হয়, কখন কী বিপদ আসে তা দেখবার জন্যে। এটা বোকামি নয়, বলুন? তার ওপর আবার মরাল টাপিচুড—যে-কোম্পানি তোকে খাওয়াচ্ছে-পরাচ্ছে তার দাঁতের গোড়া ভাঙা ফল্‌স বিল করে!"

আরও একটা-দুটো কনফিডেনশিয়াল কেস রেখে গেলেন গণেশ গাঙ্গুলি।

আসল ঘটনাটা ঐ দিনেই কোনো একসময় ঘটেছিল। এবং কুমারেশ তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ব্যাপারটা নিয়ে সাবা অফিসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল।

আসলে ঠিক যে কী হয়েছিল তা প্রথম দিকে এই অফিসের প্রায় কেউই বুঝে উঠতে পারেনি।

গণেশ গাঙ্গুলিই প্রথম হই-হই ফেললেন।

তেল চিটচিটে নোংরা বুশ শার্ট ও নীল রঙের প্যান্টপরা ভয়ঙ্কর ধরনের

একটা লোক কীভাবে সায়েবের চেম্বারে ঢুকে পড়েছিল।

গণেশ গাঙ্গুলি গম্ভীরভাবে দু'একজনকে জানালেন, "পড়েছিল না, ঢুকে বসেছিল। খুনে মশাই। খুনে বোঝেন তো—মার্ডারার, দাগী আসামী।"

রিসেপশনিস্ট মীনা পালকে ডেকে পাঠিয়েছেন গণেশ গাঙ্গুলি।

"একটা লোক, একটা সম্ভাব্য উগ্রপন্থী দিনদুপুরে খোদ সায়েবের ঘরে ঢুকে পড়ল কী করে? আপনারা চাকরিতে রয়েছেন কেন?"

মীনা পাল তো উত্তেজনায় পালিশ-করা নখ গণেশ গাঙ্গুলির সামনেই দাঁত দিয়ে কাটতে আরম্ভ করেছে। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছে মীনা পাল।

গণেশ গাঙ্গুলি এখনও উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন, একটু-একটু হাঁপাচ্ছেন। "দিনদুপুরে, আপনারা সবাই থাকতে একটা দাগী আসামী গট-গট করে আপিসে ঢুকে পড়ে সায়েবের ঘরে চলে গেল। সেইসময় কী কী ঘটবার সম্ভাবনা রয়েছে আপনি অ্যাজ রিসেপশনিস্ট বলুন। আপনি নিশ্চয় জানেন, রিসেপশন মানে হাসি-হাসি মুখ করে সুন্দর পরিবেশে সুন্দর সাজসজ্জায় কাউকে বরণ করা নয়। রিসেপশন ইজ সিকিউরিটি। সুরক্ষা।"

"ট্রেনিং-এর সময় আপনাকে কী শেখানো হয়েছিল?" প্রশ্ন করেছেন বিরক্ত গণেশ গাঙ্গুলি।

মীনা পালের ভীষণ দুশ্চিন্তা। অন্য সময়ে সে গণেশ গাঙ্গুলিকে তেমন পাত্তা দেয়নি তার সৌন্দর্যের জন্যে, তার স্মার্টনেশের জন্যে। এই অফিসের সবচেয়ে সুসজ্জিতা মহিলা সে। কাজটা সে শখ করেই করে, অনেকটা, স্বামী পরিত্যক্তা হবার পর বাড়িতে সারাক্ষণ বসে থাকা ভীষণ শক্ত। বোরিং লাগে। তাই অফিসে আসে। টেকো গণেশকে তার মোটেই ভালো লাগে না।

মীনা পাল বলল, "আমার কর্তব্য আমি জানি, স্যার। আপনি তো লিখিত নির্দেশ এবং ম্যানুয়াল দিয়েছেন। আপনি লিখেছেন, রিসেপশনিস্ট হলো ভদ্রবেশী পুলিশ। তার কাজ হলো—আজেবাজে লোককে আপিসে ঢুকতে না দেওয়া। অথচ এই অপ্রিয় কাজ করতে হবে মিষ্টিভাবে এবং মধুরভাবে। রিসেপশনিস্ট মানে মিছরির ছুরি।"

গণেশের এক প্রশ্নে মীনা ঘাবড়ে গেল। "আজকাল কর্মক্ষেত্রে কী কী হতে পারে বলুন তো?"

মীনা বোকার মতন বলে ফেলল, "ডি-এ রাইজ, বোনাস্, প্রমোশন।"

"ওসবতো কর্মীদের খোওয়াব! আমাদের মতো লোকের দুঃস্বপ্ন কী কী তা অ্যাজ রিসেপশনিস্ট আপনার অন্তত জানা উচিত। অন্তত এক সপ্তাহ স্পেশাল ট্রেনিং-এর পরে আপনার বলা উচিত ছিল। মিস্ মল্লিকা ঘোষ ব্ল্যাকবেল্ট জুডো এক্সপার্ট আপনাদের কী ট্রেনিং দিলেন? জানেন, আজকাল অনেক প্রতিষ্ঠানে রিসেপশনিস্টের জুডো ট্রেনিং কমপালসরি হয়ে যাচ্ছে? প্রয়োজন হলেই যাতে দুষ্ট লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কব্জা করা যায়।"

পুরনো প্রশ্নটা ভোলেননি গণেশ গাঙ্গুলি। রিসেপশনিস্ট কোনো উত্তরই দিতে পারছে না। শুধু সাজগোজই করতে শিখেছে মীনা পালের মতন মেয়েরা, সমস্ত ট্রেনিং বিফল হয়েছে। এরা জানে না, অফিস নিরাপত্তা এমনই বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে এ-সি, ডি-সি, আই-জি, ডি-আই-জি চাকরি থেকে অসময়ে পেনসন নিয়ে এই অফিস সিকিউরিটিতে ঢুকছেন। স্রেফ পেনসন প্লাস মাইনের জন্যে নয়, সিকিউরিটির প্রয়োজনে।

শিউরে উঠেছেন গণেশ গাঙ্গুলি। কী কী অঘটন ঘটতে পারে তার লিস্ট তিনি নোট করে ফেলেছেন। ইয়েস চুরি। ছিঁচকে চোর, ধেড়ে চোর, ঢুকে পড়ে আপিসে। আপিস হলেই তেমন আরশোলা এবং নেংটি ইঁদুর হবে, তেমন আস্‌বে এই চোর। এরা ব্যাগ তুলে নিয়ে যাবে আপিস ঘর থেকে, টেলিফোন লাইন কেটে রিসিভার বগলে নিয়ে গটগট করে বেরিয়ে যাবে।

"আপনার মনে নেই বাইরের লোক এসে এই আপিস থেকে টাইপরাইটার তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। আপনি এই চার্জ নেবার আগে। তারপরই তো আপনাকে ওই সিকিউরিটি ক্লাসে পাঠানো হলো।"

"সায়েবের ব্যাগ কি চুরি গিয়েছে, স্যার?"

গণেশ গাঙ্গুলি রহস্যময় হাসি হাসলেন। "এখনও ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখা চলছে মিস্ পাল। আমি এখনই সব বলতে পারছি না। লোকটাকে একটা ঘরে রাখা হয়েছে, বডি সার্চ হবে। আজকাল জানেন তো মানুষ নিজেকেই বোমার মতন করে ব্যবহার করছে। শরীরের কোথায় কে কী

লুকিয়ে রেখেছে, কে কি মতলবে কোথায় যাচ্ছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই, মিস পাল। সেই জন্যই তো এত টাকা দিয়ে রিসেপশনিস্ট রাখা।"

মীনা পাল নার্ভাস হয়ে আরও কিছুটা নখ কেটে ফেললেন দাঁত দিয়ে। গণেশ গাঙ্গুলি বললেন, "চুরিটা তো মাইনর জিনিস। মানিব্যাগ কিংবা ক্যামেরার ওপর দিয়ে গেল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ পড়েন না কাগজে? দেখেন না টি-ভি? মানুষকে ছুরি মারা হচ্ছে আপিসে, দিনদুপুরে। আপিসে ঢুকে গুলি করে পালাচ্ছে দুষ্টু লোকেরা। স্যরি, দুষ্টু কথাটা বলব না, কে আবার চটিতং হবে—আমি বলতে চাইছি উগ্রপন্থীরা। ঐ লোকটা যদি সায়েবকে ছুরি মারত তা হলে কী হতো? ঘরের মধ্যে মানুষটা রক্তের মধ্যে পড়ে থাকলেও আমরা কেউ কিছু করতে পারতাম না।"

"ওঁকে ছুরি মারার চেষ্ট করেছে নাকি, স্যার?" মীনা পাল ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

"আমি ওই সময়, অলমোস্ট ক্রিটিক্যাল মুহূর্তে, ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম তাই। মানুষটাকে সামলাতে আমাকেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হতো এবং দুটো মার্ডার হতো এই আপিসে। আপনি নিশ্চয় হিন্দি ছবি দেখেন, আপনার নিশ্চয়ই ধারণা আছে খুনিরা প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী রাখতে চায় না, তাদের সাবাড় করে দিতে হয় সঙ্গে-সঙ্গে। যদি সে হিউম্যান বম্ব হয় তা হলে সেক্রেটারি মিস্ সুনীতা রাও পর্যন্ত বাঁচতেন না।"

মীনা পাল ভীষণ ভয় পাচ্ছে। গণেশ গাঙ্গুলি বললেন, "খুন তবু তো সহ্য হয়, মিস্ পাল। আপিস থেকে জ্যান্ত তুলে নিয়ে যেতে পারত সায়েবকে। পড়ছেন না, বিভিন্ন জায়গার রিপোর্ট। হোস্টেজ বলে একটা কথা, কিডন্যাপিং বলে একটা শব্দ মনে আসছে না আপনার? জলজ্যান্ত মানুষকে কাঁধে তুলে নিয়ে উধাও হচ্ছে উগ্রপন্থী, তারপর টেলিফোনে কত লক্ষ টাকা দাবি করে বসবে তার ঠিক নেই।"

এরপর খবরটা ইউনিয়নের পরিতোষ মিত্রের কানে পৌঁছেছে। পরিতোষ উঁকি মারল গণেশ গাঙ্গুলির ঘরে।

"আজ স্ট্যাবিং, মার্ডার, কিডন্যাপিং যা হয় একটা হতে পারত অফিসে, পরিতোষবাবু। সিকিউরিটির লোকদের ইউনিয়নে নিলে এই কাণ্ডটাই হবে—ঘড়ির দিকে তাকিয়ে টিফিন টাইম বলে উধাও হয়ে যাবে

সিকিউরিটি। আপনারা তো এই গরিবের কথায় কান দেবেন না।"

পরিতোষবাবু প্রথম মন্তব্য : "আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"

"বলছেন কি মশাই! দিনদুপুরে একটা লোক অফিসে ঢুকে পড়ে কোম্পানির সায়েবকে স্ট্যাবিং, বম্বিং, মার্ডারিং, কিডন্যাপিং-এর প্রচেষ্টা চালালে আশ্চর্য হবার কিছু নেই! তা হলে কীসে আপনারা আশ্চর্য হবেন? স্তালিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলে? নিউইয়র্কের নাম লেনিনগ্রাদ হলে।"

পরিতোষ মিত্তির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিলেন, সায়েবের নিরাপত্তার ব্যাপারে ইউনিয়নও উদ্বিগ্ন। কিন্তু পরিতোষ বলতে চাইছে, "বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা এলে, রেভলিউশনে দরকচা পড়লে এইরকম অবস্থা আসতে বাধ্য। আপনি পার্টি লিটারেচর পড়ে দেখুন, সাপ্তাহিক মঙ্গলবার্তা পড়ে দেখুন—এই পলিটিক্যাল ইকনমিক পবিস্থিতিতে পেটি সন্ত্রাসবাদ বাড়লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"

"আপনি তো মশাই বড় ব্যাপারে চলে গেলেন। আমি আপিস সামলাতে নাস্তানাবুদ হচ্ছি আর আপনি আন্তর্জাতিক লেভেলে কথা বলে যাচ্ছেন।"

"আপনারাও তো তাই বলে যাচ্ছেন, আমাদের সেদিন বুঝোলেন—বাজারভিত্তিক অর্থনীতি না কি। দুনিয়া একটা গাঁয়ের মতন হয়ে যাচ্ছে, ভারত আর কতদিন সকলের অস্পৃশ্য হয়ে বসবাস করবে এই গ্রামে।"

গণেশ বললেন, "আমি নই মশাই, আমার সায়েব। আমার মশাই অতশত বিলিতী কাগজ পড়বার ধৈর্য নেই, সময় নেই। উনি আমাকে বললেন, আপনাদের বোঝাতে দুনিয়াটা কোন দিকে যাচ্ছে এবং আমরা অ্যাদ্দিন সেদিকে না গিয়ে কী ভুল করেছি। থাইল্যান্ড, কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং এইসব দেশের নাম শুনেছেন? পুঁচকে-পুঁচকে দেশ, কিন্তু বাজারভিত্তিক অর্থনীতিকে মেনে নিয়ে বাঘের মতন পালোয়ান হয়ে উঠেছে; আর আমরা ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ওদের দরজাতেও হত্যে দিচ্ছি!"

পরিতোষ : "ওসব বড়ো বড়ো কথা ছাড়ুন। আমি পার্টি আপিসের কমরেড রতন ঘটককে জিগ্যেস করলাম, উনি বললেন, দেশটার সর্বনাশ

করবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও পুঁজিপতিরা ষড়যন্ত্র করে আমাদের ওই পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দুঃখে এবার কুকুর বেড়াল কাঁদবে, কেউ আমাদের বাঁচাবে না।"

গণেশ : "শুনুন মশাই, ওই রিসেপশনের মেয়েটাকে আমি একটু টেক-আপ করছি, সেই সঙ্গে সিকিউরিটি গার্ড। উপায় নেই, আজ বড় সায়েবের ফাঁড়া গেল, কাল আমি বা আপনিও বাদ না যেতে পারি। উগ্রপন্থীরা আপনাদের ওপরেও সন্তুষ্ট নয় এটা জেনে রাখবেন।"

পরিতোষ : "সিকিউরিটি জোরদার করবেন এতে আমাদের কী বলবার থাকতে পারে? আপনার আপিস আপনি ঠিক করবেন কে এখানে ঢুকবে, কে ঢুকবে না, অ্যাজ লং অ্যাজ আমাদের কমরেডদের যাওয়া-আসায় আপনি বাধা না দিচ্ছেন। তা হলে অবশ্য ফল ভালো হবে না।"

হাত বাড়িয়ে দিলেন গণেশ। "হাতে হাত দিন—একেই বলে সহযোগিৎসু।"

"সেটা আবার কী জিনিস, মিস্টার গাঙ্গুলি?"

"সহযোগিতার জাপানিজ প্রতিশব্দ...। জাপানি ওয়ার্ড ছাড়া আজকাল ম্যানেজমেন্ট চলে না। সায়েবের প্রারম্ভিক শক্ কেটে গেলে বলতে হবে আপনার সহযোগিতার কথা। সায়েব গ্যাজ-গ্যাজ করে বলে যাচ্ছেন, যে-দেশে মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকের সহযোগিৎসু নেই সে-দেশ বাজারভিত্তিক অর্থনীতিতে গোল্লায় যাবে। দু'জনে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যেতে হবে।"

"সোনায় মোড়া হাত আপনাদের, ওই হাত আমরা ধরব কোন ভরসায়? আপনারা আমাদের সঙ্গে এক টয়লেটে পর্যন্ত ঢুকতে রাজি নন, আর আপনাদের হাত ধরতে দেবেন আমাদের? ইম্পসিবল।"

পরিতোষ জানতে চাইল সায়েবের সঙ্গে সে দেখা করবে কি না? গণেশ গাঙ্গুলি বারণ করলেন। তিনিই ইউনিয়নের শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দেবেন। কিন্তু সাহেব কী রকম একটু হয়ে পড়েছেন। চুপচাপ নিজের ঘরে বসে রইলেন। লোকটা ঠিক কী করেছে, কতখানি ভয় দেখিয়েছে তা এখনও বুঝতে দিচ্ছেন না।

পরিতোষ জানিয়ে দিল, অ্যাদ্দিন ইউনিয়ন মেম্বারদেব টেবিল থেকে

জিনিস চুরি গিয়েছে। রুবী রায়ের হ্যান্ডব্যাগ থেকে একত্রিশ টাকা উধাও হলো, ম্যানেজমেন্ট কিছু করল না। নগেনবাবুর টেবিল থেকে পকেট ট্রানজিস্টর রেডিও তুলে নিয়ে গেল, ম্যানেজমেন্ট গা করল না। এবার খোদ সায়েবের ঘরে চুরি হয়েছে, এবার গণেশ গাঙ্গুলি অ্যান্ড কোম্পানির টনক নড়বে।

"চুরি নয় মশাই। সামথিং বিগার দ্যান চুরি।" মনে রাখতে অনুরোধ করলেন গণেশ গাঙ্গুলি।

অফিসের সিনিয়র ক্লার্ক ভবানী ভদ্র আগামী বছরে রিটায়ার করবেন। ছ'মাস এক্সটেনশনের ব্যাপারে সায়েবের সঙ্গে একান্ত দেখা করবার ইচ্ছে ছিল। ভালো থাকা প্রয়োজন সায়েবের, যতক্ষণ না ভবানী ভদ্র ওঁর কাছে থেকে একটা সিদ্ধান্ত পাচ্ছেন। ভবানীবাবু একবার উঁকি মেরেছিলেন সেই ঘরটায় যেখানে সিকিউরিটির লোক ওই বিপজ্জনক লোকটাকে ধরে রেখে দিয়েছে।

সিকিউরিটি ওকে তন্ন-তন্ন করে সার্চ করেছে। সমস্ত শরীর টিপে-টিপে দেখছে কোথাও কোনো ছুরি বা বোমা লুকনো আছে কি না। প্রয়োজনে লোকটার প্যান্ট খুলেও সার্চ করতে হবে। সিকিউরিটির দুঃখ তাদের ওপর সমস্ত দায়িত্ব চাপানো আছে, কিন্তু ঢাল-তরোয়াল কিছুই দেওয়া হয়নি। আজ সায়েবের কিছু হয়ে গেলে উনি তো টুক করে ওপারে চলে যেতেন, কিন্তু চাকরি যেত সিকিউরিটির। সিকিউরিটির সংসারে ছ'টা পেট—তারা না খেতে পেয়ে মারা যেত। অথচ একটা মেটাল ডিটেক্টর নেই অফিসে। এই যন্ত্রটা তো এয়ারপোর্টে, স্টেশনে, সরকারি আপিসে ডালভাত হয়ে গিয়েছে।

ভবানী ভদ্র এবার লোকটিকে উঁকি মেরে দেখলেন। আরে! আশুদার ছেলে না? ঠিক আশুদার মুখখানা কেটে বসানো। এরই পৈতেতেই তো আশুদা আপিসের সবাইকে নেমন্তন্ন করেছিল। আশুদা আজ বেঁচে নেই, ভদ্রলোক অকালে আচমকা চলে গেলেন।

ভবানী ভদ্রর চিন্তা :

আশুদা অর্থাৎ আশুতোষ ব্যানার্জির ছেলেটা এইভাবে উগ্রপন্থী হলো? বাবার অফিসের সায়েবের ওপর হামলা করল!

আশুদা তো এমন ছিলেন না। বড় শান্ত মানুষ ছিলেন। সংসারে অতবড় ঝড় বয়ে গেল, তবু আশুদা তাঁর আত্মসম্মানবোধ হারাননি। আশুদা শুধু বলতেন, "দেখেশুনে খোঁজখবর করে মেয়ের বিয়ে দিয়ো। আমার মতন ভুল কোরো না। আমি চকমেলানো বাড়ি, গেট, মোটর এইসব দেখে মজে গেলাম, ভাবলাম এত সুন্দরী মেয়ে আমার রাজরানী হবে। আমি ওখানে মেয়ে দিয়ে ধন্য হলাম। অথচ আমি একটা প্রফেসর ছেলে পেয়েছিলাম, সুন্দরী মেয়ের দিকে ওদের ভীষণ ঝোঁক, কিন্তু বাড়ি নেই, দুটো কামরা ভাড়া করে মা-ব্যাটায় থাকে। আমি রাজী হলাম না, আমি ওই বড়লোকের বেয়াই হবার স্বপ্ন দেখলাম।"

তারপর কী হয়েছে তা তখনকার অনেকেই এ-আপিসে জানত। বিয়ের ক'মাস পরেই অমন লক্ষ্মীপ্রতিমা মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মারা গেল। জামাইটা নাকি একটা জানোয়ার, আগে বিয়েও করেছিল, সেটা লুকিয়ে রেখেছে। এই মেয়ের ওপর কী নিগ্রহ! মেয়েটা মারা গেল হঠাৎ। বোধ হয় খুন হয়েছে। কিন্তু কিছু বোঝা গেল না। বড়লোক বেয়াই। পুলিশ, ডাক্তার সব ম্যানেজ করে ফেলে মেয়েটাকে দ্রুত শ্মশানে নিয়ে গেল। আশুদা গিয়েছিলেন শ্মশানে, সঙ্গে ছোট ছেলেকে নিয়ে। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, তিনি আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কোনো কথা কানে তুলল না, হই-হই করে চিতায় আগুন ধরিয়ে দিল। কোথাও কোনো খুনের প্রমাণ রইল না।

বাড়ি ফিরে এসেছিলেন আশুদা। স্ত্রী শুনলেন না। বললেন, "আবার ফিরে যাও। থানায় খবর দাও। মেয়েটাকে খুন করে কেউ বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে তা হয় না।"

আশুদা ও বিশু আবার ফিরে গিয়েছিলেন মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে ; বউকে শ্মশানে পুড়িয়ে ওঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। পুলিশের খাতায় কোথাও কোনো গোলমালের ইঙ্গিত নেই। এইটুকু মেয়ের হার্ট অ্যাটাক হতে যাবে কোন দুঃখে? হার্ট অ্যাটাক তো নেই এই বংশে। আশুদার বাবা-

মা দু'জনেই পঁচাত্তর বছর বেঁচেছিলেন। কিন্তু লোকাল ডাক্তার হার্ট অ্যাটাক লিখে দিয়েছে সার্টিফিকেটে। পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন আশুদা। পুলিশের আরও সুবিধে হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়ির লোকদের খবর দিয়ে আরও টাকা আদায় করল।

আশুদা বললেন, "আমাদের মেয়ে ক'দিন আগেও আমার ওখানে গিয়েছিল। মনে সুখ ছিল না। ওখানে মাকে বলেছিল, আমি বোধ হয় বাঁচবো না, মা। মা কথাটা সিরিয়াসলি নেননি। পরামর্শ দিয়েছিলেন, মেয়েদের ধৈর্য রাখতে হয়, না-হলে সংসার টেকে না।"

সেই মেয়েই আর ফিরল না। তারপরে আশুদা যখন প্রথম অফিসে এলেন তখন তাঁর বয়স রাতারাতি তিরিশ বছর বেড়ে গিয়েছে।

কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। মাঝে-মাঝে কাঁদতেন টিফিন টাইমে। তারপর আবার আর একটা বিপদ ঘটল। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না।

আশুদা তখন কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। তারপর অনেকদিন অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে আশুদা একদিন ভববন্ধন থেকে মুক্তি পেলেন। শেষের দিকে শারীরিক যন্ত্রণা পাননি আশুদা, ড্যাং ড্যাং করে তিনি চলে গিয়েছেন। সেদিন পুরো অফিস করেছেন, তারপর একঘণ্টা ওভারটাইম। এরপর ক্যানিং-এ ফিরে গিয়েছেন। বাড়ি গিয়েছেন। স্নান করেছেন, খাওয়া সেরেছেন। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত কী সব লিখেছেন। তার পরেই শেষ। টুক করে কেটে পড়েছেন, কেউ জানতেও পারেনি। সকালে ঘুম থেকে উঠে স্বামীকে জাগাতে গিয়ে বউদি দেখলেন আশুদা নেই।

সত্যেন বসুর চিন্তা :

আমার নিজের যন্ত্রণায় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। ওই হারামজাদা অডিটর ছোকরা নিজের প্রমোশনের জন্যে আমার সব্বোনাশ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। ওভারটাইম লিখে আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম, সেই সময় আমাকে পাকড়াও করল। অফিসের ভিতরে ফিরিয়ে এনে সই করাল সময়ের সাক্ষী রেখে। এখন আমার কী হবে জানি না। ইউনিয়ন আমার ব্যাপারটা গায়ে মাখছে না। তার কারণ আমি ইউনিয়নকে পছন্দ করি না। সেবার আমি কিউবা মিছিলে যোগ দিইনি। আমি বলেছি, দুনিয়াটাই

জোচ্চর—ইউনিয়ন তার থেকে বাদ যাবে কেন?

দেখুন আমার অবস্থাটা। একঘণ্টা উপস্থিত থেকে তিনঘণ্টার ওভারটাইম বিল করা এখানে নতুন নয়। বছরের পর বছর ধরে সবাই তাই করেছে, অথচ আমি চোর দায়ে ধরা পড়লাম। আর ওই অডিটর ছোকরা খুব হুঁশিয়ার। রুই কাতলা না পাকড়িয়ে আমাকে ধরেছে তার কারণ সে জানে ইউনিয়ন আমাকে মদত দেবে না।

ভবানী ভদ্রর কাছ থেকে খবর পেয়ে আমি উগ্রপন্থীটাকে দেখতে গিয়েছিলাম। ঠিকই দেখেছেন ভবানীদা। এই সেই বিশু—বীরেশ্বর ব্যানার্জি। যে জেলে ছিল। জেলে থাকলে মানুষ কালো হয়ে যায় শুনেছিলাম, বিশুকে দেখে তা মনে হলো না।

ইউনিয়নের পরিতোষ মিত্তিরের কাছে গিয়েছিলাম। এমন লর্ডলি স্টাইলে ঘরে বসে আছে যেন এই আপিসের মালিক সে। কী খারাপ ব্যবহার মানুষদের সঙ্গে—সায়েবও এমন দেমাক দেখায় না। এযুগের পার্টিবাজগুলো সবচেয়ে ডেনজারাস্। এরা ক্ষমতায় এলে সমস্ত দেশটাকে জাহান্নামে পাঠাবে। এরা নিজের কাজ কিসসু করে না। ডাঁট মেরে আবার ওভারটাইম করে না। বাপের টু পাইস আছে, ওয়াইফের চাকরির ইনকাম আছে। ওয়াইফের চাকরি থাকলে আমিও ও-টি করতাম না।

পরিতোষকে দিয়েছি খোঁচা। "কী মশাই? এই উগ্রপন্থীকে কাজ দেবার জন্যে আপনারা না গণেশ গাঙ্গুলিকে চিঠি লিখেছিলেন? এখন যদি ছুরি, বোমা কিছু পকেট থেকে বেরোয় তা হলে ইউনিয়নের ইজ্জতটা কোথায় থাকবে? পুলিশ কিন্তু কাউকে ছাড়বে না।"

"ইউনিয়ন যথাসময়ে সব বিবেচনা করবে," কী কথা বলার স্টাইল! চিফ মিনিস্টার যেভাবে কথা বলে পরিতোষও সেইভাবে স্টেটমেন্ট দিতে শিখে গিয়েছে। আমার হাঙ্গামাটা কাটলে আমি যদি ইউনিয়ন থেকে রিজাইন না করেছি তা আমার নামে কুকুর রাখতে হবে।

যাবার সময় পরিতোষ মিত্তির আমাকে লেকচার শুনিয়েছে। "এই সিস্টেম এর থেকে ভালো কিছু হবে না। মানুষ জেলে যাবে, জেল থেকে বেরিয়ে আসবে। তারপর খুন জখম কিডন্যাপিং সব সম্ভব। সিস্টেম যখন পাল্টাবে, তখন মানুষ অন্য রকম হয়ে যাবে—সবাই কাজ পাবে। কাজ

জুগিয়ে যাওয়াটা হবে সরকারের দায়িত্ব। রাইট টু ওয়ার্ক—কাজের অধিকার। সংবিধান অ্যাদ্দিন উই দ্য পিপ্‌ল অফ ইন্ডিয়াকে কলা দেখিয়েছে, বোকা বানিয়েছে, টুপি পরিয়েছে।"

সব ব্লাফ। পরিতোষ মিত্তিরের কথা যে সরল মনে বিশ্বাস করবে সে ঠকবে। ভগবান যখন অনেকদিন আগে মানুষকে পাঠিয়েছিলেন তখন ফিডিং বোতলটাকে সঙ্গে দেননি—সবই মানুষকে নিজের চেষ্টায় নিজের তাগিদে তৈরি করে নিতে হয়েছে। নেতারা চাকরির বক্স হাতে ধরিয়ে দেবেন এই আশায় যে বসে থেকেছে সে ডুবেছে। বেঁচে থাকার জন্যে যা প্রয়োজন তা করতে হবে। কাজের অধিকার-ফধিকার বলে কিছু নেই এই দুনিয়ায়। "হাঙ্গার নোজ্ নো ল'।

মীনা পালের ভাবনা :

এই লোকটা যে জেলখাটা আসামী তা আমি কেমন করে বুঝব? আমি তো গণক ঠাকুর নই। আমি ওসব সিকিউরিটি-ফিকিউরিটি বুঝি না। সুইট অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে সুইট ব্যবহার করতে হবে আগন্তুকের সঙ্গে, এই আন্দাজ করে আমি চাকরি নিয়েছি। আমি মেয়ে পুলিশ নই, আমি রিসেপশনিস্ট।

লোকটা এই প্রথম আসছে না। আগে ইউনিয়নের সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেছে। কিন্তু সেকথা এখন বলা চলবে না, ইউনিয়ন তা হলে আমাকে আপিস ছাড়া করে দেবে। পরিতোষবাবু আমাকে একটু আগেই সাবধান করে দিয়েছেন।

লোকটা আজ সকালে একবার এসেছিল। বলেছিল, সায়েবের নামে সে একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। চিঠির ওপরটা আমি দেখেছি, সেখানে সায়েবের নাম মেয়েলি অক্ষরে লেখা আছে। আমি ভাবলাম, জানাশোনা কোনো মহিলা পাঠিয়েছেন সায়েবকে।

তবু আমি পাত্তা দিইনি। বলেছি, সায়েব এখন মিটিংয়ে আছেন। লোকটার এত বড়ো আস্পর্ধা জিজ্ঞেস করেছে, কখন মিটিং শেষ হবে। আমি বলেছি, তা বলা যায় না। আধঘণ্টা হতে পারে আবার সারাদিন লাগতে পারে। চিঠি রেখে যান, পাঠিয়ে দেব। উত্তর দেবার থাকলে সায়েব

নিশ্চয় উত্তর পাঠিয়ে দেবেন ডাকে।

লোকটা আবার কখন যে ফিরে এসেছে আমি জানি না। আমি তখন রিসেপশন কাউন্টারে ছিলাম না। গিয়েছিলাম টয়লেটে। কিন্তু পরিতোষবাবু আমাকে ভালো বুদ্ধি দিয়েছেন, "বলবে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম নিচে। ডাক্তার ওই সময় আসেন, সুতরাং কারও বাবার সাধ্য নেই তোমার কোনো ক্ষতি করে। যদি এনকোয়ারি হয় তখন ওই গণেশ গাঙ্গুলি তোমাকে টাচ করতে পারবে না।"

কিন্তু ওই লোকটাকে তো আসামী বলে মনে হলো না। সারা লোকটাকে দেখে এসেছে ওই ঘরে। সারা স্মিথ। তারপর বলেছে, "এর বোন সেবারে মার্ডার হয়েছিল? মীনা, বছরে কত মেয়েকে মার্ডার করা হচ্ছে শ্বশুরবাড়িতে তোমাদের দেশে?"

"দেশটা তোমারও, সারা!" আমি বলেছিলাম।

কিন্তু কাজ হলো না। "আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি মীনা—টু অসট্রেলিয়া। ওইটাই আমাদের দেশ।"

সারা খুব চটে আছে। বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে একই ঘরে থাকে বলে অফিসের মেয়েরা ওকে খারাপ চোখে দেখে। ওকে যা-তা বলেছে। সারা বলেছে, "এইটাই খরচ বাঁচাবার একমাত্র পথ। দু'জনে দুটো ঘর নেওয়া মানেই অনেক টাকা ভাড়া। সেই টাকা জমালে আমার পক্ষে তাড়াতাড়ি ফরেনে যাওয়ার সুবিধে হবে।"

"তাই বলে তুমি অন্য এক পুরুষ মানুষের সঙ্গে এক ঘরে থাকবে! বিয়ে না করে?"

সারা আজকে সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। "ইয়েস, আমরা এবং পশ্চিমের লোকেরা অসভ্য, বর্বর। আমরা বিয়ে না-করেই পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে এক ঘরে থাকি। তোমরা ভীষণ সভ্য, এত সভ্য যে বিয়ের রাতের আগে স্বামীর মুখ পর্যন্ত দেখো না। এবং তারপর স্বামীর সংসারে গিয়ে তোমরা জানো না কখন তোমাদের গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেওয়া হবে, কখন জলের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হবে ঘুমের বড়ি। তোমরা জানো না কখন রাত্রে তোমাদের গলা টিপে ধরা হবে। অথবা ফেলে দেওয়া হবে বাড়ির ছাদ থেকে।"

আমি উত্তর দিই। এই লোকটার বাবা আমাদের আপিসে কাজ করতেন, অমন লোকের ছেলে দাগী আসামী হয়েছে ভাবা যায় না। এইসব লোককে জেল থেকে ছাড়ে কেন? আজ যদি কিছু হয়ে যেত সায়েবের তা হলে এতক্ষণে আমার চাকরি চলে গিয়েছে। আমার মা না হয় আমাকে খাওয়াতো, আমাদের বাড়ি ভাড়ার মাসিক আয় আছে, আমার স্বামীর কাছ থেকেও কিছু খোরপোষ পাচ্ছি, কিন্তু বাড়িতে সারাদিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হতো। আমি পাগল হয়ে যেতাম। আমার মা যেরকম মানুষ আমাকে কোথাও একলা বেরোতে দিত না। এখানে এই আপিসে সবাইকে আমার ভালো লাগে না, কিন্তু এতগুলো মানুষকে প্রতিদিন একসঙ্গে দেখতে পাই। মুখে যাই বলি, এর আনন্দ আছে।

সারার জন্যে হিংসে হতো আমার। আমার বিয়ে হয়েও কেউ নেই, আর ও বিয়ে না করেই একজনের নিবিড় সান্নিধ্য পাচ্ছে। ভাগ্যবতী মেয়ে।

মনের জোরও রাখে সারা। বয়ফ্রেন্ডকে শেষ পর্যন্ত মনে ধরেনি, তাকে চলে যেতে হয়েছে। সারা এখন একাই যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া—নিজের ভাগ্য নিজেই ঠিক করে নেবে—মা মাসি কারও সাহায্যে দরকার হবে না। সারা ভীষণ সোজা কথা বলে—"তোমাদের পেটে খিদে মুখে লাজ। বিয়ে-বিয়ে করেই তোমরা মেয়েদের সব্বোনাশ করলে, তাদের এনজয় করতে দিলে না।"

হেলেনিক ট্রাভেল থেকে ফোন এসেছে, কুমারেশের সেক্রেটারি খবর দিল। ইরাবতীর সঙ্গে এই রকমই ঠিক আছে। ইরাবতী কখনও নাম প্রকাশ করবে না, কুমারেশ ইঙ্গিতেই বুঝে নেবে।

সেক্রেটারি সুনীতার মুখের দিকে তাকাল কুমারেশ। সুনীতা কতটা কি বুঝতে পারে কে জানে! মেয়েরা এই অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারে ভীষণ এক্সপার্ট কুমারেশ শুনেছে, মুখে কিছু না বললেও অনেক সময় ওরা সব বুঝে যায়।

কুমারেশ এবার সুনীতাকে পাঠাল গণেশ গাঙ্গুলির কাছে লেটেস্ট খবরাখবরের জন্য এবং সেই সুযোগে সোজা ফোন করল ইরাবতীকে।

ভাগ্যে ইরাবতী নিজে ফোন ধরল। এও এক মুশকিল। ওই যখন অন্য

কেউ ফোন ধরে অফিসে তখন খুব সাবধানে সংযত হয়ে কথা বলতে হয় কুমারেশকে। ফোন করার উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হয়ে যায়। যাকে আমি চাই, যে আমাকে প্রশ্রয় দেয় তার সঙ্গে ফোনেও নিবিড় হওয়া যাবে না।

কুমারেশ সময় নষ্ট করল না। মনটা হাল্কা করে নিল। "ইরাবতী, ফোনে তোমাকে একটা কিস করতে ইচ্ছে হলো।"

ইরাবতী ন্যাকামো করল না। বেশ শান্তভাবে বলল, "ভালো তো। বিয়ের পর টেলিফোন অপারেটর থাকলেও করবে। আই ডোন্ট কেয়ার।"

চুমুটা অ্যাকসেপ্ট করল ইরাবতী, কিন্তু ফিরিয়ে দিল না। এইটাই ইরাবতীর বিশিষ্টতা—লজ্জাই যে বাঙালি মেয়েদের ভূষণ তা ভুলে গেলে চলবে না। তা ছাড়া ওর কাছাকাছি কেউ থাকতে পারে।

ইরাবতীর কণ্ঠে এবার উদ্বেগ। "কী হয়েছিল? একটা লোক নাকি তোমার ঘরে ডেনজারাসলি ঢুকে পড়েছিল?"

"তুমি কী করে জানলে ইরাবতী।"

"তোমার সেক্রেটারি বলল। লোকটা চোর, না ডাকাত, না পাগল, না অন্য কিছু তা নাকি বোঝা যাচ্ছে না। তোমার সেক্রেটারি বলল, পাগল অবশ্যই নয়। পাগলরা অত হিসেব করে আপিসপাড়ায় কারও ঘরে ঢুকে পড়ে না।"

"ইরা, জানো, আপিসে তখন আমার সেক্রেটারি ছিল না। আমি একবার টয়লেটে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি লোক...কী রকম যেন লোকটা... নোংরা বুশ শার্ট আর নীল প্যান্ট পরে...চোখদুটো কেমন ঘোলাটে... ভাবটাও কেমন...আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আছে।"

"অ্যাঁ। অ্যাটাচিকেসে হাত-টাত দিয়েছে নাকি? পকেটে ছুরি বা রিভলবার?"

"তা ঠিক বলতে পারব না।"

"বয়স কত?"

"এই ধরো আমারই মতন, বরং একটু কম হবে, এই উনত্রিশ-তিরিশ।"

"দৈত্যের মতন চেহারা নাকি?"

"না ইরা, দৈত্যাকৃতি নয়, বরং একটু রোগা, ফ্যাকাসে, একটু হলদে-হলদে ভাব। কিছুদিন আগে নিশ্চয় জন্ডিস হয়েছিল। লোকটার গালে

একটা লম্বা কাটা দাগ। দেখলেই সমস্ত নজর ওই দাগের দিকে চলে যেতে বাধ্য।"

লোকটা নিজেই বলল, এগারো বছর জেলে ছিল। কিছুদিন আগে ছাড়া পেয়েছে। আমার সঙ্গে তার দেখা হওয়া নাকি ভীষণ জরুরি।

"তা তুমি জিজ্ঞেস করলে না, কীভাবে তোমার ঘরে সে ঢুকে পড়ল? অফিসের সিকিউরিটি এড়িয়ে?"

"জানো ইরা, লোকটা আমাকে কেমন যেন একটু নাড়া দিয়ে গেল। একটা অদ্ভুত 'আনক্যানি', অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা। তোমার ঘরে একটা এইরকম সন্দেহজনক মানুষ এইভাবে ঢুকে পড়েছে অথচ চেষ্টা চালিয়েও তুমি কিছু করতে পারছ না। লোকটা যেন তোমাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। এগারো বছর গরম-গরম জেলখাটা লোক আমি কখনও দেখিনি। জানো, লোকটার মধ্যে কোনো দুঃখটুঃখু নেই—স্বীকার করছে খুনটুন হয়েছিল একটা। আমার সঙ্গে নাকি দেখা করবার বিশেষ চেষ্টা করছে সেই সকাল থেকে। ক্যানিং না কোথায় বাড়ি, সেখান থেকে ভোরবেলায় চলে এসেছে। জানো ইরা, অনেক কাণ্ড হয়ে গেল, তোমাকে বলব।..."

কুমারেশের সেক্রেটারি ঘরে উঁকি মারল। মিস্টার গণেশ গাঙ্গুলি একবার আসতে চাইছেন। ফোনে তিনি কুমারেশকে পাচ্ছেন না।

ইরাবতীর সঙ্গে সংযোগটা ছিন্ন করতে হলো। উঃ ইরার ডাইভোর্স মামলাটা যে কতদিন চলবে। পীতাম্বর মিশ্র নামকরা উকিল লাগালে হয়তো বহু বছর কেটে যাবে, ইরাবতী বুড়ী হয়ে যাবে। অপেক্ষাটা অনেক সময় অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে।

গণেশ গাঙ্গুলি নির্দেশ চাইছেন। লোকটার শরীর থেকে তন্ন-তন্ন করে সার্চ করে কিছুই পাওয়া যায়নি। কিন্তু সহজেই স্থানীয় থানায় পাঠানো যেতে পারে, কুমারেশ নির্দেশ দিলে।

শুধু-শুধু একটা লোককে থানায় পাঠানো হবে কেন? কুমারেশও বা চাইবে কেন?

গণেশ বলছে, "আপনার না চাওয়াই ভালো, স্যার। হাজার হোক ক্রিমিন্যাল আসামী। একবার এগারো বছর জেল খেটে এসেও যখন...।

একটা বদলা নেবার ইচ্ছে হলে, জেল থেকে বেরিয়ে...।"

গণেশ গাঙ্গুলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলেন আবার।

লোকটাকে বকুনি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন গণেশ গাঙ্গুলি। বুঝিয়ে দিয়েছেন, আপিসটা পাবলিক পার্ক নয়, যখন তখন যার তার ঘরে ঢুকে পড়বার জায়গা নয়।

"লোকটার মোটিভ নিয়ে অনেক রিসার্চ করেছি স্যার। সবরকম সম্ভাবনা, সবরকম পসিবিলিটি—ফ্রম উটকো চোর—ব্যাগ লিফটার টু ব্ল্যাকমেলার টু..."

"ব্ল্যাকমেলারটা কী?" একটু অস্বস্তিবোধ হচ্ছে কুমারেশের।

"অনেক সময় হয়, স্যার। আপনার মতন চরিত্রবান আদর্শবাদী লোক তা বুঝতে পারবে না। আমি যে আপিসে কাজ করতাম সেখানে সায়েব সন্ধেবেলায় কোথায় একটু যেতেন, তারপর সেই মহিলার কেউ আপিসে এসে কী হাঙ্গামা! সে কি বলব স্যার।"

এসব শুনতে ভালো লাগছে না কুমারেশের। গণেশ বললেন, "কিডন্যাপিং সম্ভব হতো না। তা হলে নিচে ভাড়া করা গাড়ি থাকত, গাড়ি কোথায় পাবে এই লোকটা? মার্ডার...মানুষ অধৈর্য হয়ে কখন যে কী করে বসে। গালের কাটা দাগখানা যা লম্বা। নিশ্চয় প্রিভিয়াস কোনো হিসট্রি আছে! কার সঙ্গে ফাইট হয়েছে, সেও প্রাণ বাঁচাবার জন্যে মরীয়া হয়ে ওকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু এবার স্যার ওর সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই..."

"আপনি ভাগ্যে ঠিক সময়ে আমার ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন, মিস্টার গাঙ্গুলি। লোকটাকে দেখেই আপনি আঁতকে উঠলেন, নিয়ে চলে গেলেন!"

গাঙ্গুলি হাসলেন, "আমাকে একটা ক্যারাটে কোর্স নিতে হবে স্যার। হোটেল ফাইভস্টারে মিজ নীলু চোপরা একটা কোর্স অ্যানাউনস করেছেন। মাত্র দশ হাজার টাকা ইনক্লুডিং কোর্স মেটিরিয়াল।"

"নিয়ে নিন ট্রেনিং কোম্পানির যদি কাজে লাগে।"

"গেলে স্যার সঙ্গে ওই রিসেপশনিস্ট মীনা পালকেও নিয়ে যাব। এক সপ্তাহের রেসিডেনশিয়াল কোর্স ইন ভুবনেশ্বর।"

কুমারেশের আপত্তি নেই, যদি-না মীনা পালের আপত্তি থাকে।

"ট্রেনিং ইজ ট্রেনিং। আপত্তি থাকলে চাকরি ছাড়তে হবে।"

এরপরেও কিছু আলোচনা হয়েছে। গণেশ গাঙ্গুলি বলেছেন, "আমার তদন্ত রিপোর্ট তৈরি স্যার। এনকোয়ারির নাম করে যারা মাসের পর মাস কোম্পানির ভ্যালুয়েবল সময় অপচয় করে আমি তাদের দলে নই। লোকটার নাম বীরেশ্বর, অ্যালিয়াস বিশু, অ্যালিয়াস বিশে! ফ্যামিলি নেম ব্যানার্জি অর বন্দ্যোপাধ্যায়। গোত্র শাণ্ডিল্য। সবচেয়ে দুঃখের কথা আমাদের কোম্পানির প্রাক্তন কর্মীর ছেলে—বিপথগামী পুত্র বলতে পারেন। আশু ব্যানার্জিকে আপনিও দেখেননি, আমিও দেখিনি। খুব শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন, কেরানি হিসেবে নাম ছিল। কর্মরত অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। আশুবাবু মরবার আগে লাস্ট চিঠি লিখেছিলেন কোম্পানিকে। শেষ অনুরোধ, তাঁর ছেলে জেলে রয়েছে সে বেরিয়ে এলে তাকে যেন কিছু একটা সুযোগ দেওয়া হয়। এতদিন পরে জেল থেকে বেরিয়ে সেই ছেলে এখানে ঘোরাঘুরি করছে। ইউনিয়নকেও ধরেছে।"

বীরেশ্বরের ফাইলটা গণেশবাবু পাঠিয়েছিলেন সকালে, যেটা কুমারেশের টেবিলে এখনও পড়ে রয়েছে।

বীরেশ্বর ব্যানার্জিকে নিয়ে ইউনিয়ন ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছে। কাকের গাব গেলার মতন অবস্থা। কর্মরত অবস্থায় যাঁরা মরেছেন তাঁদের ওয়ারিশনদের সুযোগ দেবার জন্যে ফাইট করেছে ইউনিয়ন। নেওয়া হয়েছে! এখন একে নিয়ে কী হবে? বিশেষ করে মরার আগে আশুবাবু অমন একটা করুণ আবেদন করে গেলেন।

ইউনিয়ন লিখিতভাবে সাপোর্ট করেছে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে অস্বস্তিতে পড়েছে। আপিসের মধ্যে এক জেলখাটা আসামীকে রাখা।

"জেল খাটাবার হিসট্রি থাকলে তো চাকরি দেওয়া যায় না?"

"জওহরলাল নেহরুও তো তেরো বছর জেল খেটেছেন। এখন স্যার নতুন সব থিওরি। অপরাধ করেছে, শাস্তি হয়েছে, জেল খেটেছে, ফিনিশ। জেলের কর্তারাই আজকাল প্রাক্তন বন্দিদের কাজের জন্য লেখালেখি করছেন।"

নানা জনের নানা মত, অনেকের গোপন ইচ্ছা জেনে ফেলেছে কুমারেশ।

পরিতোষবাবু :

ইউনিয়ন নেতা হিসেবে প্যাঁচে পড়ে গিয়েছি। রেকমন্ড করতে হয় করছি, কিন্তু ফলো আপ করব না। কোম্পানি বুঝবে, আফটার অল যে লোক একটা মার্ডার করেছে, সে নিশ্চয় বদমেজাজি। মানুষ তো শাস্তি পেলেও পাল্টায় না। ইউনিয়ন সম্পর্কে শ্রদ্ধা থাকবে এমন গ্যারান্টি নেই।

মীনা পাল :

ও মা! খুনে আসামী সারাক্ষণ কাছাকাছি বসে থাকবে! কে জানে হয়তো এই রিসেপশনেই চাপরাশির ডিউটি পাবে। আমার ভীষণ ভয় করে, ডালকুত্তা, অ্যালসেশিয়ান আর আসামী। এদের চোখগুলো কী রকম যেন হয়!

সত্যেন বোস :

এইসব লোক আপিসের ভিতর নয়। কোম্পানি অতো বোকা নয়। আদৌ যদি নিতে বাধ্য হয় তা হলে সিকিউরিটিতে, গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, ভিতরে মুখ দেখতে হবে না।

রুমা রায় :

কোম্পানি বুঝুক। আপিসের মধ্যে কেন বাবা? কী রকম ভয়-ভয় করে। মেয়েদের নিরাপত্তার কথাও তো ভাবতে হবে। জেল থেকে বেরিয়ে করুক না বিজনেস। স্বনির্ভরতা প্রকল্পে অনেকেই তো করে খাচ্ছে।

ভবানী ভদ্র :

আশুদার ছেলেটা! ভীষণ অস্বস্তি লাগে। আশুদার আবার এই ছেলেটার জন্যে চাপা গর্ব ছিল। স্নেহ সত্যিই অন্ধ। জেলে চিঠি লিখতেন, মাঝে-মাঝে বহরমপুর জেলে চলে যেতেন।

কুমারেশকে এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে না। ক্যাজুয়াল বেয়ারার

চাকরির আবেদনে কোনো দায়দায়িত্ব নেই। শুধু ওই আশু ব্যানার্জির সেন্টিমেন্ট ছাড়া, একটা চলে-যাওয়া মানুষের অন্তিম ইচ্ছা। কিন্তু ডেফিনেটলি ছেলেটা খারাপ কাজ করেছে তার ঘরে ওইভাবে ঢুকে পড়ে। যদিও কুমারেশ বুঝতে পারছে, লোকটা সেই ভোরবেলা থেকে অপেক্ষা করছিল।

লোকটার গালের ওই দাগটা ভুলতে পারছে না কুমারেশ। কেন যে লোকটা ঘরে ঢুকে পড়ল, বেশ শান্তিতে ছিল কুমারেশ। লোকটা কেমন সহজে স্বীকার করে নিল সে খুন করেছিল। এগারো বছরের সশ্রম জেলজীবন যেন সহজে মেনে নিয়েছে! এখন সে কেবল বেঁচে থাকতে চায়। একটা কাজকর্ম না-হলে জীবনধারণ সম্ভব নয়।

লোকটার চাকরি হওয়া শক্ত। ব্যবসা-বাণিজ্য করা উচিত, কুমারেশ ভাবল। তারপর হঠাৎ মনে হলো, ব্যবসা মানে তো প্রতি মুহূর্তে আরও লোকজনের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ। কে এই দাগী আসামীর সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ চাইবে? অস্বস্তি আসতে বাধ্য। ওই কাটা দাগটা না থাকলে ভালো হতো। দাগটা কেন?

আপিসের লোকরা ঘড়ি দেখে বাড়ি চলে গিয়েছে। আজ থেকে নো ওভারটাইম, সুরজিৎ সরকার পরামর্শ দিয়েছে। গণেশ গাঙ্গুলির শালীর ফুলশয্যা। অফিসের গাড়ি হাতিয়ে তিনিও আগে চলে গিয়েছেন।

কুমারেশ চারতলা থেকে একতলায় নেমে এসেছে। এ-বাড়িতে বেশ কয়েকটা আপিস আছে। বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটা ঢাকা প্রাইভেট প্যাসেজ। ওইখানেই বিশিষ্ট আপিসের বিশিষ্ট সায়েবদের দারোয়ান বীরবাহাদুর সেলাম ঠোকে, গাড়ি ডেকে দেয়।

আজ গাড়ি নেই সায়েবের। হুইসল দিয়ে কুমারেশকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিল দারোয়ান।

সেই সময় আবার ব্যাপারটা ঘটল। লোকটা, সেই লোকটা তখনও গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

দারোয়ান বলল, স্যার, লোকটা আজ এই প্রাইভেট প্যাসেজে রাত কাটাতে চাইছে। কুমারেশ হ্যাঁ না কিছুই উত্তর দিল না। এ ব্যাপারে তিনি

বলবার কে?

লোকটা হাসছে। কুমারেশকে বলছে, "আপনাকে বিপদে ফেলে দিয়েছি স্যার। আমি তখন বলতে পারিনি। আমার মা আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। আমি বলেছিলাম আগাম চিঠি না পাঠিয়ে সায়েবদের সঙ্গে দেখা করার নিয়ম নেই। মা শুনলেন না।"

লোকটার মা অবশ্য একটা চিঠি লিখেছেন, কুমারেশ চ্যাটার্জির নামে। লোকটা এবার চিঠিটা এগিয়ে দিল কুমারেশের দিকে। দারোয়ান ইতিমধ্যে লোকটাকে টানছে। "তোমার আস্পর্ধা কম নয়, সায়েবকে রাস্তায় পাকড়েছো, চিঠি দেবার থাকলে আপিসে জমা দেবে।"

লোকটাকে এবার দূরে সরিয়ে দিয়েছে দারোয়ান। বলছে, "এই হাঙ্গামার আদমিকে আপনার আপিসের ভবানী ভদ্রবাবু টিফিন করবার জন্য পকেট থেকে দশ টাকা দিয়ে গেলেন।"

ঠোঁট চেপে. মাথা নিচু করে গাড়িতে ঢুকে পড়ল কুমারেশ। এবার ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

ইরাবতী! মিষ্টি ইরাবতী নিজে দরজা খুলে দিল কুমারেশকে।

আজ প্রিয়তমের নিঃশর্ত সারেন্ডার নেবার জন্যেই যেন প্রস্তুতি নিয়েছে ইরাবতী। স্নান সেরে নিয়েছে, মাধুর্যের ঢল নেমেছে ইরাবতীর দেহে। ওর খোলামেলা শরীরে ফরাসি পারফিউম 'সংসার'-এর মায়ামোহ।

এই মেয়ে একদিন মিসেস কুমারেশ চ্যাটার্জি হবে। তখন আর কোনো অন্যায়বোধ থাকবে না কুমারেশের মনে। ইরাবতী তো বলেইছে, তখন সারাক্ষণের কাজের মেয়েটাকে নিয়েও কোনো চিন্তা থাকবে না। ও নিজেই কুমারেশকে জামাইবাবু বলবে, ইরাবতী ও কুমারেশকে বেডরুমে ঢুকতে দেখলে সে মোটেই আশ্চর্য হবে না। বরং ওদের এক ঘরে রেখে সে বাইরে অপেক্ষা করবে, টোকা না দিয়ে কখনও ঘরে ঢুকবে না। তখন কোনো ব্যাপারেই কুমারেশকে কিন্তু-কিন্তু করতে হবে না, মাথাও ঘামাতে হবে না লোকের কাছে কৈফিয়ত দেবার জন্যে।

অফিস থেকে ইরাবতীর এই বাড়িতে ফিরে অনেক সময় স্নান করার ইচ্ছে হয়েছে কুমারেশের। কিন্তু সম্ভব হয়নি। ওই মেয়েটা কী ভাববে?

অফিসের কোনো লোক তো কাজের জন্যে এসে মহিলার বাথরুমে স্নান করে না, বড়জোর ড্রয়িংরুমে বসে চা খায়।

আরও অনেক সব ইচ্ছে আছে কুমারেশের এবং ইরাবতীর। একটা স্পেশাল যুগল ছবি তোলানো দরকার। এখনই তোলানো যায়, কিন্তু ওই বেরসিক উকিল! বারণ করেছে। এখনই পরপুরুষের সঙ্গে ছবি তোলাবেন না, স্টুডিওতে একটা অস্বস্তিকর সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে যাবে।

ও মা! পরপুরুষ হলো কুমারেশ। আর এখনও স্বামী দেবতার আসনে বসে থাকল পীতাম্বর মিশ্র যার সঙ্গে আদালতে মামলা চলছে। তোমরা মামলার নিষ্পত্তি না করে ব্রিফের ওপরে মাসের পর মাস বসে থাকবে আর তার জন্যে কুমারেশ হয়ে থাকবে অন্য পুরুষ—ইরাবতীর ফ্ল্যাটে এসে স্নান করার সাহস পর্যন্ত থাকবে না।

কী হলো আজ ইরাবতীর?

কুমারেশের অনুরোধে সে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে দিল। তারপর অঙ্গ স্পর্শ করে কুমারেশকে সোজা নিজের ঘরে নিয়ে গেল ইরাবতী। যে ঘরে সে নিঃসঙ্গ রাত্রিবাস করে। কী চমৎকার সাজানো হয়েছে ঘরটা। ইরাবতীর রুচি আছে, সংসার সুন্দর করে রাখবার প্রবণতা আছে ইরাবতীর মধ্যে।

কুমারেশ ভাবছিল এই ফ্ল্যাটের কাজের মেয়েটির কথা। নিশ্চয় রান্নাঘরে কিছু করছে দিদির অতিথির জন্যে। কিন্তু ইরাবতী নিজে এবার অদৃশ্য হলো। ফিরে এলো কয়েক মিনিটে। কিছু খাবার সে নিজেই হাতে করে নিয়ে এসেছে।

ইরাবতী একটা ঢাকাই শাড়ি পরেছে। এর আগের দিন ইরাবতীকে শিফন শাড়ি পরা অবস্থায় রাস্তায় দেখেছে কুমারেশ। ভালো লাগেনি। গায়ে লেপটানো শাড়িতে ওকে একটু রোগা দেখায়। যদিও বুকের কুসুম দুটি একটু বেশি স্পষ্ট হয়ে থাকে। এই ঢাকাই শাড়ি শরীরকে সামান্য বেশি ঢেকে রেখেও পরিপূর্ণতা দিয়েছে ইরাবতীকে।

"এবার সারপ্রাইজ। একটা নয়, দুটো নয়, তিনটে সারপ্রাইজ।" ইরাবতী বলল, "প্রথম : চা করিনি, তোমার জন্যে। দ্বিতীয় : এই বোতলটা পেয়েছি কাল। একজন কাস্টমার উপহার দিল, ফ্লাইটে ডিউটি ফ্রি স্টোর থেকে নিয়েছে, আসল স্কচ।"

ইরাবতী জানে, কুমারেশ মাঝে-মাঝে ড্রিংক এনজয় করে। কিন্তু ওই পীতাম্বরের মতন নয়, যে ড্রিংক ছুঁতো না, অথচ মেয়ে মানুষের জন্যে পাগল। অতিমাত্রায় কামুকের সান্নিধ্যে সুখ ও শান্তি কোনোটাই পাওয়া যায় না। তৃতীয় : কাজের মেয়েটাকে সিনেমায় পাঠিয়েছে ইরাবতী। "কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে বাড়ি ফিরবে না", ফিসফিস করে খবর দিল ইরাবতী।

ওঃ কি চমৎকার আইডিয়া। ইরাবতীকে কাছে টেনে নিয়ে আচমকা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী একটা চুম্বন দেবে কুমারেশ। অন্তত পাঁচমিনিট স্থায়ী হবে সেই মৌখিক মিলন।

কুমারেশ মুখের দিকে তাকাচ্ছে ইরাবতী। মতলবটা বোধ হয় সে আন্দাজ করতে পারছে। এই চমৎকার স্বভাব ইরাবতীর। চুম্বন করতে ইচ্ছে হয় করো, তুমি তো আমার স্বামী হতে চলেছ।

নিজের বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রেখেই ইরাবতী গ্রহণ করল কুমারেশের স্বতঃপ্রণোদিত উপহার। প্রিয়তমের সংস্পর্শে আনন্দ পেল, কিন্তু স্রোতে ভেসে গেল না। স্রোতে হারিয়ে যাবার দিন তো সামনে পড়ে রয়েছে। ওর পেলব বইটি নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়েছে কুমারেশ—হাতের মালিকের আপত্তি নেই। এই শরীর তো তোমারই হতে চলেছে, শুধু উকিলের কাগজটা পাওয়ার অপেক্ষায়।

কুমারেশ হিসেব করে নিয়েছে সিনেমা শেষ হতে-হতে ৯টা। ককটেল শুরু হতে-হতে সাড়ে সাতটা।

ইরাবতী বলল, "তোমার মুখটা তেল-তেল! ককটেলে যাবে।" স্নান না হলেও মুখে একটু সাবান দেওয়ার অসুবিধে নেই। এই ঘরের লাগোয়া একটা বাথরুম আছে সেখানেই ঢুকিয়ে দিল ইরাবতী। এগিয়ে দিল একটা ফ্রেশ টাওয়েল ও নতুন সাবান।

বাথরুমের দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে কুমারেশ। আরও একটা ব্যবহার করা সাবান রয়েছে ওখানে, বিয়ে হয়ে গেলে ইরাবতী ওই সাবানটাই নিশ্চয় কুমারেশের দিকে এগিয়ে দিত। এখন দেওয়া যায় না।

কুমারেশ দেখল, একটা কাঁচের গেলাসে একটা টুথ ব্রাশ ও টুথ পেস্ট। ওইখানেও আর একটা টুথ ব্রাশ স্থান পাবে। মাউথ ওয়াশের একটা শিশি রয়েছে। ওটা একটাই থাকবে। তারপর মেয়েদের অনেকগুলো প্রসাধনী।

ওসব আরও একটু বাড়বে। এয়ার কন্ডিশন মার্কেট থেকে ভালো ভালো জিনিস কিনে আনবে কুমারেশ। এই প্রসাধনীর সেটটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে—হ্যাঁ এগুলোই তো কুমারেশ কিছুদিন আগে উপহার দিয়েছিল ইরাবতীকে। ইরাবতীও একটা দামি শেভিং সেট কিনে এনেছিল কোথা থেকে। ওই জিলেট সেটটা এক বাথরুম থেকে অন্য বাথরুমে চলে আসবে যথা সময়ে।

বেসিনের সামনের আয়নায় নিজের মুখ দেখেছে কুমারেশ। ওখানে একটা চিরুনি রয়েছে ব্রাশের মধ্যে। ওটা নিতে পারে কুমারেশ অবশ্যই—কিন্তু বিয়ের পর তা হলে তো কিছুই পাবার থাকবে না। নিজের মানিব্যাগে রাখা ছোট্ট চিরুনিটা বের করল কুমারেশ।

বাথরুমের দরজার হ্যাঙারে দুটি বস্ত্রখণ্ড ঝুলছে। একটা পিংক রঙের নাইটি। আর একটা ওভারকোটের মতন। এ-সি মার্কেটে টার্কিশ টাওয়ালের লেডিজ কোর্ট দেখেছে কুমারেশ। স্নানের পর ভিজে শরীরকে শুকনো করার পক্ষে চমৎকার। ওইরকম একটা কিনে দেবে ইরাবতীকে। দোকানে পোস্টারে একটা চমৎকার ছবি আছে, কিন্তু ইরাবতীকে, ওই বিজ্ঞাপনের মহিলা থেকে আরও সুন্দর দেখাবে ওকে। মানসচক্ষে ওই টাওয়েলে ইরাবতীকে আগামী তিন যুগ ধরে নানা ভঙ্গিমায় দেখতে পাচ্ছে কুমারেশ। ইরাবতীর সামনের কয়েকটা চুলে ইন্দিরা-স্টাইলে পাক ধরেছে এমন একটা ছবিও দেখে নিল কুমারেশ, ভালো লাগছে। অনাবৃতা নিরাভরণা ইরাবতীকেও মানসচক্ষে দেখতে গিয়ে একটু লজ্জা পেল কুমারেশ নিজের কাছে।

ভালো লাগাটাই আসল প্রেম। ইরাবতীর শরীরে আরও যেসব ইরাবতী রয়েছে তাদের ভীষণ ভালো লাগছে কুমারেশের। কুমারেশ আর একবার আয়নার দিকে তাকাল। এমন চমৎকার ইরাবতী অন্য একটা অপদার্থ লোকের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। "কিন্তু পীতাম্বর, তুমি যদি ইরাবতীকে রাখতে না জানো তাহলে কুমারেশ চ্যাটার্জি কী করতে পারে? আমি তো তোমার ঘর ভাঙিনি। তুমি নিজেই ভেঙে বসে আছো। আমি না এলে এখানে অন্য কেউ এসে হাজির হতো। মিশ্রজী, আমাদের মনে রাখতে হবে, ইরাবতীর মতো মেয়ে সস্তা নয়, ডজন-ডজন ইরাবতী ব্যাচেলরদের জন্যে ঘুরছে না।"

মায়ের কথাও মনে হচ্ছে। মার তো অন্য আপত্তি হবে না, স্রেফ ওই একবার বিয়ে-হওয়া বউ দ্বিতীয়বার ফুলশয্যায় যাবে কী করে? সেকেন্ড হ্যান্ড? খোলাখুলি বলো না। পৃথিবীতে একটাই জিনিস আছে, যা কখনও সেকেন্ড হ্যান্ড হয় না—তার নাম সোনা। পালিশ করলেই নতুন, গালালেই নতুন। ইরাবতী তো অপ্রাপ্তির আগুনে গলে পুনরায় বধূ হয়ে যখন কুমারেশের শয্যাসঙ্গিনী হবে তখন সে তো সর্বার্থে নতুন—নবজন্মের নবনীতা তার সমস্ত শরীরে প্রকাশিত হবে। মাকে ব্যাপারটা বোঝাতে হবে।

ইরাবতী একবার জিজ্ঞেস করেছিল কুমারেশের অতীত। নারী সান্নিধ্যের নিবিড় কোনো ইতিহাস নেই কুমারেশের জীবন অধ্যায়ে, কৌমার্য থেকে সে একেবারে উপনীত হবে স্রোতস্বিনী ইরাবতী বক্ষে।

ইরাবতী বলেছে, "দেখো, তোমার মা ভীষণ আপত্তি করবেন। তখন যদি তোমার ইচ্ছে করে যিনি তোমাকে কষ্ট করে মানুষ করেছেন তাঁর কথা শুনতে?"

কুমারেশ তখন আবার কাছে টেনে নিয়েছে ইরাবতীকে। "দু'জনে মিলে ওঁকে বোঝাব। তোমার ওই ইনোসেন্ট মিষ্টি মুখের দিকে তাকিয়ে মা তাঁর আপত্তি ফিরিয়ে নেবেন।"

ইনোসেন্টই বটে। "একজনের সঙ্গে সাড়ে তিন বছর সংসার করেছি। ভাগ্য ভালো বেবিতে জড়িয়ে পড়িনি।" আর একজনের সঙ্গে দেড় বছর সম্পর্ক করছি—সকলের দৃষ্টি বাঁচিয়ে। উঃ কী শক্ত এই কাজ। এই লুকোচুরি ব্যাপারটা ভালো লাগে না। একবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, কুমারেশকে নিয়ে দু'জনে কোথাও চলে যায়, কোনো পাহাড়ে অথবা সমুদ্রতীরে দিন কয়েকের জন্যে। ওই উকিলটা বারণ করল, বলল, "মামলা খারাপ হতে পারে।"

কুমারেশ বলেছে, "বিয়ের পর সাতদিন-সাত রাত একটা হনিমুন সুইট বুক করে রাখব। দুনিয়ার লোক, ইনক্লুডিং ওই উকিল, ওই পীতাম্বর মিশ্র দেখবে সুইটের বন্ধ দরজা খুলছেই না, বুক জ্বলবে, তবু কিছু করতে পারবে না।"

ইরাবতী উত্তর দিয়েছে, "তোমার যা ইচ্ছে তাই কোরো। আমার সমস্ত

তো তোমারই জন্যে তোলা রয়েছে।"

"কেন তোমার নিজস্ব ইচ্ছে নেই, ইরাবতী?"

"তখন তোমার ইচ্ছেই তো আমার ইচ্ছে," ইরাবতী বলেছে। এই অপেক্ষা ইরাবতীর কাছেও মাঝে-মাঝে অসহ্য মনে হয়। যখন ভীষণ দুঃখ হয় তখন মনটাকে বোঝাতে হয়। এই যে ভবিষ্যৎ স্বামীকে লুকিয়ে-চুরিয়ে পাওয়া, নিজের হয়েও নয় বলে সমাজে অভিনয় করা এর মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। এই সেদিন এক পার্টিতে দু'জনে দেখা হলো। ভিড়ের মধ্যে কুমারেশ কেমন 'আপনি', 'আপনি' করল, মিসেস ইরাবতী মিশ্র বলে সম্বোধন করল। এর মধ্যে থ্রিল আছে। এমন ভাব যেন ইরাবতীর কিছুই জানে না কুমারেশ। পরস্ত্রীর সঙ্গে দূরত্ব রেখে ভক্তিভরে কথা বলছে একজন ইয়ং ভদ্রলোক, আর অন্য লোকেরা হাঁদাগঙ্গারাম বনে তা বিশ্বাস করছে। অথচ ইরাবতীর শরীরের সমস্ত ঠিকানা জানা হয়ে গিয়েছে ওই কুমারেশের। পরে কুমারেশ বলেছে, "কী কষ্ট করে যে সেদিন নিজেকে সামলেছি। তোমার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে ধরতে, তোমাকে ইরা বলে ডাকতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল। কোন দুঃখে তুমি ওই মিসেস মিশ্র হতে যাবে? তুমি তো আমার, তুমি কুমারেশ চ্যাটার্জির অর্ধাঙ্গিনী।"

এসব কথাতেও ইরাবতীর মন বুঝতে চায় না। সময়, মূল্যবান সময় অযথা বয়ে যাচ্ছে। সাড়ে তিনটে বছর বিফল অপেক্ষায় নষ্ট হয়েছে, ওই বিশ্রী মানুষটার সঙ্গে সহস্র অতৃপ্ত রজনী যাপন করতে হয়েছে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ভাবা যায় না। রজনীর মূল্য অনেক—মানুষের জীবনে তো সংখ্যাহীন রজনী থাকে না।

এই প্রতীক্ষার পক্ষে একটাই বলবার থাকে। কুমারেশকে নানা পরীক্ষার মধ্যে উত্তীর্ণ হতে দেখছে ইরাবতী। মানুষটা ধীরে-ধীরে ম্যাচিওর করেছে। যখন দু'জনের বিয়েটা হবে তখন অনভিজ্ঞতার অন্ধকারটা তেমন থাকবে না। সেইটাই লাভ। সেই পরিণতিটাই প্রাপ্তি।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ইরাবতীর দিকে তাকিয়েছে কুমারেশ। ইরাবতীও তাকাচ্ছে কুমারেশের দিকে। কপালে, চুলের ধারে এখনও একটু জল লেগে রয়েছে। ইরাবতীর ইচ্ছে হয়েছে, টাওয়েলটা নিয়ে সযত্নে ওর মুখটা আরও একটু মুছে দেয়, কিন্তু নিজেকে সংযত রাখতে হচ্ছে। এসব

করা যাবে যখন কুমারেশকে স্বামী হিসেবে পাওয়া যাবে। আপাতত ওকে খাইয়ে সুখ। ফেস পাউডার তো ঘরেই রয়েছে, কিন্তু বলতে পারল না ইরাবতী।

দু'জনে একসঙ্গে খেয়েছে। কুমারেশ লোভ সামলাতে পারেনি। অনুমতি চেয়ে, অথচ অনুমতির জন্যে অপেক্ষা না করে সে ইরাবতীকে চুম্বন করেছে। ভালোই করেছে কুমারেশ, বাধা দেবার মতো সুযোগ দিয়েছে কিন্তু আহ্বান জানাবার মতন নির্লজ্জতায় ফেলেনি ইরাবতীকে। বিয়ের পর এইসব পরিস্থিতিকে ভীষণ উত্তপ্ত করে বাধাবন্ধহীন হয়ে দীর্ঘ এই প্রতীক্ষার উসুল নেবে ইরাবতী।

কুমারেশ বাঁধ ভাঙার সুযোগ পেয়েও নিজেকে সম্পূর্ণ বেপরোয়া করে তুলছে না। মানুষটার মধ্যে ভীষণ ভব্যতা কাজ করে। স্রোত আছে কিন্তু বিধ্বংসী বন্যা নেই, এইটাই ওকে শ্রদ্ধেয় করে তোলে ইরাবতীর কাছে।

কুমারেশ স্রোতে ভেসে যায়নি, কিন্তু ইরাবতী সান্নিধ্যর প্রতিটি মুহূর্ত সে উপভোগ করেছে। কুমারেশ জানে কোনো মানুষ তার কাজের মেয়েকে রোজ সিনেমায় ঠেলে পাঠাতে পারবে না। তাই হুট করে ঠিক করে বসল, সে আজ ককটেলে যাবে না। এইখানেই থেকে যাবে আরও কিছুক্ষণ। কুমারেশ আরও জানে কাজের মেয়েটি সিনেমা থেকে ফিরবার আগে এ-বাড়ি থেকে কুমারেশ চলে যেতে পারলে আরও ভালো হয় ইরাবতীর পক্ষে। অন্তত এইভাবে, ইরাবতীর বেডরুমে কুমারেশের বসে থাকাটা ভালো হবে না।

বেডরুম। বিছানা আছে। ডবল বেড সাইজের থেকে একটু সরু। খুব বোঝাবুঝি না থাকলে এই আকারের বেডে দু'জনে রাত্রিযাপন সম্ভব নয়। কুমারেশ এখন কিছু কথা তুলবে না, বিয়ের ঠিক আগেই এই বেডটা পাল্টে নেবে। কিন্তু এখন কথাটা কী রকম অশোভন মনে হতে পারে। সেই সময় জিজ্ঞেস করবে কুমারেশ, একটা বড় খাট না দুটো সিংগল খাট পছন্দ করবে ইরাবতী? ইরাবতী যা চাইবে কুমারেশ তাতেই মত দেবে।

আপাতত বিছানাটা খালি রেখে দু'টি চরিত্র দু'টি ছোট চেয়ারে মুখোমুখি বসে আছে। মধ্যিখানে একটা ছোট্ট টেবিল হাইফেনের কাজ করছে। দূরে একটা আয়নায় কিছুটা প্রতিফলন ঘটছে, কুমারেশ মাঝে-

মাঝে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে। আবেগের মুহূর্তে মানুষ এক-এক সময় নিজেকে হারিয়ে ফেলে, সেই সময় নিজেকে দেখতে পেলে কাজ হয়। নিজের রাশ নিজে টেনে ধরা যায়।

এই টেবিলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইরাবতী সাজিয়ে দিয়েছে উপহার পাওয়া পানীয়। নিয়মিত ড্রিংক অবশ্যই করে না কুমারেশ, কিন্তু পার্টিতে গেলে বোষ্টম সেজেও বসে থাকে না। ইরাবতী জানে কেউ-কেউ ককটেলে যাবার আগেই বাড়িতে নিভৃতে একটু পান করে নেয়, 'জমি' তৈরি করে নেবার জন্যে।

খালি বিছানার দিকে ইরাবতীরও নজর পড়ে গিয়েছে। এই ঘরে এইভাবে কুমারেশকে ডেকে এনে অবশ্যই একটু দুঃসাহস দেখিয়ে ফেলেছে ইরাবতী। কিন্তু তাই তো হওয়া উচিত। মানুষ এই পরিস্থিতিতে কী রকম ব্যবহার করে তাতেই তো তাকে চেনা যায়। তা ছাড়া ইরাবতীর দুশ্চিন্তা আছে। মামলাটা বড় বেশি সময় লাগছে, একটা মানুষকে কতদিন আর দূরে সরিয়ে রাখা নিরাপদ? সে যদি অধৈর্য হয়ে ওঠে তবে তার ইচ্ছায় সম্মতি দেওয়া ছাড়া উপায় কোথায়?

খালি বিছানা অবশ্য চিরদিন খালি থাকছে না। ফুলশয্যার কথা মনে আসছে। কোথায় যেন পড়েছিল ইরাবতী পুনর্বিবাহিত দুই ডাইভোর্সি পুরুষ ও মহিলার মিলনরাত্রে বিছানায় দু'জন নয় চারজন মানুষের উপস্থিতি থাকে। অন্তত ইরাবতী ও কুমারেশের ক্ষেত্রে একজন বসে থাকবে, কারণ কুমারেশ কুমার। নিজেকে মানিয়ে নেবার সব দায়দায়িত্ব থাকবে ইরাবতীর ওপর, কুমারেশের কথা ভেবেই পুরনো ইতিহাসটা মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলবে ইরাবতী। শক্ত হলেও একেবারে অসম্ভব হবে না কাজটা, মনটা তো পার্থিব হয়েও অপার্থিব, তাকে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, কেবল অনুভব করা যায়।

আজ কি কুমারেশ একটু অন্যমনস্ক? ওই যা ঘটে গিয়েছে অফিসে, তাতে কি মনটা একটু বিব্রত? ইরাবতী বিশ্বাস করছে না ওই বিশু ঘরে ঢুকেছিল কুমারেশের ওপর আঘাত হানতে।

কুমারেশ নিজেও বিশ্বাস করে না। গণেশ গাঙ্গুলির সব ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়ি রয়েছে। কিন্তু কুমারেশ কিছুতেই ভুলতে পারছে না লোকটা

যেভাবে তার ঘরে ঢুকে পড়ে দাঁড়িয়েছিল, কেমন অবলীলাক্রমে বলে গেল সে জেল থেকে দীর্ঘদিন পরে বেরিয়ে এসেছে।

"আসলে কোনো সিরিয়াস অপরাধীকে আমি কোনোদিন এইভাবে এত কাছ থেকে এমনভাবে দেখিনি, ইরাবতী। এগারো বছর তাকে তো জেলে আটকে রাখা হয়নি ফর নাথিং। তেমন একটা ডেঞ্জারাস কিছু না করলে কেন এগারো বছর কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে?"

লোকটাকে ভুলে যাবার পরামর্শ দিচ্ছে ইরাবতী। "কে কোথা থেকে এসে তোমার ঘরে ঢুকে কী বলল তাতে কী এসে যায়?"

কুমারেশ ইতিমধ্যেই কিছুটা ড্রিংক করেছে। "পয়েন্ট হচ্ছে, এই ধরনের একটা জেলখাটা লোককে আপিসে ঢোকানো ঠিক হবে কিনা।"

ইরাবতী বলল, "আমাদের অফিসে একটা লোক আছে, সে বলে—প্রত্যেক মানুষ যদি নিজেকে খুঁটিয়ে দেখে তা হলে এমন কয়েকটা ঘটনা খুঁজে পাবে যার জন্যে তার জেল হতে পারত। যত অন্যায় কাজ পৃথিবীতে হয় তার ঠিকমতো শাস্তি হলে জেলখানায় জায়গা হতো না, সমস্ত পৃথিবীটা জেলখানা হয়ে দাঁড়ত।"

"ইরা তোমার অফিসের এই লোকটা তো ইন্টারেস্টিং।"

"ভীষণ ইন্টারেস্টিং। একসময় নকশাল না কি হয়ে শহরে লোকের গলা কেটেছে, তারপর শান্ত হয়ে চাকরিতে ঢুকে পড়েছে। ভাগ্যে ধরা পড়েনি।"

ইরাবতীর এই কথাগুলো কুমারেশকে অফিসে বলার কেউ নেই কেন? "ইরাবতী, তুমি ভীষণ ইন্টারেস্টিং কথা বলছ।" আগে শুনলে ওই বিশুর সঙ্গে কুমারেশ আর একটু কথা বলত, অন্তত ওই নিচে নেমে এসে ট্যাক্সি ধরার সময়।

ইরাবতী এখন কুমারেশের গেলাসে আর একটু ড্রিংক ঢেলে দিল। সে নিজে কিন্তু ড্রিংক করছে না। "ভালো, যে তার বধূ হতে চলেছে তার এই ড্রিংকের মধ্যে না-থাকাই ভালো।" কুমারেশ ভাবল।

ইরাবতী বলল, "একদিন দেখি অফিসের ওই লোকটা ভীষণ এক্সাইটেড। একটা অফিসে এয়ারলাইন টিকিট দিতে গিয়েছিল। যে-লোকটা তার খরিদ্দার, তার গলায় মস্ত দাগ। শহরের খুব খারাপ সময়ে

ওর গলা কাটার চেষ্টা হয়েছিল। কোনোরকমে বেঁচে গিয়েছিল। আমাদের লোকটা ভীষণ আপসেট, কারণ এই মানুষটাকেই কাটতে গিয়েছিল আমার আপিসের এই লোকটা।"

ইরাবতীর কাছে লোকটা কিছু গোপন রাখেনি। কিন্তু ভীষণ উত্তেজিত হয়েছিল, বলেছিল আমাকে ওই কাস্টমারের কাছে আর পাঠাবেন না। আমার শরীরটা কেমন করে ওঠে।

বাইরে হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠেছে। কাজের মেয়েটার তো এখনও ফিরে আসবার সময় হয়নি। আবার কে এল?

কুমারেশ কি এখনই ড্রয়িং রুমে এসে বসবে? ইরাবতী কিন্তু বেপরোয়া। যেই আসুক, তাকে দরজা থেকে বিদায় করে দিয়ে ফিরে আসছে সে সুখসঙ্গের অংশীদার হতে।

না, কুমারেশের জন্যে ইরাবতী সামান্য বিপদেও পড়ুক তা চায় না সে।

"তুমি বেডরুমের দরজাটা ভেজিয়ে বোসো, আমি দরজার কাঁচ দিয়ে দেখে আসছি!" ইরাবতী বলল।

কুমারেশ ভাবছে, ভালো কথা বলেছে ইরাবতী। প্রত্যেক মানুষের উচিত মাঝে-মাঝে নিজের হিসেবটা খতিয়ে দেখা, কতবার সে আইনলঙ্ঘন করেছে যার জন্যে আদালতে তার শাস্তি হতে পারত।

সিনেমা মস্তানদের মতন হুড়মুড় করে চোখের সামনে অজস্র দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে কুমারেশ। চুরি করলে কতদিন জেল হয়?

দশ বছর ধরে প্রতিদিন বাজার করেছে কুমারেশ এবং প্রতিদিন বাজার থেকে পয়সা সরিয়েছে কুমারেশ। ছত্রিশশ অপরাধ! একমাস করে জেল হলেও তো সারাজীবন কেটে যাবে জেলে। একবার একটা ছেলে কুমারেশের কাছে একটা জিনিস রেখে গিয়েছিল। সেটা দেওয়া হয়নি—কুমারেশ সেই দামী ঝরনা কলমটা অনেকদিন ব্যবহার করেছে। সেই পেনে সমস্ত পরীক্ষা দিয়েছে কুমারেশ। চোরাই জিনিস খাটিয়ে ব্যবসা করলে তা সব বোধহয় বাজেয়াপ্ত হতে পারে। সেই সঙ্গে জেল হতে পারে।

চলন্ত বাসে ওঠানামা করাও তো বেআইনি। সেই কাজ বছরের পর বছর করেছে কুমারেশ। বিনা টিকিটে ভ্রমণও তো অপরাধ—কন্ডাক্টরকে

ফাঁকি দিয়ে যাতায়াত তো এক ধরনের খেলা ছিল কুমারেশের ছাত্রজীবনে। সেই পয়সায় চা খাওয়া হতো। একবার এক কন্ডাক্টরকে সবাই মিলে বেধড়ক মেরেছিল ওরা—কন্ডাক্টর গায়ে হাত দিয়ে টিকিটের তাগাদা দিয়েছিল বলে।

ব্ল্যাকে সিনেমার টিকিট কেনা, রেলের টিকিট কেনা সেও তো বেআইনি। কতবার যে ওই কাজ করেছে কুমারেশ তার কোনো হিসেব নেই। মজা করে, দু'একবার নিজেরাও সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করেছে কুমারেশ।

সেবার চাঁদা করে টাকা তুলে পরীক্ষার আগে চোরাই কোশ্চেন পেপার কিনেছে কুমারেশ। পরীক্ষায় একটু ভালো ফল হয়েছে সেজন্যে। তারপর প্রফেসর হরিধন ভট্টাচার্য—কড়াভাবে খাতা দেখেছেন বলে তাঁকে দিনের পর দিন উড়ো টেলিফোনে ভয় দেখিয়েছে কুমারেশ এবং তার বন্ধুরা। সাধারণ ভয় নয়, জান থাকবে না, বউ বিধবা হবে, এমন কথাও বলেছে কুমারেশ।

কুমারেশ কেন নিজেকে মিথ্যে কথা বলবে, অফিসে ফল্স বিল সে করেছে কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়ে। কুমারেশ সরকারি কর্মচারীকে ঘুষ দিয়েছে—ঘুষ না দিলে কাজ হবে না বলে। কুমারেশ সেবার কোম্পানির হয়ে বাড়তি ফায়ার ইনসিওর ক্লেম করেছে লাভের মাত্রা একটু বাড়াবে বলে। আবার এই কুমারেশই এখন জজের ভূমিকায় অন্যের বিচার করছে।

আর একবার কুমারেশ মোটর সাইকেল চালাতে-চালাতে পথের অন্ধকারে এক বৃদ্ধাকে ধাক্কা মেরেছিল, সাংঘাতিকভাবে। দুর্ঘটনার পর কুমারেশের দাঁড়ানো উচিত ছিল, হতভাগ্যকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করা উচিত ছিল। কিছুই করেনি কুমারেশ। ভয়ে। পরের দিন সকালেও গাড়ির চাকায় রক্ত লেগেছিল, সেই দাগ বালতি-বালতি জলে নিজেই ধুয়েছিল কুমারেশ। অনুশোচনা হয়েছে, দুঃখ হয়েছে, কিন্তু ভয় কাটেনি। সেই থেকে মোটর সাইকেল চড়া ছেড়ে দিয়েছে কুমারেশ, কিন্তু ঘটনাটা ভোলো সম্ভব হয়নি। ওর নিশ্চিত ধারণা মহিলাকে সে মেরে ফেলেছে। মহিলার মাথার ওপর দিয়েই ওই মোটর সাইকেল চলে গিয়েছিল।

ইরাবতী ফিরে এসেছে। যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়! পাশের বাড়ির মেয়েরা এসেছিল তাদের নতুন বউকে নিয়ে গল্প করতে। খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিল ইরাবতী। "তারপর কোনোক্রমে মুখ বাড়িয়ে বলেছি, পুজোয় বসেছি।"

"পুজোতেই বসেছি! তাই না? স্বামী দেবতার পুজো।"

ইরাবতী নিজেই কুমারেশের মাথায়, কপালে, নাকে একটু হাত বুলিয়ে দিল। প্রতিদানে অন্তত একটা চুম্বন দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কুমারেশ অপরাধের তালিকায় জড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ দেখছে, হাজার-হাজার মামলায় সে আসামী হচ্ছে, হাজার-হাজার কাঠগড়ায় বিচারকের আসনের তলায় সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। হাজার-হাজার কুমারেশকে হাতকড়া পরিয়ে জেলখানার গাড়িতে তোলা হচ্ছে।

"কী মুড খারাপ হয়ে গেল নাকি?" ইরাবতীর আশঙ্কা আচমকা অনাহুত অতিথির আগমনে কুমারেশ অস্বস্তিতে পড়েছে।

ইরাবতী এবার বাথরুমে ঢুকল। তারপরে বেরিয়ে এল কুমারেশের চশমার খাপ ও কিছু কাগজপত্র নিয়ে। এইগুলো ভালো করে মুখ ধোবার সময় কুমারে ফেলে এসেছে ইরাবতীর বাথরুমে।

ইরাবতীর হাত থেকে ওগুলি নিয়ে পকেটে পুরতে গিয়ে কুমারেশের মনে পড়ল খুনের আসামী বিশু কিন্তু তার হাতে একটা চিঠি দিয়েছিল। চিঠিটা পকেটেই রয়েছে। সেই চিঠিটা এখন টানছে কুমারেশকে।

কুমারেশ ঝটপট চিঠিটা পড়ে ফেলল। লিখেছেন দাগী আসামী বিশুর মা নিভাননী ব্যানার্জি। কুমারেশের নামটাও বানান ভুল। ছোট্ট চিঠি : "নমস্কার জানিবেন। আমার স্বামী আশুতোষ ব্যানার্জি আপনার অফিসে কাজ করিতেন। আপনি তাঁহার অফিসের সায়েব তাই লিখিতে সাহস পাইতেছি। তাঁহার জীবদ্দশায় আমার কন্যাটি বিবাহের পরে খুন হয়। বড়লোক শ্বশুরবাড়ি, পুলিশ কিছু করে নাই, উপায় ছিল না, কিছু না করাও অন্যায় হইত, তাই আমার ছোট ছেলে বিশুকে শোকের মাথায় ইহার বিহিত করিতে বলিয়াছিলাম। মেয়ের দুষ্ট শ্বশুরকে খুন করিয়া সে থানায় গিয়াছিল, কোর্টেও দোষ অস্বীকার করে নাই। এগারো বছর পরে জেল হইতে ফিরিয়া সে কিছু করিতে চায়, কিন্তু অন্নসংস্থান সম্ভব হইতেছে না।

আমার স্বামীর শেষ ইচ্ছা ছিল বিশুকে তাঁহার অফিসে কিছু ব্যবস্থা করেন। তিনি নাই। আপনি, সায়েব, তাই লিখিতেছি। অপরাধ লইবেন না। নমস্কার লইবেন। ইতি নিভাননী ব্যানার্জি।"

আরও কিছুক্ষণ কুমারেশ এই বেডরুমে বসতে পারত।

সিনেমা শেষ হয়েছে, কিন্তু বাড়িতে পৌঁছতে কাজের মেয়েটার অন্তত আরও কুড়ি মিনিট সময় লাগবে। ইরাবতীর ভীষণ ভালো লাগছে কুমারেশকে। ইচ্ছে করছে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ ওর মাথাটা আটকে রাখে, ওর চুলের মধ্যে আঙুল চালায়। ও যদি তার ফলে বেপরোয়া হয়ে ওঠে তো উঠুক। উকিলের সঙ্গে আজই তো দেখা করেছে ইরাবতী, উকিল তো বলেছেন এই সপ্তাহেই মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

তারপরে শুভ দিনক্ষণ দেখে ওরা স্বামী-স্ত্রী হবে। তখন আর কোনো ভয় থাকবে না। এর আগে তো উকিলবাবু সাবধান করে দিয়েছিলেন কুমারেশকে। অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ওই পীতাম্বর মিশ্র যদি সাক্ষ্যপ্রমাণ পায় এবং যদি প্রমাণ করতে পারে পীতাম্বরের বিবাহিতা স্ত্রী জেনেও আপনি ইরাবতীর সঙ্গে প্রণয় করছেন তা হলে আপনার জেল হতে পারে অনেকদিনের জন্যে।

অনেক বিক্ষুব্ধ স্বামী তাদের স্ত্রীর প্রেমিককে জেলে পাঠিয়েছে এইভাবে। ইরাবতী বলেছিল, অনেকেই তো এইভাবে প্রেম করে। উকিলবাবু বলেছিলেন, অনেকেই অপরাধ করেন, সবাই তো ধরা পড়ে জেল খাটেন না। উকিলবাবু আর একটা মজার কথা বলেছিলেন, নিষিদ্ধ প্রেমের অপরাধটা পুরুষের, মেয়ে হিসেবে পুলিশ আপনাকে টানতে পারবে না।

ইরাবতী পাঁজি দেখে একটা দিন আন্দাজ করে রেখেছে। কুমারেশের সঙ্গে এই ব্যাপারটাও আজ আলোচনা করে নেবে। কারণ এইভাবে আর চলে না। ইরাবতীর খুব মায়া হয় কুমারেশকে সমস্ত সুযোগের সুবিধা না দিতে পেরে।

তারিখটা শুনেছে কুমারেশ। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বলেছে, "বিশে নভেম্বর! মা কিছুতেই শুনবে না। মা রাজি হবে না।"

কুমারেশ যে একটু বেশি ড্রিংক করে ফেলেছে তা ইরাবতী বুঝতে পারছে। কিন্তু যতই মত্ত হোক, কুমারেশ মোটেও তার ভব্যতা হারাচ্ছে না। এই নির্জন বেডরুমেও নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে না ইরাবতী। বরং কুমারেশ যেন একটু বেশি দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে, ইরাবতীর শরীর সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

ইরাবতী জানতে চাইছে, কেন মায়ের কথা উঠছে? মায়ের আপত্তির কথা তো অনেক আগেই জেনে বসে আছে কুমারেশ। আপত্তি হলেও তো কুমারেশ এগিয়ে যাবে, যেমন পীতাম্বর মিশ্রর আপত্তিতে ইরাবতী কোনো পাত্তা দেয়নি।

"বিশে নভেম্বর ইজ এ ব্যাড ডে, ইরা খুব খারাপ দিন। ভেরি ব্যাড ডে, ইরা। ঐদিন আমার একমাত্র দিদি সুইসাইড করেছিল শ্বশুরবাড়িতে।" অগ্রহায়ণে তারপর আর কোনো দিন নেই। পৌষেও নেই, মাঘ-ফাল্গুন এবার কোনো কারণে নিষিদ্ধ মাস। কিন্তু এসব কথা তুলবার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। যখন বোনের মৃত্যুদিনের কথা উঠেছে তখন এসব আলোচনা করা যায় না। দিদির এইসব কথা আগে জানা ছিল না ইরাবতীর। মানুষ কত কম জানতে পারে আর একটা মানুষ সম্বন্ধে। ধীরে-ধীরে সব জেনে নেবে ইরাবতী, সব না জানলে একটা মানুষের সর্বস্ব পাওয়া যাবে কি করে?

কুমারেশ আর সময় নষ্ট করেনি। উঠে পড়েছে, ওর গলার টাইটা বেঁকে ছিল, ওটা টাইট করে দিল ইরাবতী। পীতাম্বরেরও টাইতে খুব শখ ছিল।

এখন রাত অনেক। জি পি এস অ্যান্ড কোম্পানির সায়েবকে এই সময়ে অফিসের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে অবাক হয়ে গেল ওয়াচম্যান বীরবাহাদুর।

সায়েবকে সে স্যালুট করল। সায়েব হঠাৎ বলল, 'আজেবাজে লোককে কেন স্যালুট করো দারোয়ান? কোরো না, এতে দুনিয়ার কোনো উপকার হয় না।"

সায়েবের হাতে একটা চিঠি রয়েছে। সেটা তিনি আবার পড়লেন, তারপর বললেন, "সেই লোকটা, যে আজ বিকেলে আমার ট্যাক্সির সামনে এসেছিল সে কোথায়?'

বীরবাহাদুর ঘাবড়ে গেল। "না, স্যার, আমি ওইসব দুষ্টু লোককে পাত্তা দিই না। আপনি চলে যাওয়ার পরেও আমাকে খুব ধরেছিল ওকে এই গেটের কাছে রাত্রে শুতে দিতে। ওর নাকি বাড়ি ফেরার টাকা নেই।"

বীরবাহাদুর জানে, এইসব লোক মিথ্যে কথা বলে, ইনিয়ে বিনিয়ে লোককে জ্বালাতন করে।

বীরবাহাদুর বেশ বিপদে পড়ে গেল। লোকটাকে খুঁজে দেখতে কাতর অনুরোধ করছেন সায়েব। কাছাকাছি অন্য কোথাও শুয়ে আছে কি না দেখতে পারে বীরবাহাদুর। রাত্রে কত লোক তো এই আপিস পাড়ায় যত্রতত্র আশ্রয় নেয়।

কুমারেশ বলছে, "প্লিজ ওকে একটু খুঁজে দেখো, বীরবাহাদুর।"

বীরবাহাদুর এগিয়ে গিয়েছে। কুমারেশের পা টলছে, আর মনে পড়ছে অনেকদিন আগেকার এক বিশে নভেম্বরের কথা। যখন দিদির মৃত্যুসংবাদ এলো তখন মাও মেঝেতে আছড়ে পড়ে কেঁদেছিলেন। চেয়েছিলেন, এই পাশবিক অন্যায়ের প্রতিবিধান হোক। কিন্তু দায়িত্বটা ভগবানের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কুমারেশ নিজেও কেঁদেছে কিন্তু কিছু করেনি। তখন একবার যে দুষ্টের দমনের কথা ভাবেনি কুমারেশ এমন নয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুই এগোয়নি।

বিনা হাঙ্গামায় দিদির মৃতদেহ দাহ হয়েছিল। পুলিশেও যাওয়া হয়নি। দিদির শ্বশুর বউমার ভাইকে একটা চাকরি করে দেবার লোভ দেখিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন দিদির শ্বশুর। জি পি এম কোম্পানিতে সেই চাকরিটাই আজও করছে কুমারেশ, যদিও তারপর বছরের পর বছর কুমারেশ নিজেই উন্নতি করেছে একের পর এক।

বীরবাহাদুর ফুটপাথের একটা দিক তন্ন তন্ন করে দেখে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। এবার কুমারেশ নিজেই বীরবাহাদুরের টর্চটা নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করেছে।

একের পর এক ফুটপাথে ঘুমন্ত মানুষের মুখেব ওপর টর্চ মারছে কুমারেশ। অন্ধকারের মধ্যে কত অদ্ভুত সুন্দর-সুন্দর মানুষকে দেখার রোমাঞ্চ অনুভব করছে কুমারেশ। হঠাৎ একটা মুখের ওপর আলো ফেলেছে কুমারেশ।

এই তো, এই তো বিশু! নিজের সমস্যার কোনো সমাধান না করেই কেমন নিশ্চিন্তে ফুটপাথে ঘুমোচ্ছে নিরাশ্রয় প্রাক্তন দাগী আসামী বীরেশ্বর ব্যানার্জি।

কুমারেশ তাকে ডেকে তুলল। কুমারেশকে দেখেই চিনতে পেরেছে বিশু, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না।

"আপনি স্যার, আপনি?" বীরেশ্বর ভেবেছে আবার পুলিশের হাঙ্গামা বাধাতে এত রাত্রে ফিরে এসেছেন তার বাবার অফিসের সায়েব।

"আমায় ক্ষমা করুন স্যার। আমি আর কখনও আপনার অফিস ঘরে ঢুকবো না, স্যার।" কাতরভাবে বলছে বীরেশ্বর।

কুমারেশ ততক্ষণে পরমস্নেহে খুনের আসামী বীরেশ্বরের গায়ে হাত বুলোচ্ছে। টর্চের আলোয় তার মুখটা ভালোভাবে দেখছে কুমারেশ।

বীরবাহাদুর লক্ষ্য করল, খেয়ালের বশে সায়েব একটা পাজি লোককে আদর করছেন। বলছেন, "আমি তোমার মুখ দেখতে এসেছি, বিশু। আমি তোমার নখের যোগ্য নই। আমি তোমাকে তখন চিনতে পারিনি।"

কাঁচা ঘুম থেকে ওঠা বিশু কিছুই বুঝতে পারছে না। সে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছে। কিন্তু সায়েব তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলছেন, "চলো, আমার বাড়ি চলো, আমার মায়ের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। আমার মা তোমাকে দেখলে ভীষণ খুশি হবেন। তোমাকে ভালোবাসবেন, আমার থেকেও তোমাকে বেশি ভালোবাসবেন।"

বীরবাহাদুর অভিজ্ঞ মানুষ। সে জানে দারু পিয়ে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না, তখন বাধা দিয়েও কোনো লাভ হয় না। বীরবাহাদুর খুব কাছে থেকে দেখল তার সায়েব রাস্তার একটা পাজিকে বুকে জড়িয়ে ধরে নেশার ঘোরে হাউ-হাউ করে কাঁদছেন।

মাতাল অবস্থাতেও কিছু করলে সায়েবের সঙ্গে তর্ক করার অর্ডার নেই বীরবাহাদুরের। বীরবাহাদুর তাই অসহায়ভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, সায়েবকে কোনো বাধা দিল না।

একজন যাত্রী ও রিকশাওয়ালা

কলকাতার পাঁচতারা হোটেল ওবেরয় গ্র্যান্ডের ওপেন-এয়ার সুইমিং পুলের ধারে এই মুহূর্তে চুপচাপ বসে আছেন নবগোপাল। এন জি সেনশর্মা নামেই কর্মজগতে তাঁর পরিচয়, কিন্তু পরিচিত এবং প্রিয় মহলে নিজেকে নবগোপাল বলে চালাতেই ভালোবাসেন তিনি।

নবগোপাল একটা হাল্কা অ্যালুমিনিয়াম টিউব চেয়ারে কিছুটা দেহ এলিয়ে দিয়ে বসে আছেন। লম্বা-লম্বা পা-গুলো ছড়িয়ে দিয়েছেন শহরের দক্ষিণ দিকে। কলকাতার নরম সবুজ ঘাসের নিবিড় সান্নিধ্যের লোভে নবগোপাল একটা কাণ্ড করেছেন। পায়ের জুতো দুটো টুক করে একটু দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। নাইলন মোজা দুটো সবার অলক্ষ্যে এক সময় নিজের পা-থেকে খুলে দিয়েছেন। পায়ের মোজা পাঁচতারা হোটেলের টেবিলের ওপর তুলে রাখা যায় না, তাই ও দুটো মুড়ে ছোট্ট করে ডান হাতে তালগোল পাকাচ্ছেন নবগোপাল।

নরম নাইলনের মোজা পাকাচ্ছেন তো পাকাচ্ছেন নবগোপাল সেনশর্মা। নবগোপালের মনে পড়ল এক সময় মিহি এবং নরম ঢাকাই মসলিনের খুব নামডাক ছিল—একখানা পুরো শাড়ি নাকি একটা আংটির ফাঁকের মধ্যে গলে যেত। ঢাকাই মসলিনের জন্যে এখনও এত হা-হুতাশ, কিন্তু নবগোপাল দেখছেন এই নাইলনের মোজাও কম যায় না। চেষ্টাচরিত্র করলে অবশ্যই একটা আংটির মধ্যে ঢুকে যায়! নবগোপাল নিজের মোজা নিয়ে খেলা চালু রেখে ভাবলেন, এ-যুগের মানুষ কলকারখানায় তৈরি জিনিসকে শিল্পকৃতিত্ব দেয় না। তারা যেন ধরেই নিয়েছে যা কিছু শিল্পসম্মত তা বহুযুগ আগে হয়ে গিয়েছে, এখন যারা নরম নাইলনের মোজা বানায় এবং ভালো শাড়ি ছাপে তাদের মধ্যে সৃষ্টির বিশিষ্টতা, কৃতিত্ব নেই।

নবগোপাল সেনশর্মা মোজা দুটো জড়িয়ে-জড়িয়ে আরও ছোট্ট করে ফেললেন—সুমেধার খুব ছোটবেলায় যেভাবে তিনি রুমাল থেকে ইঁদুর তৈরি করতেন। রুমালের ইঁদুর দেখে ছোট্ট সুমেধার কান্না বন্ধ হয়ে যেতো। ইঁদুরটার দিকে সে সবিস্ময়ে তাকাত। নবগোপাল তখন আরও মজা করবার জন্যে মুখে কৃত্রিম ইঁদুরের আওয়াজ করতেন—কিচকিচ। ইঁদুরত্ব ইঁদুরের সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ছোট্ট মেয়ে সুমেধা তখন হাত বাড়িয়ে দিত নতুন অতিথিকে আদর করবার জন্যে।

নবগোপাল তখন সাবধানে ইঁদুরটাকে সুমেধার খুব কাছে আনতেন। ওকে ইঁদুরের গায়ে হাত বোলাতে বলতেন। তারপর একটু জোরে কিচকিচ ইঁদুর আওয়াজ করতেন এবং সুমেধা সঙ্গে-সঙ্গে ভয় পেয়ে নিজের হাত সরিয়ে নিত। নবগোপাল জিজ্ঞেস করতেন, "দুষ্টু ইঁদুরটা কামড়ে দেয়নি তো?"

সুমেধা তার নরম হাতটা সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর দিকে এগিয়ে দিত—দেখতে বলত সত্যিই ইঁদুরটা এমন মিষ্টি মেয়ের মিষ্টি হাতটা কামড়ে দিয়েছে কি না।

নবগোপাল তখনও রুমাল খেলায় মেতে থাকতেন। ইঁদুরকে ভয় দেখিয়ে হুঙ্কার ছাড়তেন, "তবে রে দুষ্টু!"

তারপরেই ডাকতেন, "আয় তো বেড়াল। ধরে নিয়ে যা এই নেংটি ইঁদুরকে।"

বেড়ালের মিউ-মিউ আওয়াজ নিজের মুখেই করতেন নবগোপাল, যেন সত্যিই একটা রক্তলোভী পশু ক্রমশ এগিয়ে আসছে খাদ্যের সন্ধানে। তারপর নবগোপাল একটান দিতেন রুমালে—ইঁদুরটা মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যেত। নবগোপাল তখন সুমেধাকে বীরবিক্রমে জানাতেন, "ইঁদুর পালিয়েছে।" সুমেধা মনের আনন্দে তখন হাততালি দিয়ে উঠত।

একটু পরে ইঁদুরটার জন্যে আবার দুঃখ হত ছোট্ট সুমেধার। সে বলত, "ইঁদুরকে আবার আসতে বলো, বাবা। বেড়াল চলে গিয়েছে।"

সংসারে যা চলে যায় তা আর ফিরে আসে না। কিন্তু মেয়ের মুখ চেয়ে নবগোপাল সেনশর্মা আবার রুমালকে ইঁদুরের আকার দিতেন। এইভাবে চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা—কোথা দিয়ে সময় কেটে যেত।

কতদিন আগের কথা। এখন এ-সব মনে পড়বার সময়ও নয়। তবু নিজের নাইলন মোজা দিয়ে একবার ইঁদুর তৈরির ব্যর্থ চেষ্টা করলেন নবগোপাল। কয়েকবারের প্রচেষ্টায় না-পেরে নবগোপাল ভাবলেন, ছোট ছেলে-মেয়েরা কাছে না থাকলে ঐসব ইঁদুর, ঐসব বেড়াল মানুষের কাছে ধরা দেয় না।

নবগোপাল এবার মোজা দুটো বাঁদিকে প্যান্টের পকেটে পুরে ফেললেন। সবুজ নরম ঘাসের ঠাণ্ডা ভাবটা উষ্ণ এবং তৃষ্ণার্ত পা দিয়ে চেটে নেবার চেষ্টা করলেন নবগোপাল। এই নরম ঘাস—বাংলার এই নবদূর্বাদল আজ নবগোপালকে বড় আনন্দ দিচ্ছে। নবগোপাল আস্তে-আস্তে পা দুটো সরিয়ে সরিয়ে শিশিরভেজা দূর্বার প্রথম স্পর্শ অনুভূতি সমস্ত শরীর এবং হৃদয় দিয়ে অনুভব করছেন। কিন্তু খুব সাবধানে তিনি পা রাখছেন—নবগোপাল জানেন তাঁর পদযুগল কোমল পেলব নয়, এই দুটো পায়ের যথেষ্ট ওজন আছে। বেচারা দূর্বাগুলো যেন নিষ্পিষ্ট হবার আশঙ্কায় সরে না দাঁড়ায়। কোনো উৎপীড়নকারীর ভূমিকায় এই প্রসন্ন প্রভাতে নবগোপাল কোথাও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান না।

হোটেলের একজন উর্দিপরা বেয়ারা একটা হাল্কা টেবিল সামনে এগিয়ে আনল। বিশিষ্ট আবাসিককে সুপ্রভাত জানিয়ে সে সামনে একটা পানীয়পাত্র নামিয়ে রাখল। মস্ত বড় ট্যাংকার্ডে টাটকা পাতিলেবুর রস এবং সোডার অর্ডার দিয়েছিলেন নবগোপাল। পাশে একটা স্টেনলেস স্টিল আধারে চিনির সিরাপ।

বেয়ারার কাগজে নিজের ঘরের নম্বর লিখে দিয়ে একটা সই জুড়ে দিলেন নবগোপাল। বেয়ারা তার বিশেষ কায়দায় জানতে চাইল, "এনিথিং এলস্ স্যর?"

"আর কিছু চাই কি না?" সাতসকালে এ-প্রশ্ন কেন তুলছ বাপধন, মনে-মনে ফোঁস করে উঠলেন নবগোপাল সেনশর্মা। পৃথিবীতে কত মানুষের কত কি প্রয়োজন থাকতে পারে! হোটেলের বেয়ারা হিসেবে তুমি তার কতটুকু মেটাতে পারবে? সুতরাং শুধু-শুধু প্রত্যাশা জাগাচ্ছ কেন বাছা?

সইকরা কাগজটা পেয়েই বেয়ারা বুঝতে পেরেছে আর কিছু প্রয়োজন

নেই সায়েবের এই মুহূর্তে। সে তৎক্ষণাৎ দূরে সরে গিয়েছে। কিন্তু এই নরম নাতিশীতোষ্ণ শরতের ভোরবেলায় নবগোপাল ভাবছেন, স্বয়ং ভাগ্যদেবতা যদি এইভাবে ভোরবেলায় ইচ্ছাপূরণের জন্য আসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, "এনিথিং এল্‌স্ নবগোপাল?" তাহলে কী সুন্দর হতো। সর্বশক্তিমানের কাছে কী কী চাওয়া যেত তার একটা তালিকা তৈরি করার বাসনা বুকের মধ্যে উঁকি মারছে নবগোপালের।

না, সেইসব ইচ্ছার ইঙ্গিত এই পৃথিবী কাউকে দিয়ে নিজেকে হাসির উপাদান করে তুলবেন না নবগোপাল। ঠাণ্ডা লেম্বুপানির সঙ্গে সিরাপ মেশাতে-মেশাতে নবগোপাল ভাবলেন, নতুন জিনিসই চাওয়া যায় ঈশ্বরের কাছে। যা একবার হাতে পাবার পর ভেঙে যায় অথবা হারিয়ে যায় তা বোধহয় একমাত্র শিশুরাই আবার চাইতে পারে। কিন্তু নবগোপাল তো শিশু নন। এমনকী, তাঁর সন্তান সুমেধা, সেও তা এখন শিশু নয়। সেবার কলেজে পড়া সুমেধাকে ঐ ইঁদুর তৈরির খেলাটা নবগোপাল দেখাতে চেষ্টা করলেন—ও মোটেই আনন্দ পেল না। সুমেধা বলল, "ওসব খেলা ভীষণ পুরনো হয়ে গিয়েছে বাবা। আজকালকার ছোট ছেলে-মেয়েরা কাপড়ের ইঁদুরে মজে না।" জাপানে নাকি ইলেকট্রনিক ইঁদুর এবং ইলেকট্রনিক বেড়ালের সেট বেরিয়েছে। সেই বেড়াল মালিকের ইঙ্গিতমাত্র মিঁয়াও করে আওয়াজ তোলে, তারপর ইঁদুরের সঙ্গে কিছুক্ষণ লুকোচুরি খেলে এবং অবশেষে ইঁদুর ধরে মুখে পুরে দেয়।

আরও এক চুমুক লেবুর জল গলাধঃকরণ করলেন নবগোপাল। সেই ছোট্ট সুমেধা তিলে-তিলে তিলোত্তমা হয়েছে। ওকে দেখলে সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যায়। ওর মধ্যে আর একজনকে পুরোপুরি দেখতে পান নবগোপাল সেনশর্মা। কিন্তু না, এই সাতসকালে নরম দূর্বার নিষ্পাপ স্পর্শসুখ ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করেন না বাহান্ন বছরের নবগোপাল সেনশর্মা।

আচ্ছা, যদি এই 'এনিথিং এল্‌স্'টা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে প্রশ্ন হয়, তা হলে এই মুহূর্তে কী কী চাইবেন নবগোপাল?

অর্থ, নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য সবকিছুই তো একটু-একটু করে পাওয়া গিয়েছে। এই পাঁচতারা হোটেলের সুইমিং পুলের ধারে অলসভাবে দেহটি

ছড়িয়ে দেবার আর্থিক সমৃদ্ধিও তিনি অর্জন করেছেন।

"না, মিস্টার গড, আপনি যা দিয়েছিলেন এবং দেওয়ার পরেই কেড়ে নিয়েছেন তা অবশ্যই নবগোপাল সেনশর্মা আপনার কাছে ফেরত চাইবে না।" কোন দুঃখে এতোদিন পরে নিজেকে ছোট করতে যাবেন নবগোপাল? সময়ে দহনজ্বালা কেটে গিয়েছে। অথচ সেইদিন বাইশ বছর আগে মনে হয়েছিল, সময় আর কাটবে না, পৃথিবীর যেখানে যত ঘড়ি ছিল তা দুটো বেজে আটত্রিশ মিনিটে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

এক সময় পশ্চিমী লেখকদের অনেক কবিতা সংগ্রহ পড়েছেন নবগোপাল এবং তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন, পৃথিবীর সব ঘড়ি আজ পর্যন্ত কখনও এক সময় বন্ধ হয়নি। একদিন এই বিশ্বভুবনে অবশ্য সেই অঘটন ঘটবে, বিশ্বচরাচর অকস্মাৎ আবার সীমাহীন অন্ধকারে ডুবে যাবে, কিন্তু সেদিন কোনো মানুষ থাকবে না এই পৃথিবীতে।

আরও একটু চুমুক দিলেন নবগোপাল। সিরাপের পরিমাণটা বাড়িয়ে নিলেন তিনি। মানবশূন্য এই পৃথিবীতে যখন মানুষের দৈহিক কীর্তিকলাপের কোনো নিদর্শন অবশিষ্ট থাকবে না, তখন কোটি-কোটি মানুষের বুকের মধ্যে সাজানো সুখ দুঃখের রঙিন স্মৃতিগুলোর কী হবে?

'নবগোপাল, তুমি তো তোমার অফিসে দোর্দণ্ড কাজের লোক বলে পরিচিত। তুমি তো অর্ডিনারি অকেজো বাঙালির মতন ভাবালু নয়! তুমি কর্মে বিশ্বাস করো, বক্তৃতায় নয়। তবু শরৎকালের এই সোনালী সকালবেলায় তুমি কেন এমন নরম হয়ে পড়ছ?' নবগোপাল নিজেকেই বকুনি লাগালেন।

ঠাণ্ডা লেম্বুপানির ট্যাংকার্ড অনেকক্ষণ অস্পৃশ্য রেখে নবগোপাল ভাবছেন বরোদা আপিসের কথা।

বরোদা হেড অফিসে নবগোপালের যথেষ্ট প্রতাপ। সেখানে সবাই তাঁকে সেনশর্মা বলেই ডাকে। "যাদেরই দুটো করে টাইটেল, তাদের একটু সমীহ করে চলবে!" রসিকতা করেছেন নবগোপাল। "দোনলা টাইটেল মানেই ফায়ারিং পাওয়ার বেশি। স্কটল্যান্ডে এই ডবল নাম হয় এবং বেঙ্গলে।"

কতদিন এই কলকাতায় আসেননি নবগোপাল! ঠিক হিসেব করলে বাইশ বছর। নবগোপাল দেখলেন, একটি অষ্টাদশী বিদেশিনী কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে সুইমিং পুলের নীল জলে ঝাঁপ দিলে।

নীল, নীল, নীল। সুন্দরীর আঁখি নীল, তার ছেড়ে যাওয়া তোয়ালেটি নীল এবং সাঁতারপুলের জলও নীল। না, জলটা বোধ হয় নীল নয়—নীলের মায়ামোহ সৃষ্টির সুইমিং পুলের তলাটায় কেবল নীল রঙ মাখানো হয়েছে।

সুমেধাও নীল রঙ ভালোবাসে। ওর বিয়ের বেনারসীটাও নীল কিনেছিলেন নবগোপাল। ওর মায়েরও বিশেষ প্রিয় রঙ ছিল নীল।

আর একবার লেম্বুপানিতে চুমুক দিলেন নবগোপাল। আচ্ছা, বিশ্বময় এই নীল রঙের জয়জয়কার কেন? নীলের সঙ্গে কি ইচ্ছাপূরণের কোনো সম্পর্ক আছে? নীল সমুদ্র, নীল আকাশ, নীল নয়ন কি মানুষকে বিশেষ আশার ইঙ্গিত দেয়?

নবগোপাল সেনশর্মার এই যে বাইশ বছর কলকাতায় আসা হয়নি তা কলকাতা কি মনে রেখেছে? কোনো নগরবাসীর কি তাতে একটু মাথাব্যথা হয়েছে? নবগোপাল এই মুহূর্তে একটু উৎসাহের অভাব অনুভব করছেন।

এমন নয় যে তাঁর কলকাতায় আসার সুযোগ হয়নি। বিশ্বসংসারে এমন কোন প্রবাসী বাঙালি আছে যে বুদ্ধি খাটিয়ে একবার কলকাতায় ঘুরে যেতে পারে না? কে যেন কোথায় লিখেছিল, পৃথিবীর যেখানেই বসবাস হোক, প্রত্যেক বাঙালির একটা নিশ্চিন্ত নিরাপদ নিজস্ব ঠিকানা আছে সেটা হলো, কেয়ার অফ ক্যালকাটা।

বরোদার গুজরাতি বন্ধুরা জানেন, বাঙালিদের এই দুর্বলতার একমাত্র ব্যতিক্রম নবগোপাল। নবগোপাল ভুলেও কোনোদিন কলকাতায় আসতে চাননি ; বরং অফিসের কাজ পড়লেও কলকাতাকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। নবগোপাল যে অফিসে কাজ করেন তার সদর দপ্তর এবং মূল কারখানা বরোদায়, কিন্তু এ-দেশে এমন কোন কোম্পানি আছে যার কোনো না কোনো কাজ কলকাতায় পড়ে না?

নবগোপালের অফিসের গুণগ্রাহী কর্তারা তাঁর কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ। তাঁরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছেন, নবগোপাল কোনোদিন কলকাতায় ব্রাঞ্চে বদলি হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি।

এইভাবেই চলে যাচ্ছিল। হয়তো আরও অনেকদিন এইভাবেই যেত। কিন্তু সেদিন হঠাৎ বরোদা অফিসের সাততলায় নবগোপালের নিজস্ব ঘরে কী যে হলো!

সেদিন সকালে নবগোপাল কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন। ওখানকার লকারটায় অনেকদিন হাত দেওয়া হয়নি। কী ভেবে নবগোপাল ব্যাংকের লকারটা খুললেন। কোম্পানির কাগজ, গয়নার বাক্স এবং রুপোর একখানা থালা ঘাঁটতে-ঘাঁটতে হঠাৎ নীল খাম বেরিয়ে এলো। লকারের সামনে দাঁড়িয়ে রুপোর থালাখানা একবার দেখছিলেন নবগোপাল। এই থালাতেই তাঁর মুখে ভাত হয়েছিল। তাঁর মা ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষেই এই থালার অর্ডার দিয়েছিলেন। নবগোপাল দেখলেন অনেক বছর আগে, তাঁর জীবনের শুরুতেই গুরুজনরা যা প্রত্যাশা ও প্রার্থনা করেছিলেন তা রুপোর থালাটায় বড়-বড় করে লেখা রয়েছে—'সুখে থাকো।'

সুখে থাকো...সুখে থাকো...সুখে থাকো। জীবনটা সুখেই কাটল বটে! ঐ সুখে থাকো থালার ওপরেই সেই নীল খামের চিঠিটা রয়েছে।

লকারের বন্দিশালা থেকে মুক্ত করে চিঠিটা নিয়েই নবগোপাল নিজের অফিসে ফিরে এসেছিলেন। নীল রঙটা কি এই এতো বছরে কিছুটা বিবর্ণ হয়েছে? টেকনিক্যাল কর্মী হিসেবে নবগোপাল জানেন নীল রঙটা বড্ড অপলকা—সূর্যের আলো পড়লে কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যে-কারণে নিম্নবিত্ত বাঙালিরা কখনও দরজা-জানলায় নীল রঙের প্রয়োগ করেন না, বড্ড তাড়াতাড়ি রঙ চটে যায়।

নিজের চেয়ারে বসে নবগোপাল নীল খামটা ভালোভাবে দেখলেন, এই নীল একটুও ফ্যাকাশে হয়নি। খামের ভিতর থেকে বের করে এনে মূল চিঠিটায় হাত দেবার কথা ভাবতেই বুকের মধ্যে কেমন এক অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন নবগোপাল। নীল তাঁকে কোনো নীল আশার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না। অন্যায় তো কিছু করছেন না নবগোপাল। সেই পরিচিত হাতে নবগোপাল সেনশর্মা নামটাই তো গোটা-গোটা করে লেখা আছে খামের ওপরে! কী সুন্দর হাতের লেখা, কিন্তু কী নিষ্ঠুর সংবাদ!

নবগোপালের হাত কাঁপতে লাগল, খামের ভিতর থেকে চিঠিটা বের করে আনতে পারলেন না। ঠিক সেই সময় নবগোপালের সেক্রেটারি

মিসেস নন্দিতা দেশাই ঘরে ঢুকেছিলেন। কী একটা চিঠির ডিকটেশন নেওয়া এখনই প্রয়োজন। নবগোপাল নিজেই অগ্রিম নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু নবগোপাল যা কখনই করেন না, তাই এই মুহূর্তে করে বসলেন। সেক্রেটারিকে বললেন, "আমাকে একটু একলা থাকতে সময় দেবেন?"

মিসেস নন্দিতা দেশাই জানেন, মিস্টার সেনশর্মা ড্রিংক করেন না, স্মোক করেন না। কোনোরকম ভাবালুতা নেই ওঁর মধ্যে। দিনরাত কাজের নেশাতেই ডুবে থাকতে ভালোবাসেন এই বাঙালি ভদ্রলোক। সেইজন্যেই সুদূর বাংলা থেকে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে এসে একের পর এক উন্নতি করেছেন। মিস্টার সেনশর্মার আর এক রেকর্ড আছে কখনও প্রিভিলেজ ছুটি নেননি। এই সেদিন শুধু মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে, তাও মাত্র দু'দিনের জন্যে ছুটি নিলেন মিস্টার সেনশর্মা!

হয়তো একমাত্র সন্তানের বিবাহ পরবর্তী বিচ্ছেদবেদনা অনুভব করছেন মিস্টার নবগোপাল সেনশর্মা, ভাবলেন মিসেস নন্দিতা দেশাই। শরৎচন্দ্রের সমস্ত বই পড়েছেন নন্দিতা দেশাই। বাঙালিরা ইমোশনাল হয় বলেই তাঁর ধারণা ছিল, কিন্তু নবগোপাল সেনশর্মার সঙ্গে কাজ করে তাঁর সে ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছিল। আজ নবগোপালের মুখে নতুন কথা শুনে একটু ভরসা পেলেন নন্দিতা দেশাই।

আরও আধঘণ্টা পরে নন্দিতা দেশাই তাঁর সায়েবের ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। ইতিমধ্যে নবগোপাল কয়েকবার তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠেছেন, ঘরের মধ্যেই অস্থিরভাবে পদচারণা করেছেন এবং দক্ষিণের পর্দা সরিয়ে কাঁচের মধ্য দিয়ে দূরের সবুজ পার্কটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেছেন। এখানে অনেক কষ্ট করে গাছ বানাতে হয়—সবুজ এখানে মহামূল্যবান। নীল রঙ নিয়েও এখানে অশোভন মাতামাতি নেই। নীল বলতে এখানে শুধু বোঝায় শেয়ার পত্র—ব্লুয়েস্ট অফ দ্য ব্লু শেয়ার ছাড়বার জন্যে গুজরাতের শিল্পপতিরা ব্যস্ত। এবং নবগোপালের মতো অসংখ্য লোক দেশের নানা প্রান্ত থেকে এখানে ছুটে এসেছে ভাগ্যের মানভঞ্জনপালায় অংশ নিতে।

নবগোপাল এবার মিসেস দেশাইকে অনেক চিঠি ডিকটেশন দিলেন। তারপর মিসেস দেশাই জানালেন "কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায়

আপনার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে।"

কাগজের কাটিংটা নবগোপাল পড়লেন। বিবাহ কলমে সুমেধার শুভবিবাহ সংবাদটা বেরিয়েছে এবং সেখানে বিদেশি জামাইয়ের নাম ছাড়াও সুমেধার জনকজননী হিসেবে নবগোপাল ও সুখলতার নাম প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞাপনটা পাঠাবার সময় একবার নবগোপাল ভেবেছিলেন, শুধু সুমেধা এবং ডেভিডের নামটাই বিজ্ঞপ্তিতে থাকুক—আর কারও, এমনকী তাঁর নিজের পরিচয়ও বিজ্ঞাপিত করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরমুহূর্তে নবগোপাল ভেবেছিলেন, এদেশের হাজার-হাজার বছরের সামাজিক ধারাবাহিকতার কথা। বিয়ের সময়েই পিতা, মাতা এবং পিতৃপুরুষকে স্মরণ করা এদেশে অবশ্য কর্তব্য। "এই জন্যেই তো মানুষ ছেলেমেয়ে চায়—শুভকাজের সময় পরলোকে এক আধফোঁটা জল পাবে বলে," সুখলতা অনেকদিন আগে বলেছিল।

না, সুখলতার সম্পর্কে এখন কোনোরকম দুর্বলতা নেই নবগোপালের। ইচ্ছে করলেই যে তিনি ইস্পাতের মতন কঠোর হতে পারেন তার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতে পারেন নবগোপাল। নবগোপাল এই নীল চিঠিটা তো দ্বিতীয়বার পাঠ না করে বাইশ বছর ধরে লকারে বন্দী করে রাখতে পেরেছেন।

নন্দিতা দেশাইয়ের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিগত সেক্রেটারি বিরল। পক্ষীমাতা যেভাবে পক্ষীশাবককে পক্ষছায়ায় রেখে দেন, মিসেস দেশাই সেইভাবে দীর্ঘ বাইশ বছর নবগোপালকে রক্ষা করেছেন। নবগোপালের সমস্ত ব্যক্তিগত কাগজপত্রের জিম্মাদার মিসেস দেশাই। তাঁর লাইফ ইনসিওর (আর প্রয়োজন হবে না, সুমেধার বিবাহ হয়ে গিয়েছে), তাঁর ব্যাঙ্কের পাশ বই, ফিক্সড্ ডিপোজিট, তাঁর ট্যাক্সের কাগজপত্র সব দায়িত্ব মিসেস নন্দিতা দেশাইয়ের ওপর। নবগোপালের কত মাইনে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে, কত টাকা তিনি সংসার খরচের জন্যে তোলেন, কত টাকা স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে পাঠান সব হিসেব রাখেন নন্দিতা।

নন্দিতা সেদিনই আবার ফিরে এসেছিল নবগোপালেব কাছে। ইন

মেমোরিয়াম কলমের বিজ্ঞাপনটা? এই বাইশ বছর ধরে ৮ই সেপ্টেম্বর যে বিজ্ঞাপনটা নবগোপাল স্টেটসম্যানে নিয়মিত বের করে থাকেন। বিজ্ঞাপনটা পাঠাতে এবার একটু দেরি হয়ে গিয়েছে, নন্দিতারও গাফিলতি রয়েছে। তবে চেষ্টা করলে এখনও পার্সোনাল কলমে বের করে দেওয়া যাবে।

প্রতি বছর কোনো শব্দের পরিবর্তন হয় না—নবগোপাল এই দিনটিকে দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করেন। ঐ একদিন সুখলতার নামটি উচ্চারিত হয়। সুখলতা যে কে তা অবশ্যই আন্দাজ করতে পারেন নন্দিতা।

নন্দিতা দেশাই বিজ্ঞাপনের প্রশ্নটা তুললেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, নবগোপাল সঙ্গে-সঙ্গে সিদ্ধান্ত দিলেন না। বললেন, "আমাকে একটু ভাববার সময় দেবেন, মিসেস দেশাই?"

নন্দিতা হয়তো ভাবছেন, "কী আশ্চর্য। বাইশ বছর আগের যে দিনটির স্মরণ সে তো সময়ের বছরের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। এখন আবার নতুন করে ভাববার কী আছে?"

কিন্তু নবগোপাল এইমুহূর্তে অন্য এক মানসিকতার মধ্যে রয়েছেন। পৃথিবীকে মনে রাখতে হবে সুমেধার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ঐ নীল চিঠিটা এতদিন পরে লকার থেকে মুক্ত করে এনেছেন নবগোপাল।

"না, মিসেস দেশাই। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। এবারে ৮ই সেপ্টেম্বরে স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপন দিতে হবে না।" নবগোপাল একটু পরেই নিজের খেয়ালে বললেন।

একমাত্র সন্তানের বিয়ে হয়ে যাবার পরে নিঃসঙ্গ পিতারা অনেক সময় এইরকম খেয়ালি হয়ে ওঠেন, নন্দিতা দেশাই জানেন। মেয়েদের এই ঘরসংসার বাঁধতে অন্যত্র চলে যাবার ব্যাপারে মিস্টার সেনশর্মাকে গতকাল অনেক বুঝিয়েছেন মিসেস দেশাই। আবার কথা বলবেন ঐ বিষয়ে, তবে এখন নয়। মিস্টার সেনশর্মা এখন যেন কেমন উদাসীন হয়ে রয়েছেন।

এরপরেই নবগোপাল কোম্পানির ডিরেকটর মিস্টার কান্তিভাই প্যাটেলের ঘরে গিয়েছিলেন। "আমার ছুটি চাই। আমি দু-একটা দিন কলকাতায় যেতে চাই", নবগোপাল আবেদন করেছিলেন।

সুদক্ষ নবগোপাল এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মী। ডিরেকটর

মিস্টার প্যাটেল বললেন, "কলকাতায় যেতে চান? অবশ্যই যাবেন। তবে ছুটি কেন? কোম্পানির কোনো কাজের অজুহাত চলে যান। যে ক'দিন খুশি ওখানে থাকবেন। একবার কলকাতা অফিসের বুড়িটা শুধু ছুঁয়ে রাখবেন, মিস্টার সেনশর্মা।"

কান্তিভাই প্যাটেল আরও বললেন, "বেস্ট হোটেলে থাকবেন, মিস্টার সেনশর্মা। আপনি যে নিজে থেকে কলকাতা যেতে চেয়েছেন এতে আমি ভীষণ খুশি। আমার নিজেরও একটা প্রাইভেট কাজ করে দেবেন। যেখানে যত পঙ্কজ মল্লিকের গানের রেকর্ড পাওয়া যায় সব নিয়ে আসবেন আমার জন্যে।"

তারপর গতকাল ভোরবেলায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বোম্বাই-কলকাতা ফ্লাইটে নবগোপাল এই শহরে পদার্পণ করেছেন। কলকাতা অফিসের ম্যানেজার মিস্টার সুধীর খাটাও ওঁকে রিসিভ করবার জন্যে গাড়ি নিয়ে বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন। ওবেরয় গ্র্যান্ডে চেক ইন করে, নিজের ব্যাগ নামিয়েই নবগোপাল সেনশর্মা ছুটেছিলেন কোম্পানির মিরজা গালিব স্ট্রিটের অফিসে।

সেখানে সারাদিন শুধু কাজ, কাজ, আর কাজ। সুধীর খাটাও ধরে নিয়েছেন, নবগোপাল প্রবাসী বাঙালি। কলকাতার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। তাই কলকাতার একখানা রঙিন ম্যাপ উপহার দিয়ে নবগোপালকে বলেছিলেন, "এসেছেন যখন তখন একটু সাইটসীয়িং করুন। ভেরি-ভেরি ইন্টারেসটিং সিটি। আপনার ভালো লাগবে, মিস্টার সেনশর্মা। কয়েক বছর কলকাতায় থাকলেই, আফিং-এর মতো কলকাতা-নেশা ধরে যায়। তখন মুশকিল, যেমন আমার হয়েছে। এখানে আমার শিকড় গজিয়ে গিয়েছে।"

নেশা ধরে, আবার নেশা ভাঙেও। মনে-মনে ভেবেছিলেন নবগোপাল গতকাল। ম্যাপটা নিয়েছেন, কিন্তু সবিনয়ে জানিয়েছিলেন, অফিস থেকে গাইডের কোনো প্রয়োজন নেই।

রাত্রেও মিস্টার খাটাও তাঁর বিশিষ্ট অতিথিকে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। অফিস এবং কারখানা সম্পর্কে অনেক

কথাবার্তা হয়েছে। নবগোপাল চেয়েছেন যতখানি সম্ভব অফিসের কথাবার্তাতেই সময়টা পূর্ণ হয়ে যাক। মনটা যত কর্মব্যস্ত হয়ে থাকে তত মঙ্গল।

আজ নবগোপালের কোনো স্পেশাল অফিস অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। তবে অফিসের গাড়ি আসবে সকালেই। সারাক্ষণ এই গাড়ি সঙ্গে রাখতে পারবেন—যখন খুশি যেখানে খুশি যেতে পারেন নবগোপাল সেনশর্মা।

মিস্টার সুধীর খাটাও নিজেই এই কলকাতা শহরটা ঘুরিয়ে দেখাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন ওই ধরনের ইচ্ছা জাগেনি, প্রস্তাবটা নবগোপাল সবিনয়ে প্রত্যাখান করেছিলেন। কিন্তু আজ এই ভোরবেলায় শিশিরভেজা নরম দূর্বাঘাসের স্পর্শ অনুভব করতে-করতে নবগোপালের বুকটা কেমন করে উঠলে। ফিস ফিস করে নিজেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কলকাতা, তুমি কি নবগোপালকে চিনতে পারছ না? বাইশটা বছর না-হয় কেটে গিয়েছে, কিন্তু তা বলে সুধীর খাটাও কেন এই নবগোপাল সেনশর্মাকে কলকাতা দেখানোর প্রস্তাব দেবে?

না। এসব সেন্টিমেন্টালিজম্। এই সব দুবল ভাবনাকে আজ কিছুতেই প্রশ্রয় দেবেন না নবগোপাল সেনশর্মা। নবগোপাল, তুমি এখন যুবক নেই। তুমি এখন পঞ্চাশোত্তীর্ণ বৃদ্ধ। তোমার রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। তোমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তুমি বরোদার এক বিখ্যাত মেশিন কোম্পানির টেকনিক্যাল ম্যানেজার—সেখানে অনেক কষ্টে তোমাকে নিজের স্থান করে নিতে হয়েছে। তোমার হাতে এখন অনেক কাজ। তোমার অবশ্যই সেন্টিমেন্টাল হওয়া সাজে না।

কাঁচের ট্যাংকার্ডটা ডান হাতে তুলে বাঁ হাতে চেপে ধরলেন নবগোপাল। একজন বয়স্থা বিদেশিনী বিকিনি পরে হোটেলের সুইমিং পুলের নীল জলে লাফিয়ে পড়লেন। কোনো বড় শহরে অন্তরঙ্গ ভালোবাসা জন্মায় না, এখানে কেউ কাকে চেনে না। কলকাতা কখনও এই মেট্রোপলিটান আইনের ব্যতিক্রম হতে পারে না। কলকাতা কোন দুঃখে বোম্বাই, আমেদাবাদ, লন্ডন, নিউইয়র্ক, টোকিও থেকে আলাদা হতে যাবে? এখানেও মানুষ ছোটাছুটি করে, সূর্য ওঠে, রাত্রি নামে, মাস পাল্টায়, বছর পাল্টায়—আশি লাখ মানুষের শহর কলকাতা কোনো একজনকে নিয়ে অবশ্যই উদ্বিগ্ন থাকতে পারে না।

নবগোপালের চোখ এবার সুইমিং পুলের চারদিকে সার্চলাইটের মতন ঘুরে এল। একজন মধ্যবয়সী হোটেল-অতিথি মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। নিশ্চয় বিজনেসম্যান, না-হলে খবরের কাগজে এত আগ্রহ কেন?

বেয়ারা জিজ্ঞেস করছিল, "এনিথিং এল্‌স্?" কিছু উত্তর দিতে না পেরে একটু খারাপ লেগেছিল। এবার মনস্থির করে ফেলেছেন নবগোপাল। বোয়ারাকে ডাকলেন তিনি।

বেয়ারা ভাবল আরও এক ট্যাংকার্ড লেম্বুপানি অর্ডার দেবেন সায়েব। কিন্তু লেম্বুপানির আর প্রয়োজন নেই।

"ব্রেকফাস্ট সায়েব?" পাঁচতারা হোটেলে সুশিক্ষিত বেয়ারা জানাল এখানকার ব্রেকফাস্টের কয়েকটি পদ অতি মনোহারী।

ব্রেকফাস্টের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই নবগোপালের। একখানা ইংরিজি সংবাদপত্রে আগ্রহী তিনি।

ইংরিজি কাগজ প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে হাজির এল। প্রথম পাতার কিছুই পড়লেন না নবগোপাল। সোজা চলে গেলেন সম্পাদকীয় পাতায় ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের কলমে।

পা দিয়ে ধরিত্রীর স্পর্শ এবং চোখ দিয়ে সংবাদসুখ একই সঙ্গে উপভোগ করছেন নবগোপাল। আজ তিনটি নবজাতকের বিস্তারিত সংবাদ রয়েছে প্রথম কলমে। জন্মকেই এই শহরে এখনও প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু এত বড়ো শহরে তিনটি মাত্র শিশুর আবির্ভাব কেন? মৃত্যুঘোষণাও রয়েছে তিনটি। তা হলে কলকাতায় জন্মমৃত্যুর হার একই রয়েছে—এখানে মানুষ কমছেও না বাড়ছেও না। তারপর 'অ্যাকনলেজমেন্ট' কলমে কে একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক কোন বিখ্যাত ডাক্তারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন রোগ নিরাময়ের জন্য। তা হলে এ-শহরের হাসপাতালে এখন রোগ নিরাময় হয়। সব সরকারি প্রতিষ্ঠান এখনও রসাতলে যায়নি। তারপরেই সেই বিখ্যাত 'ইন মেমোরিয়াম' শিরোনাম।

বহু বছর পরে এই প্রথম ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় সুখলতার কোনো নামোল্লেখ নেই। স্মিথ বলে সেই বুড়িটা এ-বছরেও স্বামীর নাম স্মরণ করে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। উঃ, এই বিজ্ঞাপনটা

যে কত বছর ধরে বেরুচ্ছে। বুড়ি জেন স্মিথ এখনও শোকার্ত হৃদয়ে বাৎসরিক শোক প্রকাশ করে চলেছে।

'সুখলতা, তুমি নেই এবার', মনে-মনে ফিসফিস করে বললেন নবগোপাল। এবার যদি নবগোপালকে বিজ্ঞপ্তি দিতেই হত, তাহলে লেখা থাকত, 'আমার দায়িত্ব শেষ হয়েছে, সুখলতা।'

নবগোপাল অস্বস্তি বোধ করছেন হঠাৎ। তিনি ঐসব বিজ্ঞাপন এড়াবার জন্যে একেবারে শেষের পৃষ্ঠায় চলে গেলেন।

ঐ পাতাটাই মন দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পড়েছেন নবগোপাল। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি চলে গেল ছোট্ট একটা সংবাদে। এ-বছর কলকাতায় হাতেটানা-রিকশার শতবার্ষিকী নিঃশব্দে পালিত হচ্ছে। কলকাতার ট্রাফিকের ডেপুটি কমিশনার শিবু রায় ছাড়া আর কেউ এই ব্যাপারটা বোধ হয় নজর করেননি।

বেয়ারা হঠাৎ একটা কালো বোর্ডে শাদা খড়িতে কী একটা নাম লিখে পুলসাইডের অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। মাঝে-মাঝে কালো বোর্ডের শিঙে বাঁধা ঘণ্টা বেজে উঠছে। নবগোপাল হঠাৎ দেখলেন বোর্ডে তাঁরই নাম লেখা। ১৯৮২-র এই ৮ই সেপ্টেম্বর নবগোপাল তাহলে বিস্মরণের অন্ধকারে ডুবে থাকতে পারলেন না। কলকাতার কেউ তাঁকে তাহলে শেষ পর্যন্ত মনে রেখেছে।

নবগোপাল বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?"

একজন লোক মিস্টার সেনশর্মার খোঁজ করছে। "নিয়ে এসো তাঁকে। এখানেই নিয়ে এসো," প্রসন্ন কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন নবগোপাল।

না, লোকটা চেনা-জানা কেউ নয়। অফিসের মোটর ড্রাইভার। নবগোপালের জন্যে সে গাড়ি নিয়ে এসেছে। নবগোপাল এখন যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন।

নবগোপাল কী ভাবলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর ওকে বাড়ি চলে যেতে বললেন। "যতক্ষণ ইচ্ছে আমার নামে ডিউটি বসিয়ে নিও। আমি তোমার কাগজে ব্ল্যাংক সই করে দিচ্ছি। আর তুমি অফিসে না-গিয়ে যা মন চায় তাই করো প্রাণ ভরে।"

এরকম আজব কথা লোকটা কখনও কোনো সায়েবের কাছে শোনেনি।

সে সায়েবকে স্যালুট করল। নবগোপাল তার কাগজে সই করে দিয়ে অনেকদিন পরে খুব আনন্দ পেলেন।

আরও কিছুক্ষণ আকাশ-পাতাল ভেবেচিন্তে নবগোপাল উঠে পড়লেন। সুইমিং পুলে এখন বিবসনা সুন্দরীরা রঙিন মাছের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। নবগোপাল রিসেপশনে এসে চাবি জমা রাখলেন। তারপর হোটেলের আর্কেডে এসে দাঁড়ালেন।

গেটের সামনে বিশাল শিখ দারোয়ানজী সবিনয়ে জানতে চাইলেন গাড়ি ডাকতে হবে কিনা। নবগোপাল জানালেন, তাঁর অধীনে কোনো গাড়ি নেই।

"তা হলে ট্যাক্সি?"

না, ট্যাক্সিতেও প্রয়োজন নেই নবগোপালের। এবার ফুটপাথে নেমে পড়লেন নবগোপাল। তারপর দক্ষিণমুখো হয়ে নিউ মার্কেটের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

কলকাতার চৌরঙ্গী রোড এতো বছরে একটুও পাল্টায়নি। যোগ অথবা বিয়োগ হয়নি একটা দোকানও। কেবল পথচারীর ভিড় দ্বিগুণ হয়েছে। অনেকদিন আগে সাতসকালে কলকাতার সায়েবপাড়ায় এত লোকজন থাকত না।

একটা সরু রাস্তা পেরিয়ে ফারপোর সামনে এসে দাঁড়ালেন নবগোপাল। এইখানে অনেকদিন আগে সুখলতার সঙ্গে তিনি একবার এসেছিলেন। তখন ডিনারের পয়সা ছিল না, কিন্তু ওপরের ব্যালকনিতে বসে টি-এর অর্ডার দিয়েছিল সুখলতা। সে এক অবিস্মরণীয় আনন্দ। পৃথিবীর কোনো মানুষ বোধহয় চায়ের আসর থেকে কখনও এতো আনন্দ নিংড়ে নিতে পারেনি।

একবার ঢুকবেন নাকি ফারপোতে? কিন্তু নবগোপাল হঠাৎ আবিষ্কার করলেন ফারপো নেই, সেখানে বিচিত্র এক বাজার বসেছে। প্রিয়জন-বিয়োগের ব্যথা অনুভব করলেন নবগোপাল। কলকাতায় কোনো ভালো জিনিস শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে না। না-হলে কেউ ফারপো তুলে দেয়? সুখলতার ইচ্ছে ছিল, টাকাকড়ি হলে মাসে একদিন ফারপোতে আসবে।

নবগোপাল চৌরঙ্গীর পূর্বদিকের ফুটপাত ধরে দক্ষিণদিকে এগিয়ে চলেছেন। অনায়াসে লিন্ডসে স্ট্রিট পেরিয়ে গেলেন তিনি। তারপর হাজির হলেন সদর স্ট্রিটের মোড়ে। কী ভেবে এবার বাঁদিকে মোড় নিলেন নবগোপাল।

এইখানে অনেকগুলো রিকশা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক, দুই, তিন...ছ'খানা রিকশা গুনে ফেললেন নবগোপাল। বাইশ বছর আগেও ঠিক এতগুলো রিকশা এই মোড়ে এইভাবেই দাঁড়াত। রিকশা তাহলে কলকাতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলেছে না। যেমন কলকাতা তাল রেখে ভারতবর্ষের অগ্রগতির সঙ্গে জোর কদমে এগোতে পারছে না।

ঠুন ঠুন—রিকশার ঘণ্টা বাজছে। এইভাবেই রিকশার চালক আজও সম্ভাব্য আরোহীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

রিকশাওয়ালারা ভাবছে কোনো নতুন আদমী এসেছেন। "আইয়ে আইয়ে হুজুর। কোথায় যাবেন?"

খুব ভালো প্রশ্ন করেছে রিকশাওয়ালা। আমরা কোথা থেকে এসেছি, কোথায় রয়েছি এবং এই মুহূর্তে কোথায় যেতে চাই তা নবগোপালের জানা নেই।

নবগোপাল গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলেন ওই রিকশাওয়ালাদের দিকে। ওরা বোধহয় নবগোপালের মুখ দেখে বুঝতে পারছে না যে রিকশাওয়ালাদের ওপর তাঁর মোটেই সন্তুষ্টি নেই।

সদর স্ট্রিটের উত্তরদিকের ফুটপাথ ধরে ধীরে-ধীরে পূর্বদিকে হেঁটে চলেছেন নবগোপাল। রিকশাওয়ালার ওপর পুরনো রাগটা হঠাৎ বুকের মধ্যে সুড়সুড় করছে।

নবগোপালের মনে পড়ল আজ থেকে ঠিক বাইশ বছর আগে এমনই এক ৮ই সেপ্টেম্বর জনার্দন রিকশাওয়ালাকে তিনি চড় মেরেছিলেন।

কী আশ্চর্য! জনার্দন সেদিন রাগ করেনি। চড় হজম করেও নবগোপালকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কোথাও যেতে হবে নাকি?"

জনার্দন রিকশাওয়ালার শরীরটা ছিল পেটানো ইস্পাতের মতো। একবার রেগে তেড়ে এলে আত্মরক্ষায় ব্যর্থ হতেন নবগোপাল। কিন্তু জনার্দন কিছুই করেনি।

জনার্দন রিকশাওয়ালার একটা ছবি এখনও নবগোপালের অ্যালবামে আছে। ওর রিকশায় সাড়ে তিন বছরের সুমেধা বসে আছে, হাসছে। ছবিটা সুখলতা নিজেই তুলেছিল। ছবিটা দেখিয়ে সেদিন নবগোপাল নিজেই সুমেধাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোর কিছু মনে পড়ে?"

রিকশা কেন, কলকাতার কোনো স্মৃতিই নেই সুমেধার মনে। ভালোই হয়েছে। সুমেধা এখন কোনো পিছুটান না রেখেই বিদেশি স্বামীর সঙ্গে বিলেতে ঘরসংসার করতে পারবে।

নবগোপাল দেখলেন, এই সকালেই কলকাতার রিকশাওয়ালারা বেশ কর্মব্যস্ত হয়ে উঠছে। একেবারে নিরাসক্ত কর্মযোগী বলতে যা বোঝায় এরা তাই। কোথাও কোনো উল্লাস নেই, উচ্ছ্বাস নেই—আজ যে রিকশা শতবার্ষিকীর খবর বেরিয়েছে সে সম্বন্ধেও ওদের মনে কোনো কৌতূহল অথবা আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না।

নবগোপাল দেখলেন, একটা বিরাট ঝাঁকায় কয়েক ডজন মুরগিকে প্যাসেঞ্জার হিসাবে টানতে-টানতে দাড়িওয়ালা এক রিকশাচালক ঠুন ঠুন আওয়াজ করতে-করতে সদর স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলেছে। কোনো মানুষ যাত্রী নেই ওই গাড়িতে। কলকাতার বাসে যেরকম গাদাগাদি করে মানুষ চড়ে মুরগিগুলো সেরকম গাদাগাদিভাবেই মানুষটানা গাড়িতে চড়ে হোটেলে যাচ্ছে। ওখানে ওদের জন্যে কী অপেক্ষা করছে সে সম্বন্ধেও কোনো উদ্বেগ নেই মুরগিদের। রিকশা এগিয়ে চলেছে।

আরও একখানা রিকশায় বিরাট বপু এলিয়ে দিয়ে সিন্ধি রমণী চলেছেন চৌরঙ্গী লেনের দিকে। বিপুলাঙ্গিনীর শরীরটা সোজা নেই—১৩৫ ডিগ্রি হেলে পড়েছে বাঁদিকে। রিকশাওয়ালার কোনো অভিযোগ নেই—ছন্দ রেখেই বেশ জোরে সে ছুটে চলেছে।

ঘড়ির দিকে তাকালেন নবগোপাল। রিকশার ওপর রাগ এখনও তাঁর রয়েছে, কিন্তু হঠাৎ রিকশা চড়তে ইচ্ছে করছে নবগোপালের।

একটা চলমান রিকশাকে থামালেন নবগোপাল। কোনো কথা না বলেই উঠে বসলেন।

তারপরেই মুশকিল বাধল। কোথায় যেতে হবে? জানতে চাইছে

রিকশাওয়ালা।

খুব শক্ত প্রশ্ন, উত্তর জানা নেই নবগোপালের। এই মানসিক অবস্থায় বোধহয় রিকশা চড়া উচিত নয়। কিন্তু নবগোপাল হাল ছাড়লেন না। বললেন, "চলো সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলো।"

রিকশা সচল হয়ে উঠল এবং তার গতি ক্রমশ বাড়তে লাগল।

"রিকশা, রিকশা তুমি আস্তে-আস্তে চলো।" নবগোপাল সবিনয়ে অনুরোধ করলেন। হুজুরের কি তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছবার তাড়া নেই? অবাক হল রিকশাওয়ালা। প্রায় সব যাত্রীই তো রিকশাওয়ালাকে জলদি করতে বলে।

রিকশার গতি সামান্য কমে এসেছে। নবগোপাল বললেন, "আমি অনেকদিন পরে এই শহরে এসেছি। এখানকার পথঘাট, বাড়ি ঘরদোর, দোকানপাট, লোকজন সব আমি ভালো করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে চাই, রিকশাওয়ালা।"

রিকশাওয়ালা বলল, "জো হুকুম। তবে, হুজুর, গরিব রিকশাওয়ালার পয়সার কথাটাও মনে রাখবেন।"

"কী নাম তোর?" শুধু রিকশাওয়ালা কথাটা ভালো লাগছে না নবগোপালের।

"রামপ্রসাদ।"

"জেলা?"

"মজঃফরপুর।"

"গাঁও?"

"সীতাকুণ্ড।"

"বাঃ, সীতাকুণ্ডের রামপ্রসাদ। আমি তো ঠিক লোককেই পেয়ে গিয়েছি। বাবা রামপ্রসাদ, আমি নবগোপাল। বরোদা কি রহনাওয়ালে। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তুমি মনের সুখে গাড়ি চালাও, আমার কোনো তাড়া নেই।"

রামপ্রসাদ একবার পিছন ফিরে প্যাসেঞ্জারের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল। সন্ধেবেলায় এমন কথা শুনলে রামপ্রসাদ ধরে নিত সায়েব নিশ্চয় দারু টেনেছেন। এই সাতসকালে অবশ্য তেমন সন্দেহ হয় না।

"আপনি হুজুর, কলকাতায় নতুন এলেন?" জানতে চায় রিকশাওয়ালা।

"রামপ্রসাদ, আমি নতুন বটে, আবার পুরনোও বটে," উত্তর দিলেন নবগোপাল। "কলকাতার কোনো কিছু আমি মনে রাখতে চাই না বাপধন, তবু এখানকার পথঘাট আমার মুখস্থ। সেই যা বহু বছর আগে দেখে গিয়েছি, ঠিক তাই রয়েছে। কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই। যদি ওই জনার্দনকে খুঁজে বের করতে পারি তা হলে হয়তো দেখব সে ব্যাটাও ঠিক একই রকম রয়েছে।"

"হুজুর, বাঁদিকের ওই বাড়িটা গত সপ্তাহে ভেঙে পড়েছে।" এখন গাইডের কাজ করছে রামপ্রসাদ।

"বাপধন, একদিন এই পুরো শহরটাই হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়বে—তখন তোমরা খুব মুশকিলে পড়ে যাবে। সারাদিন কোনো সওয়ারী মিলবে না—তখন দেশে ফিরে গিয়ে কেবল খেতি করতে হবে তোমাদের।"

রাস্তায় নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকা একটা কুকুরকে কাটাতে-কাটাতে রামপ্রসাদ হেসে উঠল। সে বুঝতে পেরেছে তার প্যাসেঞ্জার সায়েব বেশ রসিক আদমী।

রাস্তার মোড়ে গরম জিলিপি বিক্রি হতে দেখে নবগোপাল বলে উঠলেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও।"

রিকশা থামল। নবগোপাল রিকশা থেকে নেমে দোকানটা খুব ভালোভাবে দেখলেন। দোকানদারের ডানদিকে যে-থালাটায় বাইশ বছর আগে যেমনভাবে জিলিপি সাজানো থাকত আজও ঠিক একইভাবে রয়েছে। সেই একই লোক এখনও সামনে বসে-বসে জিলিপি ভেজে রসে চুবোচ্ছে— লোকটার বয়স একটু যা বেড়েছে। এই দোকানে নিয়মিত মিষ্টি কিনতে আসতেন নবগোপাল। সকালবেলায় জিলিপিটা সুখলতার খুব প্রিয় খাদ্য ছিল—যদিও ভারতবর্ষের শারীরিক অধঃপতনের পিছনে জিলিপির অবদান সম্পর্কে নবগোপাল মাঝে মাঝে সরস মন্তব্য করতেন।

জিলিপির প্রথম ঠোঙাটা নবগোপাল এবার রিকশাওয়ালা রামপ্রসাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। লোকটা একেবারে তাজ্জব, কখনও এমন অপ্রস্তুত হয়নি সে। সওয়ারি জিলিপি খাওয়াচ্ছে রিকশাওয়ালাকে এমন অভিজ্ঞতা রামপ্রসাদের স্মরণে নেই।

জনার্দনেরও ঐ একই অবস্থা হয়েছিল সেবার যখন তাকে প্রথম জিলিপি দেওয়া হলো। আইডিয়াটা সুখলতার–দুই যাত্রী গরম জিলিপি খাচ্ছে আর রিকশাওয়ালা চুপচাপ বসে আছে তা ওর ভালো লাগেনি। জিলিপি পর্বের পরেই খুব ভাব হয়ে গেল জনার্দনের সঙ্গে। জনার্দনকে পেলে আর কোনো রিকশাওয়ালাকে চাইত না সুখলতা.

জিলিপির পরে রামপ্রসাদ লজ্জা পেয়ে মৃদু আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু নবগোপাল জোর করে তাকে চা খাইয়েছিলেন। "খেয়ে নে বাপধন, তোকে আজ অনেক ছোটাছুটি করতে হবে।"

খেয়ে-দেয়ে রুমালে হাত মুছে আবার রিকশায় চড়লেন নবগোপাল। দু'বার ঘন্টি দিয়ে আবার পূর্বদিকে চলমান হয়েছে রামপ্রসাদ। সে জানতে চাইছে, সায়েব কোথায় যাবেন?

"এইটাই তো শক্ত কথা! তুমি বাছা, যেমন যাচ্ছ তেমন চলো। যাবার জায়গা হাজির হলে আমি নিজেই তোমাকে গাড়ি থামাতে বলব।"

সায়েবের কথার ভঙ্গিতে রামপ্রসাদের ধারণা হলো সায়েব আবার রসিকতা করছেন।

"রামপ্রসাদ, কলকাতার লোকরা কি ঝাড়পোঁছ ভুলে গিয়েছে? প্রত্যেকটা বাড়ির গায়ে এত নোংরা?" আজকের কাগজেই নবগোপাল পড়েছেন, প্রতিদিন কলকাতার গায়ে ধুলোর যে পাতলা আবরণ পড়ে তার ওজন দেড়টন। বছরে পাঁচশো টন, বাইশ বছরে তাহলে এগারো হাজার টন বাড়তি ধুলো জমেছে কলকাতার গায়ে।

হুজুর কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারছে না রামপ্রসাদ। "ধুলো তো জমবার জন্যেই, বাবুজী।"

এই ধুলোর জন্যে খিটিমিটি লেগে থাকত সুখলতার সঙ্গে। ধুলো একদম বরদাস্ত করতে পারত না সুখলতা, ঝাড়পোঁছ করে বাড়িটা সারাক্ষণ ঝকঝকে করে রাখত সে। সুখলতাকে অত খাটতে বারণ করতেন নবগোপাল। সে বলত, না মুছলে বাড়িটাই একদিন কলকাতার ধুলোয় চাপা পড়ে যাবে। মিথ্যে বলেনি তখন সুখলতা।

আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে পড়লেন নবগোপাল। কয়েকখানা নতুন নোটিসবোর্ডের দিকে নজর পড়ল তার। রাস্তাটা আর ফ্রি

স্কুল স্ট্রিট নেই, নবগোপালের অনুপস্থিতিতে মিরজা গালিব কোন সময়ে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন।

"বাবা রামপ্রসাদ, রাস্তার নাম পাল্টে গরমেন্ট ভালোই করেছে। আইনমাফিক চলতে গেলে সমস্ত কলকাতারই নাম রাখতে হয় ফ্রি স্কুল—এখন গরমেন্টের দয়ায় কলকাতার সব ইস্কুলই তো ফ্রি! তোরা বাপধন এবার রিকশাটাও ফ্রি করে দে, কলকাতার লোকদের তাহলে আর কোনো দুঃখ থাকবে না।"

নবগোপাল চালকের কাছ থেকে উত্তর না পেয়েও আপন মনে বলে চলেছেন।

মিরজা গালিব স্ট্রিট থেকে রিকশা পূর্বদিকে মোড় নিল। আরও বেশ খানিকটা পথ গেলেই ট্রাম লাইন—নবগোপালের মনে পড়ছে। ট্রামলাইনের আগেই আবার দক্ষিণদিকে মোড়। ওখানেই ডেভিড লেন। তিন নম্বর ডেভিড লেন। ঠিকানাটা নীলখামের মধ্যে নীল চিঠির কাগজে নবগোপালের বুকের কাছে খড় খড় করছে।

খড়খড় করছে? না বুকের সঙ্গে ভিজে চিপসে রয়েছে? নবগোপাল একবার বুকপকেটে হাত দিলেন। ওজন বোঝা যায় না, কিন্তু চিঠিটা আছে! এই লেটারহেডটাই তো একদিন সানশাইন প্রিন্টিং প্রেস থেকে নবগোপাল ছেপে এনেছিলেন। সুখলতার ছাপানো লেটারহেডের খুব শখ ছিল। নবগোপাল অবশ্য রসিকতা করেছিলেন, "এখন আর কাকে অত চিঠি লিখবে?"

"তোমাকে ছাড়া দুনিয়ার সব্বাইকে।" মিষ্টি উত্তর দিয়েছিল নববিবাহিতা সুখলতা।

"যদি আমি অনেক দূরে চলে যাই?" নবগোপাল ইচ্ছে করেই প্রশ্ন তুলেছিল।

"আমিও তাহলে অনেক দূরে চলে যাব," সুখলতার সাফ জবাব।

"মানুষকে তোমরা কতদূর নিয়ে যাও, রিকশাওয়ালা?" নবগোপাল হঠাৎ রামপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করে বসলেন।

"বেশি দূর আমরা নিয়ে যাই না, হুজুর।"

"ভালো কথা, খুব ভালো কথা। কখনও কোনো প্যাসেঞ্জারকে খুব দূরে

নিয়ে যাবে না। সে হুকুম করলেও। জানো বাপধন, নিজের খেয়ালে নিজের জিদে মানুষ হঠাৎ দূরে চলে যায়, তারপর ফিরে আসবার জন্যে ছটফট করে। কিন্তু তখন আর ফিরে আসতে পারে না। আমি বাবা তোমাকে অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।"

না, আর এগোতে চান না নবগোপাল। তাহলেই তো ঐ ডেভিড লেন এসে পড়বে। এখন তো ডেভিড লেনে যাবার সময় নয়। ঘড়ির দিকে আবার তাকালেন নবগোপাল। ঠিক এই সময় অনেকদিন আগে জনার্দনের রিকশা তো ডেভিড লেন থেকে বেরিয়ে মার্কেটের দিকে ছুটত। সেই রিকশায় একটা থলে হাতে বসে থাকত সুখলতা।

"রিকশা, রিকশা। আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। তুমি গাড়ি ঘুরিয়ে নাও— এখন হাতে একটুও সময় নেই। আমার অফিসে দেরি হয়ে যাবে।"

রামপ্রসাদ দ্রুতগতিতে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আবার মিরজা গালিবে ফিরে এল, তারপর উত্তর দিকে মোড় নিয়ে ছুটতে লাগল।

এবার বাজার এসে গিয়েছে। রিকশায় বসে-বসেই প্রাণভরে নানা জিনিস কিনছেন নবগোপাল। চারটে প্রমাণ সাইজের কপি কিনলেন নবগোপাল। ফুলকপিটা ওর ফেভারিট ছিল। অসময়ের কড়াইশুঁটি রাস্তা থেকেই কিনলেন নবগোপাল।

রামপ্রসাদ দেখলেন টুকিটাকি জিনিসে তার রিকশা ক্রমশ বোঝাই হয়ে উঠেছে। নবগোপাল ডিম কিনেছেন, মাখন কিনেছেন, সরষের তেলের একটা টিন কিনেছেন।

"চল বাবা, চল।" এবার তাড়া লাগালেন নবগোপাল।

রামপ্রসাদের রিকশা কয়েক-পা মাত্র চলেছে। এমন সময় আবার থামবার নির্দেশ হল। "ওরে হতভাগা, আসল জিনিসটাই তো কেনা হয়নি। আলু, পিঁয়াজ, রসুন এসবে কী হবে যদি চিকেন না থাকে?"

নবগোপালের মনে পড়ল জনার্দন থাকলে এরকম ভুল কিছুতেই হত না। সায়েবকে সে নিজেই মনে করিয়ে দিত চিকেনের কথা। মাসের প্রথম দিন নবগোপাল চিকেন কিনবেনই। সুখলতা চিকেন পছন্দ করত।

"না, কোল্ডস্টোরের চিকেন নয়, বাছা। গতর নাড়িয়ে একটু এগিয়ে চলো। জ্যান্ত জিনিস থাকতে মর্গের মড়া কেউ খায়?"

মর্গ! মগ থেকে কালো যে গাড়িগুলো বেরোয় তাকে কী যেন বলে? অ্যামবুলেন্স? না না, আর একটা কী স্পেশাল নাম আছে। হার্স! এখন মনে পড়েছে, নবগোপালের। "বাপধন, ঠাণ্ডা ওই মাল গাড়িতে চড়ালে তুই হয়ে যাচ্ছিস হার্স! কোন দুঃখে তা হতে যাবে?"

রিকশাতে বসে-বসেই রাস্তার স্টল থেকে আড়াই কেজি চিকেন কাটিয়ে নিলেন নবগোপাল। একখানা প্লাস্টিকের ব্যাগে দোকানদার মাংসটা পুরে দিয়েছে।

বাজার পর্ব শেষ হয়েছে, এবার বেশ হাল্কা বোধ করছেন নবগোপাল। অনেকদিন পরে এইভাবে নিজের খেয়ালখুশি মতন বাজার করা গেল।

কিন্তু তারপরেই মুশকিলে পড়ে গেলেন নবগোপাল। রিকশাওয়ালা জানতে চাইছে এবার কোথায় যাবে?

"অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন বাপধন? চল না। চলবার জন্যেই তো রাস্তায় বেরিয়েছিস তোরা।" নবগোপাল মৃদু বকুনি লাগালেন। রিকশাওয়ালা যেন অতিমাত্রায় কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। ঐ হতভাগা জনার্দনের মতো। সাধে কি আর জনার্দন চড় খেয়েছিল।

আরও অনেকক্ষণ ঘুরেছে রিকশাওয়ালা। কলকাতার পথে পথে "বাবুজী, আপকা ঘর কাঁহা?"

"আমার ঘর আছে বৈকি, বাপধন। আমি কি ফুট-পাথকা রহনাওয়ালে। অতশত খোঁজখবর তোমার দরকার কী? তুমি তোমার কাজ করো না।"

আরও কিছুক্ষণ লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরলেন নবগোপাল। এত মাল উঠেছে যে রিকশায় ভালোভাবে পা রাখাও যাচ্ছে না। এখন কোথায় যাওয়া যায়? নবগোপাল ভেবেই পাচ্ছেন না।

তারপর হঠাৎ মাথায় বুদ্ধিটা এসে গেল। নবগোপাল জিজ্ঞেস করলেন? "রিকশাওয়ালা, তোমার ঘর কোথায়?"

"নোনাপুকুর বাবুজী।"

"মলঙ্গা লেনেও তোমাদের একটা ডেরা আছে না?"

"ওটা সীতাকুণ্ডকা রহনেওয়ালাদের নয়।"

"সীতাকুণ্ড মানেই তা হলে নোনাপুকুর।" নবগোপাল বেশি খুশি হলেন।

"তোমার ওয়াইফ, তোমার বালবাচ্চা, তারা সব কোথায়?" জানতে চান নবগোপাল।

তারা সবাই তো সীতাকুণ্ডেই থাকে। তবে রামপ্রসাদের জেনানা কলকাতায় এসেছে কালীঘাটে পুজো দিতে।

খবর শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন নবগোপাল। "তাহলে এখন নোনাপুকুরেই চলো, বাপধন।"

অনেক আঁকাবাঁকা এবড়োখেবড়ো সরু-সরু পথ পিছনে ফেলে রেখে রিকশা চলেছে নোনাপুকুরের দিকে। নবগোপালের মন্তব্য: "একটু বড় রাস্তা ধরে চললে হত না? তাহলে এইসব বিছের মতো রাস্তায় পাক খেতে হত না।"

রামপ্রসাদ: "বড় রাস্তা হুজুর মোটরগাড়ির জন্যে। ওখানে রিকশা ঢুকলেই পুলিশ চালান করে দেবে।"

না বাপু, চালানে দরকার নেই। জনার্দনকে একবার পুলিশে চালান করেছিল। সুখলতার কান্নাকাটিতে বেনিয়াপুকুর থানা থেকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে নবগোপাল সেবার ওর রিকশা উদ্ধার করে এনেছিলেন। পরে মনে হয়েছিল, ওকে পুলিশের হাত থেকে খালাস না করালেই ভালো হত। জনার্দনটা ঐভাবে তাহলে মেমসায়েবের মুঠোর মধ্যে চলে যেত না। শেষ পর্যন্ত চড় তো খেতে হল জনার্দনকে। আজও একটা চড় মারতে ইচ্ছে করছে জনার্দনকে। কিন্তু বহুদিন আগের সেই জনার্দন এখন কোথায়?

নোনাপুকুর এসে গিয়েছে। "এবার কোথায় যাব হুজুর?" রামপ্রসাদ জিজ্ঞেস করছে।

"বলছি, বলছি। এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন?"

রিকশা অগত্যা এগিয়ে চলেছে।

একটু পিছনে হেলান দিয়ে নবগোপাল বললেন, "রামপ্রসাদ, এই বছরটা তোমাদের পক্ষে স্মরণীয়।"

"তাই নাকি?" আকাশ থেকে পড়ছে রামপ্রসাদ। ব্যাপারটা তার মাথায় মোটেই ঢুকছে না।

"ওরে বাবা, এইটে হল রিকশার সেন্টেনারি—শতবর্ষ। কলকাতার রাস্তায় এত ঘোরাঘুরি করো আর এইটুকু খবর রাখো না? ম্যানচেস্টার

থেকে সায়েব এসে গেল রিকশা শতবার্ষিকী সম্বন্ধে বই লিখতে, আর তোমরা নির্বিকার বসে আছো।"

আকাশ থেকে পড়ছে রিকশাওয়ালা রামপ্রসাদ।

নবগোপাল বলে চললেন, "ওরে বাবা, বরোদাতে বসে-বসে আমি জানলাম—১৮৮২ সালে এক পাদ্রী এদেশে হাতেটানা রিকশা চালু করলেন। তারপর এই একশো বছর পরে কলকাতা ছাড়া দুনিয়ার কোথাও হাতেটানা রিকশা বেঁচে নেই।"

"আপনি কী বলছেন, হুজুর? একশো বছর আগে দুনিয়াতে রিকশা ছিল না? তাহলে রামসীতা অযোধ্যায় কী চড়তেন?"

"তাঁরা নিশ্চয় রথ চড়তেন, কিংবা পাল্কী। যা বলছি বিশ্বাস করো, একশো বছর আগে রিকশা ছিল না। খোদ ম্যানচেস্টারের সায়েব খোঁজখবর নিয়ে লিখেছে। সায়েবের নামটা আমার মনে পড়ছে না।"

নবগোপাল এবার একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। "আরও শোনো, একশো বছর আগে কোনো মানুষ রিকশায় চড়ত না। তখন শুধু মাল বইবার জন্যে রিকশা ব্যবহার হত। তখনও সীতাকুণ্ড থেকে তোমার ঠাকুর্দা এখানে আসেনি--তখন রিকশাওয়ালা মানেই চীনে! তারপর বিহার-ইউ পির হাতে কলকাতার রিকশা চলে গেল। বুঝলে কিছু?"

"না হুজুর।" রামপ্রসাদ কিছুই বুঝতে পারছে না।

"দেখিস বাবা, সবকিছু বুঝতে গিয়ে আবার গাড়ি ওল্টাস না। যা বলছি শোন, সায়েব বলছে, এই একশো বছরে রিকশার কোনো পরিবর্তন হয়নি। যেমন এসেছিল ঠিক তেমন আছে। তবে রিকশা বোধ হয় শেষে পর্যন্ত টিকে থাকবে না, রামপ্রসাদ।"

"সে কি হুজুর?" চন্দ্র সূর্য উঠবে অথচ রিকশা থাকবে না, ভাবতেই পারছে না রামপ্রসাদ। "রিকশাওয়ালা তো কারও কোনো ক্ষতি করেনি, হুজুর।"

"সায়েব লিখেছে বটে, হাজার-হাজার লাখ-লাখ রিকশাওয়ালা নীরবে মানুষকে উৎসবে, ব্যসনে দৈব দুর্ভিক্ষ রাষ্ট্রবিপ্লবে সেবা করেছে। কিন্তু ম্যানচেস্টারের সায়েব কতটুকু জানে? জনার্দন আমার ক্ষতি করেছে। কিন্তু এখন সেসব কথা তুলব না। এখন রিকশার শতবার্ষিকী—শতবর্ষে ভালো

কথা বলতে হয়।"

"কলকাতার রিকশার বাৎসরিক আয় কত জানিস?"

"কত হুজুর?"

"সায়েবদের হিসেব অনুযায়ী আশি থেকে নব্বই কোটি টাকা।"

"সে তো অনেক টাকা।"

"অনেক খাটলে অনেক টাকা হবে না? রিকশাওয়ালা এই শহরকে যে সার্ভিস দেয় তার দাম টাকা দিয়ে মাপা যায় না। তুই বাপ একটু দেখেশুনে চল।"

আরও কিছুটা ঘুরল রিকশাওয়ালা। "এবার কোথায় বাবুজী?" রামপ্রসাদ জানতে চাইছে।

"নোনাপুকুরের এত কাছে এলি, একবার নিজের বাড়িটা দেখে যাবি না? দেশ থেকে আনা বিবি কী বলবে রে।" রামপ্রসাদ বুঝল, সায়েবের হাতে অনেক সময় আছে। তাই সে নিজের বস্তির দিকেই চলল।

"বাপধন, তোর বউ এবার কতদিন কলকাতায় থাকবে? সেনটেনারি ইয়ার বলে কথা!"

"আমাদের রিকশাপট্টিতে একখানাই বাড়তি ঘর আছে। ওইখানেই বউরা ঘুরে ফিরে আসে, আট দশ দিন থেকে চলে যায়। আগে তো এ-ঘরও ছিল না।"

"তা, বউ কালীঘাট যাবে কী করে? রিকশা চড়ে?" জিজ্ঞেস করেন নবগোপাল সেনশর্মা।

"কী যে বলেন!" ফিক করে হেসে ফেলল রামপ্রসাদ।

"বুঝেছি, বুঝেছি! স্বামী যদি বউকে টানতে-টানতে নিয়ে যায় তাহলে বউয়ের পাপ হবে! অথচ অন্যের গাড়িতে ভাড়া অনেক। তাই বাসে কিংবা হেঁটে মেরে দেবে তোমার বউ। ভালোই তো।"

রামপ্রসাদ এবার নিজেও গল্পে জমে গিয়েছে। "হুজুর, ঐ যে সেন তেওয়ারির কথা বললেন, ওর আসল ব্যাপারটা কী? ওতে কী হয়?"

হা-হা করে প্রাণখুলে হাসলেন নবগোপাল। "সেন এবং তেওয়ারি নয়—সেনটেনারি। শতবার্ষিকী। অন্য প্রতিষ্ঠান হলে কাগজে ছবি ওঠে, আলো

দিয়ে বাড়ি সাজানো হয়, যারা চাকরি করে তাদের বোনাস মেলে।"

"বাবুজী, আজ তাহলে স্পিশাল বকশিস মিলবে তো?"

"দেখি। আগে কী রকম সার্ভিস পাই তোমার কাছ থেকে। তারপর তো ওসব কথা!"

নোনাপুকুরের রিকশা-বস্তি এসে গিয়েছে। রিকশাওয়ালাদের সমস্ত ব্যাপারটাই প্রায় রাস্তার ওপর। শুধু বস্তির দু-তিন খানা ঘর এদের আয়ত্তে।

"যাও বাছা, লজ্জা করছ কেন? মেমসায়েবকে একবার দেখে এসো।" বলে উঠলেন নবগোপাল।

আদেশ মান্য করে ভিতর থেকে টুক করে ঘুরে এল রামপ্রসাদ।

"বউ খুশি তো?" জিজ্ঞেস করেন নবগোপাল।

"খুব খুশি বাবুজী।"

এই সময় একবার তো বউকে দেখে যাবে, বাপধন। নেকস্ট সাতদিনের ভাড়া এই রইল বলে দশ টাকার দু'খানা নোট গুঁজে দিলেন রামপ্রসাদের হাতে।

অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিতে আনন্দ লুকিয়ে রাখতে পারছে না রামপ্রসাদ। আবার সে রিকশার হ্যান্ডেল তুলতে যাচ্ছিল। এমন সময় নবগোপাল হাঁ হাঁ করে উঠলেন। "কই? বউমাকে ডাকো।"

বউমা অদূরেই অপেক্ষা করছিলেন। রামপ্রসাদের ইঙ্গিতে সে বেরিয়ে এলো। কচি বউ। বেশি বয়স নয়। এই একুশ-বাইশ হবে।

মেয়েটি নমস্কার করল। নবগোপাল সস্নেহে তার দিকে তাকালেন। সুখলতার বয়স আর একটু বেশি ছিল—চব্বিশ। এই বউমা লাজুক। সুখলতাও লাজুক ছিল—ইস্কুলে মাস্টারি করা সত্ত্বেও।

নবগোপাল হঠাৎ বললেন, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছো বাপধন? হাত লাগাও। মালগুলো বউমাকে নামিয়ে দাও।"

"কী বলছেন বাবুজী? এইসব মাল আমরা নিয়ে নেব?" রিকশাওয়ালা ভাবতেই পারছে না।

"সময় নষ্ট কোরো না, জলদি হাত লাগাও," এই বলে নবগোপাল নিজেই রিকশা থেকে মাল নামাতে লাগলেন।

নবগোপাল মনে-মনে ভাবলেন, বাঁচা গেল। খেয়ালের মাথায় বাজার

থেকে কেনা জিনিসগুলোর একটা গতি হল। সেবার তো ৮ই সেপ্টেম্বর সব জিনিস রাস্তায় ফেলে দিতে হয়েছিল। এবার তবু তো কাজে লাগল। অবশ্য নবগোপাল মুখে বললেন, 'লজ্জা কী? এখন তো তোমাদের সেন তেওয়ারি!"

রিকশা আবার চলমান হয়েছে। মুখ বাড়িয়ে নবগোপাল ঐ বউটাকে বলেছেন, "তুমি কিছু ভেব না, মা। ওর ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।"

রিকশায় ওপর বসে-বসে অতীতে ফিরে যাচ্ছেন নবগোপাল সেনশর্মা। অবশ্যই যেতে পারেন তিনি, শতবার্ষিকী বছরেই তো মানুষ পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখে—নবগোপাল তো মাত্র বাইশটা বছরের স্মৃতি নিয়ে খেলা করছেন।

এই রিকশা। বাইশ বছর আগে সেবারে রিপন লেনের মুখ দাঁড়িয়ে ছিলেন নবগোপাল। এই পথ দিয়ে তখনও সারিসারি রিকশা যেত অদূরের ওই ইস্কুলের দিকে।

একটা ছুটন্ত রিকশা হঠাৎ গতি কমাতে গিয়ে সামলাতে না পেরে উল্টে গেল। নতুন রিকশাওয়ালা নিশ্চয়—এখনও থামতে শেখেনি। থামাবার হাঙ্গামা না-থাকলে তো যে কেউ রিকশা চালাতে পারত! হইহই করে ছুটে গেলেন নবগোপাল। গাড়ির আরোহিণী ছিটকে রাস্তায় পড়েছেন। নবগোপাল তখন নিজেই মুখে জল ছিটিয়েছেন, রাস্তা থেকে তুলে দেহটাকে একটা বেঞ্চির ওপর তুলে দিয়েছেন। তারপর একটু সুস্থ হলে মহিলাকে বলেছেন, ডাক্তারখানায় চলুন। ডাক্তারখানায় যাবেন না মহিলা, তাঁর ইস্কুলে নাকি প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম আছে। শেষ পর্যন্ত নবগোপাল ইস্কুল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে ঐ ইস্কুলের ছোট ক্লাসের দিদিমণি সুখলতা ব্যানার্জিকে।

উল্টানো রিকশা থেকে আলাপ। শুরুতেই ঝঞ্ঝাট! ভাবা উচিত ছিল নবগোপালের।

কিন্তু তখন এসব কে ভাবে? নবগোপালের রক্তে প্রথম প্রেমের বন্যা নেমেছে। সুখলতা লাজুক। নবগোপালকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। ইস্কুল শুরু হওয়ার আগে, কখনও শেষ হবার পরে দু'জনে দেখা হয়ে যায়।

"রামপ্রসাদ, তুমি কোনোদিন প্রেমে পড়েছ।" নবগোপাল হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন।

"প্রেম কী জিনিস হুজুর?" রামপ্রসাদ আকাশ থেকে পড়ল।

"এই ধরো একজন ছাব্বিশ বছরের ছেলের সঙ্গে একজন বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ের দেখা হয়ে গেল। মেয়েটি খুবই ভদ্র, কোনোরকম হাঙ্গামায় থাকতে চায় না। কিন্তু ওই ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের ছেলের ওপরে তার টান ধরেছে, চেষ্টা করেও দূরে যেতে পারছে না।"

"যেরকম সিনেমায় হয় বাবুজী?" রামপ্রসাদ জানতে চাইছে। খরচ বাঁচানোর জন্যে সে সিনেমায় যায় না। আগে এক ফিলম কোম্পানির বাক্স বইতো বাঁধা দরে। তখন দু-একটা ছবির কিছু অংশ সে অফিসের অন্ধকার ঘরে দেখেছে।

"সিনেমায় নয়, জীবনেও হয় রে বাবা!" মিষ্টি বকুনি লাগালেন নবগোপাল।

রামপ্রসাদ ব্যস্ত হয়ে বলল, "না হুজুর, ওইসব প্রেম রিকশাওয়ালার হয় না। সীতাকুণ্ড গ্রামের সব ছেলের বিয়ে এগারো বছরে হয়ে যায়।"

রিকশা এবার ছোটদের সেই ইস্কুলের সামনে দাঁড়িয়েছে, যার সামনে একদিন নবগোপাল গভীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতেন। কতদিন এখানে এসেছেন নবগোপাল, সুখলতাকে রিকশা থেকে নামতে দেখেছেন, সুখলতা মিষ্টি হেসেছে, কিন্তু কখনও বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলেনি। কলকাতার ইস্কুল মিসট্রেসদের ভদ্রতাবোধ এবং সামাজিক দায়িত্ব অনেক বেশি। সংসারের চলতি নিয়মকানুন ভাঙার জন্যে কেউ ইস্কুল মাস্টার হয় না, ইস্কুল মাস্টারদের মনে রাখতে হয় ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁদের দেখেই শিখবে।

নবগোপাল দেখলেন, আজও কমবয়সী মেয়েরা পড়াবার জন্যে ইস্কুলে ঢুকছে নিজেদের গাম্ভীর্য নিয়ে, যেমন সুখলতা একদিন এখানে আসত। এই ইস্কুলের ঐতিহ্য অন্য, মেয়েদের এখানে আপস্টার্ট বানানো হয় না। মেয়েরা এখানে রক্ষণশীল ঐতিহ্যেই বড় হয়ে ওঠে।

তবু কয়েকবার শিল্প প্রদর্শনী এবং সিনেমায় সুখলতাকে নিয়ে যেতে পেরেছেন নবগোপাল। কিন্তু সে আর কতটুকু সময়?

সুখলতার মধ্যে মাধুর্য এবং রক্ষণশীলতা এক সঙ্গে বসবাস করত। নবগোপাল বুঝতে পারতেন তাঁকে দেখতে পেলে সুখলতা খুশি হয়, সাক্ষাতের সময়টা দীর্ঘতর হলে মোটেই বিরক্ত হয় না। কিন্তু ওই পর্যন্ত। পছন্দ হওয়ার কোনো দুরন্ত প্রকাশ নেই, নিজেকে বিলিয়ে দেবার ব্যস্ততা নেই। নবগোপাল জানতেন, এই ধরনের মেয়েরাই সুগৃহিণী হয়, এরা দায়িত্ব নিয়ে পালন করতে জানে, সখীভাবের প্রকোপে এরা মাতৃত্বভাবকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে না।

কিন্তু নবগোপালের বুকে অনেক কথা জমে ছিল। সেসব কথা কী করে বলবেন, কোথায় বলবেন, কিছুই ভেবে উঠতে পারতেন না। একবার নবগোপাল ভেবেছিলেন ডায়মন্ডহারবার চলে যাবেন। কিন্তু সুখলতা বদনামকে ভয় করে এবং এড়িয়ে চলে। সে বলেছে, "মনে রেখো, আমি ইস্কুলের মাস্টার। আমাদের ছাত্রীরা যে কোথায় ছড়িয়ে নেই কেউ বলতে পারবে না।" কোনো জায়গাতে গিয়েই তাই স্বস্তি নেই।

এমন অবস্থায় নবগোপাল এক নতুন মতলব এঁটেছিলেন। কী আশ্চর্য, সুখলতা রাজি হয়ে গেল।

রামপ্রসাদের রিকশা হঠাৎ একটু চমকে উঠল, সামনে একটা ঠেলাগাড়ি পড়েছে। ঠেলাগাড়ি এবং রিকশায় প্রচণ্ড বাকযুদ্ধ লেগে গেল। এই এদের মুশকিল। শ্রেণি ঐক্য বলে কোনো জিনিস নেই এই শহরে। রামপ্রসাদ, ওই ঠেলাওয়ালা তোমার আপন লোক। তোমার মতোই ও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে। ঝগড়া করো স্কুটারের সঙ্গে, টেম্পোর সঙ্গে, ট্যাক্সির সঙ্গে প্রয়োজন হলে মোটর গাড়ির মালিকের সঙ্গে, কিন্তু ঠেলাওয়ালাকে ছেড়ে দাও।

নবগোপালের কথায় কাজ হল। রামপ্রসাদ রিকশাওয়ালা রাস্তার কুকুরের মতো রাগে গরগর করতে-করতে আবার রিকশা টানায় মন দিল।

ইস্কুল ছেড়ে অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন নবগোপাল। কিড স্ট্রিট এবং মিরজা গালিবের মোড়টা দেখা যাচ্ছে। নবগোপাল একটু লাজুক-লাজুক স্বরে বললেন, "রিকশা, রিকশা। সামনের পর্দাটা ফেলে দাও।"

রোদ নেই, বৃষ্টি নেই—পর্দা ফেলার অনুরোধ। রামপ্রসাদ বেশ অবাক হয়ে গেল। তার গলার স্বরে রীতিমতো সন্দেহ, মুখটা দেখাতে পাচ্ছেন না

নবগোপাল, তাই ওখানকার অবস্থা জানা গেল না।

"বাবুজী, আপনি তো একেলা আদমী!"

"আরে বাবা, একেলা আদমীদের কি পর্দা ফেলতে মানা?" বিরক্ত হলেন নবগোপাল।

নবগোপাল আন্দাজ করছেন, রিকশাওয়ালা ভাবছে সায়েব এবার কাউকে রিকশায় তুলবেন। অচেনা কাউকে তুললেই ভয় হয় রিকশাওয়ালার। আজকাল হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে চায় না কেউ। সময় কোথায়?

অবশেষে পর্দা ফেলে দিয়েছে রামপ্রসাদ। এক অনুভূতির সাগরে ডুব দিচ্ছেন নবগোপাল।

সেই প্রথম এই ব্যাটা জনার্দন রিকশাওয়ালার সঙ্গে ভাব হল। খুব ভয় পাচ্ছিল সুখলতা। কিন্তু নবগোপাল ভরসা দিলেন, কোনো ভয় নেই, কোনো চিন্তা নেই। সকলের নজর এড়িয়ে চুপি-চুপি কিছু কথা বলতে গেলে কলকাতার একমাত্র ভরসা হল রিকশা।

জনার্দন অভিজ্ঞ লোক। যখন নবগোপাল আধ ঘণ্টার জন্যে রিকশা ভাড়া করতে চাইল তখনই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। বলেছে, "হোটেলে ঘর ভাড়া করতে হলে কত টাকা লাগত স্যর! তার ওপর খাতায় নাম লেখাও, সই করো, বাড়ির ঠিকানা দাও, হাজার হাঙ্গামা। রিকশায় কোনো হাঙ্গামা নেই, কোনো ভয় নেই।"

নবগোপাল, তোমার মনে পড়ছে তোমার পাশের ঐ এক ফুট খালি জায়গাতে যেদিন সুখলতা লজ্জায় আরক্তিম মুখ নিয়ে উঠেছিল?

রিকশাওয়ালা এইসব ক্ষেত্রে বেশি নড়াচড়া হলে বিব্রত হয়, গাড়ি সামলাতে তার কষ্ট হয়। কিন্তু জনার্দন নিশ্চয় সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল। কোনো আওয়াজ নেই, সাড়া নেই—যেন দু'খানা পুতুল তার গাড়িতে উঠেছে।

নবগোপাল জিজ্ঞেস করেছিলেন, "অস্বস্তি হলে পর্দা তুলে দিই।"

"থাক" শেষ পর্যন্ত সুখলতা মুখ খুলেছিল।

"কোন দিকে যাব হুজুর?" জনার্দন জিজ্ঞেস করেছিল।

"যেদিকে তোমার চোখ যায়।" নবগোপাল রসিকতা করেছিলেন। কিন্তু সুখলতার ইচ্ছে ছিল চৌরঙ্গী পেরিয়ে মেয়ো রোড ধরে নদীর ধারে

কোথায়ও চলে যাক এই রিকশা।

বেচারা সুখলতা তখনও জানত না, চৌরঙ্গী পেরিয়ে গড়ের মাঠে ঢোকবার হুকুম নেই রিকশার। জনার্দন বলেছিল, "আপনাদের খুব ভালো ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, হুজুর।"

বিশ্বের মধ্যে একমাত্র এই কলকাতা শহরেই বোধহয় মানুষ এইভাবে নিজেদের জন্যে প্রাইভেসি সৃষ্টি করতে পারে।

রামপ্রসাদ রিকশাওয়ালা গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়েছে। সায়েব ভিতরে কী করছেন কে জানে, তার চিন্তা বাড়ছে। সে শুনতে পাচ্ছে, সায়েব ভিতরে যেন কার সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলে চলেছেন।

"সুখলতা, এই সিটটা তোমার জন্যেই খালি রয়েছে। তুমি এসো। সেদিন তোমাকে এইভাবে প্রথম পেয়ে তোমার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেবার দুর্দান্ত লোভ হয়েছিল। কিন্তু, সুখলতা, তুমি বলো আমি কোনোভাবেই নিজেকে তোমার চোখে ছোট হতে দিইনি।"

"তারপর কত কথা হল। যে কথাটা বলবার জন্যে আমি ছটফট করছিলাম, তুমি শেষ পর্যন্ত তাও শুনলে। তারপর তুমি বললে, ভেবে দেখি।"

"আধ ঘণ্টার বদলে চল্লিশ মিনিট পরে আমরা ট্রাম লাইনের ধারে রিকশা থেকে নামলাম। তখনকার দিনে দুটো টাকা পেয়ে বেজায় খুশি জনার্দন।"

ব্যাটা জনার্দনের যে কান সজাগ সেদিনই বোঝা উচিত ছিল নবগোপালের। টাকা পেয়ে সে লম্বা সেলাম ঠুকেছিল। বলেছিল, "আবার কবে আপনাদের তুলে নেব দিদিমণি? যেখানে বলবেন সেখানে চলে যাব, ঘড়ি মিলিয়ে টাইম দেখে নেবেন। মনে রাখবেন, আমার নাম জনার্দন। জনার্দনের রিকশায় চড়ে কেউ কখনও হাঙ্গামায় পড়েনি। দুষ্টু রিকশার পাল্লায় পড়লে আপনাদের খালি বাড়িতে যেতে বলত। জনার্দন লোক চেনে স্যর। আপনাদের কখনও হোটেলে যেতে বলবে না।"

খুব লজ্জা পেয়েছিল সুখলতা। কিন্তু জনার্দনের চাপে পড়েই পরের সপ্তাহের দিনটা ঠিক হয়ে গেল। চলমান রিকশায় প্রেম--বোধহয় ভালোবাসার ওয়ার্লড রেকর্ড, ভেবেছিলেন নবগোপাল। কিন্তু তারপর জনার্দনের কাছে শুনলেন, "না হুজুর, কলকাতার কত লোক এইভাবে

রিকশার পর্দা নামিয়ে দুনিয়াকে আলাদা করে দিচ্ছে।"

তারপর জনার্দন যা বলেছিল তাতে সুখলতা খুব হেসেছিল। লাজুক সুখলতা তার আগেই নবগোপালকে জিজ্ঞেস করতে বলেছিল এবং নবগোপাল প্রশ্ন করেছিলেন, "আমরা তোমার কোনো অসুবিধে করছি না তো?"

জনার্দন বলেছিল মোটেই না। "শুধু আপনারা ঝগড়া করবেন না। আজকাল সায়েব-মেমসায়েব তো মনের সুখে ঝগড়াঝাটি করবার জন্যেও রিকশা ভাড়া করেন। তখন সত্যিই মুশকিল হয়ে যায়।" একবার এক সায়েব তো রেগেমেগে জনার্দনকে বলেছিল, রিকশা থামাও—আমি নেবে যাব। মেমসায়েব তখন হুমকি দিচ্ছেন—খবরদার থামবে না। মিনসের পিণ্ডি চটকে তবে আমি রিকশা থেকে নামতে দেব।

জনার্দনের কথা শুনে সুখলতার সে কী হাসি! জনার্দন তখন তার খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। বিয়ের পর যেন ঐ ভালোবাসা বাড়ল। ওই ডেভিড লেন, যেখানে ওরা বাসা নিল, তারই কাছাকাছি অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত জনার্দন। এই ইঙ্গবঙ্গ অঞ্চল রিকশার স্বর্গরাজ্য। স্কুটার ও মোটরকে ডোন্টকেয়ার করে রিকশাই এখানে রাজ-রাজেশ্বরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। জনার্দনকে দেখলেই সুখলতা নরম হয়ে পড়ত। ওর ওই পর্দাফেলা রিকশায় দু'জনের নির্জন বিহার সে কিছুতেই ভুলতে পারত না।

রামপ্রসাদের রিকশায় পর্দা ফেলা অবস্থায় কতক্ষণ ঘুরেছেন খেয়াল করতে পারছেন না নবগোপাল নিজেই। বাবুজী এখন কথা বলছেন না কেন?

রামপ্রসাদ একটা ল্যাম্প পোস্টের কাছে রিকশা থামাল। তারপর পর্দাটা সামান্য তুলে দেখল, সায়েব চোখ বন্ধ করে বসে আছেন।

"কী হল বাপধন? আমি মরিনি। স্রেফ চোখ বন্ধ করে বসেছিলাম।" নড়েচড়ে উঠলেন নবগোপাল।

রিকশাওয়ালা তখন গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে। "অনেক ঘুরে-ঘুরে হাঁপিয়ে উঠেছ। বলবে তো বাপধন! চা ডাকো, চা খাওয়া যাক।"

রামপ্রসাদ তখন সত্যিকথা বলল, "আপনি লক্ষ্য করেননি। পিছনে কেউ লেগেছে বাবুজী।"

"সে আবার কী জিনিস? এ-পাড়ার সেই ফেমাস দালাল?" বিরক্তি প্রকাশ করলেন নবগোপাল।

"না হুজুর, আজকাল পর্দাটানা রিকশা দেখলেই পুলিশের ইনফর্মার চনমন করে ওঠে। অনেক বড়-বড় ডাকু আজকাল এইভাবে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালায়। সঙ্গে মেয়েমানুষ থাকলে কিছু বলে না কিন্তু মেয়েমানুষ ছাড়া পর্দা পড়লেই পিছনে ফেউ লাগবে। তাই দাঁড়িয়ে পড়ে পর্দা তুলে দিলাম।"

"দেখুক ব্যাটারা!" হাসতে লাগলেন নবগোপাল। "ওদের কাজ তো ওদেরই করতে হবে।" তারপর কী ভেবে নবগোপাল বললেন, "পুলিশের লোকটা দূরে-দূরে থাকবে কেন। ওকেও ডেকে চা খাওয়াও।"

ওর নির্দেশে রিকশাওয়ালা একটি ছেলেকে ডাকল এবং লাজুক মুখে সে চা খেতে স্বীকার হল।

"সন্দেহ হলে আমাকে দেখে নাও বাবা," বললেন নবগোপাল। "কলকাতার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো সম্পর্ক থাকবেও না। স্রেফ একজনের ওপর একটু ভালোভাবে রাগ করবার জন্যে তার চিঠি পকেটে নিয়ে বাইশ বছর পরে কলকাতায় চলে এসেছি।"

"বিয়ে হয়েছে ভায়া?" জানতে চাইলেন নবগোপাল। লজ্জায় লাল হয়ে ছেলেটি জানাল এখনও বিয়ে হয়নি।

"বিয়ে হলে খুব সাবধানে থেকো। বিয়ের মতো ডেনজেরাস জিনিস নেই! বাইশ বছর আগে সমস্ত পাট চুকিয়ে দিয়ে এখনও আমি জ্বলে পুড়ে মরছি।"

চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে পুলিশের ইনফর্মার হাসছে। নবগোপাল বললেন, "এই রিকশা আমরা আমেরিকায় রপ্তানি করে বড়লোক হয়ে যাব। এর নাম হবে 'লাভ হুইল'—পর্দা ফেলে দিয়ে প্রেম করবার এমন ওয়ান্ডারফুল যন্ত্র পৃথিবীতে আর কোথাও পাবে না।

পুলিশের ইনফর্মারের চা খাওয়া শেষ। জোর করে তাকে একটা মিষ্টি পান খাওয়ালেন নবগোপাল। "খেয়ে নাও ভাই। কতক্ষণ আজ তোমাকে ছিপ ফেলে বসে থাকতে হবে ঠিক নেই!"

ছেলেটি বলল, "ঠিক ধরেছেন। দু'জন ব্যাঙ্ক ডাকাতের খোঁজে আমরা

তিরিশ জায়গায় পাহারা দিয়ে বসে আছি। কার ভাগ্যে কখন শিকে ছিঁড়বে কে জানে?"

রিকশায় আবার উঠে বসেছেন নবগোপাল। পুলিশ ইনফর্মারের শেষ কথাটা তাঁকে নাড়া দিচ্ছে।

কার ভাগ্যে কখন শিকে ছেঁড়ে কে জানে! শিকে তো তাঁরও ছিঁড়েছিল, না-হলে সুখলতার মতো সর্বগুণান্বিতা মেয়ে সামান্য এক নবগোপালকে কেন বিয়ে করল?

রামপ্রসাদ একবার কী ভেবে রিকশার পর্দা নামাবার চেষ্টা করতে গেল। এবার ভীষণ বকুনি খেল সে।

"ইয়ারকি পেয়েছ? এখন আবার পর্দা নামাচ্ছ! পর্দা তো সারাজীবনে মাত্র তিনদিন নামিয়েছিলাম আমরা।"

নবগোপালের কথার অর্থ বুঝতে পারছে না রিকশাওয়ালা। নবগোপালের মনে পড়ে যাচ্ছে, বিয়ের পর একবার রিকশার পর্দা ফেলতে গিয়ে ভীষণ বকুনি খেয়েছিলেন সুখলতার কাছে। এবং সেই বকুনি শুনে ফিক করে হেসেছিল জনার্দন রিকশাওয়ালা।

ওর রিকশা চড়েই প্রতিদিন সকালে বাজার করতে বেরুত সুখলতা। নিজের হাতে পছন্দ করে সবজি এবং মাছ কিনত সুখলতা। চিকেন আসত মাসের প্রথম দিনে। সুখলতা জাত ঘরণী—প্রাচুর্যের সংসার নয়, কিন্তু অভাবের প্রবেশ সেখানে নিষেধ। সুখলতার সংসারে অনটনের ছায়া নেই। সুখলতার গৃহিণীপনায় অবাক হয়ে যেতেন নবগোপাল।

বাজার থেকে ফিরে তড়িৎ গতিতে রান্না সেরে ফেলত সুখলতা। তারপর স্নান সেরে এক সঙ্গে খেতে বসত দু'জনে। নবগোপাল রসিকতা করতেন, "আমেরিকা হয়ে গেল দেশটা।"

"আমেরিকা আমাদের সঙ্গে পারবে না, দেখে নিও", হেসে উত্তর দিত সুখলতা, "ওরা ঝাল সহ্য করতে পারে না। যে জাত যত ঝাল খেতে পারে তাদের জীবনীশক্তি তত বেশি!"

খাওয়ার পরে দু'খানা প্লেট ধুয়ে ফেলতে সুখলতার কয়েক মিনিট লাগত। সুখলতার ঐ একটা স্বপ্ন ছিল। কিছু টাকা পেলে সে একটা বাসনমাজার কল কিনবে।

"সায়েবরা তো বাসন মাজার ভয়েই তেল মশলা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে", নবগোপাল বলতেন, "ওয়াশিং মেশিন যতই দামি হোক, ওতে হলুদ এবং তেল পুরো কাটে না।"

"ঠিক কাটবে! যন্তরটা একবার পড়ুক ফরিদাবাদের পাঞ্জাবিদের হাতে", বলত সুখলতা। "জেনে রাখবে, এ-দেশ থেকে ভালো কাজ করবার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো দেশে নেই।" সুখলতার খুব উচ্চধারণা ছিল এ-দেশের মানুষ সম্বন্ধে।

সুখলতা অবশ্য বিয়ের পর ক্রমশ বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়ে পড়েছিল। ইস্কুলের চাকরি এবং ঘরসংসার ছাড়া সে কিছুই ভাবতে পারত না। ঐ ডেভিড লেন সম্পর্কে সুখলতার একটু মনোকষ্ট ছিল। সে বলত, "আর একটু মাইনে বাড়ুক তোমার। তারপর আমাকে গেরস্থ বাঙালি পাড়ায় নিয়ে যেও। এই জায়গাটায় আমার মন পোষায় না।"

আটটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে ডেভিড লেনের বাড়ির দরজায় জনার্দনের রিকশার ঠুনঠুন আওয়াজ শোনা যেত। খরচ বাঁচানোর জন্যে ওরা দু'জনেই একই রিকশায় বেরিয়ে পড়ত। যদিও সুখলতার ইস্কুল শুরু হত সাড়ে ন'টায়। জনার্দনের রিকশা কোনো নির্দেশের অপেক্ষা করত না, সোজা ছুটে চলত নবগোপালের ফ্রি স্কুল স্ট্রিট অফিসের দিকে। নবগোপাল টুক করে নেমে পড়তেন অফিসের একটু আগে—আর রিপন স্ট্রিট ধরে সুখলতা এগিয়ে যেত তার ইস্কুলের দিকে।

সুখলতা বলত, "এর নাম এক যাত্রার দুই ফল!"

নবগোপাল বলতেন, "তোমার আমার বিয়ের আগে রিকশাগুলো সাইজে বড় ছিল, দু'জনে বসেও মধ্যিখানে অনেকটা জায়গা থেকে যেত। এখন রিকশাগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে।"

"ছোট হচ্ছে না, তোমার বউ মোটা হচ্ছে!" সুখলতা উত্তর দিত। "কিন্তু যতই মোটা হই, তুমি পর্দা ফেলতে পারবে না।"

তারপর সুখলতা একদিন হঠাৎ বলল, "রিকশা চড়া চলবে না। কয়েকটা মাস আমাকে সাবধানে থাকতে হবে, বুঝেছ মশাই।"

এর মানে অবশ্যই বুঝেছেন নবগোপাল। এই আনন্দের মুহূর্তের জন্যেই তো তিনি অপেক্ষা করছিলেন।

সুখলতা ইস্কুল ছেড়ে দিল। বাড়িতে সে চুপচাপ বসে থাকত। ওই ব্যাটা জনার্দন নিজেই বাজার করে আনত। সপ্তাহে দু'দিন।

টুং টুং। সমানে ঘন্টা বাজিয়ে কলকাতার ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছে রামপ্রসাদ। এই পাগলা সায়েব কখন যে তাকে ছাড়বে তা বুঝে উঠতে পারছে না সে। মদ খেয়ে মত্ত অবস্থায় মাস্তানরা অনেক সময় এই রকম করে, রিকশাওয়ালাকে কিছুতেই ছাড়াতে চায় না। কিন্তু এ-সায়েব তো মাতাল নয়। সকাল থেকে কতবার যে রামপ্রসাদকে চা ও জলখাবার খাওয়ালেন তার ঠিক নেই।

কিন্তু ছাড়া পাওয়ার তো দরকার। এইভাবে একই প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে কোনো বিপদে পড়ে না যায় রামপ্রসাদ। তার বাবা বলতেন, "কখনও একজন সওয়ারির ওপর বেশি নির্ভর করবে না। সওয়ারি হচ্ছে নদীর জলের মতো। যে যখন আসবে তাকেই তুলে নেবে, কখনও পিছনে তাকিয়ে দেখবে না।"

"বাবা রামপ্রসাদ, কী হল তোমার বাছা? রিকশার স্পিড যেন কমে যাচ্ছে? আজ আমি যে সমস্ত কলকাতা শহরটা চষে ফেলব ঠিক করেছি— তুমি আমাকে ডুবিও না, ব্রাদার।"

"রিকশা কখনও কাউকে ডোবায় না, হুজুর। কলকাতা শহর যখন ডুবে যায়, তখন আমরাই তো একমাত্র এই শহরকে বাঁচিয়ে রাখি। গত মাসে জলের মধ্যে রিকশা টানতে গিয়েই তো আমার পায়ে কাঁচ ফুটল।"

কাঁচের কথায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন নবগোপাল, রামপ্রসাদের পদযুগল দেখার চেষ্টা করছেন তিনি। সুখলতা থাকলে খুব রেগে যেত। বিয়ের ঠিক পরেই স্বামীকে সে বলেছিল, "জনার্দন বিয়েতে কিছু পায়নি। ওকে একজোড়া জুতো কিনে দাও।"

রিকশাওয়ালার জুতো—বেশিদিন টেকে না। কিন্তু প্রতি ছ'মাস অন্তর নবগোপালকে যেতে হত বাটার দোকানে, সুখলতার নির্দেশে জনার্দনের কোদাল-পায়ের রবার সু কিনতে।

"দাঁড়া বাবা। একটু দাঁড়া।" একটা জুতোর দোকান দেখে থামবার নির্দেশ দিলেন নবগোপাল। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "পায়ের নম্বর কত?"

নম্বর কাকে বলে জানে না রামপ্রসাদ। খুব বিরক্ত হলেন নবগোপাল। "ব্যাটা, নিজের নম্বরটাও নিজে জানো না!"

তারপরে দোকানে ঢুকে জুতো কিনলেন ওর জন্যে। আবার রিকশায় উঠতে-উঠতে নবগোপাল বললেন, "সেনটেনারি ইয়ার। এই তো উৎসবের শুরু। এ-বছর কত লোকে তোদের জুতো উপহার দেবে দেখিস—জুতোর একটা দোকান হয়ে যাবে তোর বাড়িতে। কিন্তু লক্ষ্মীসোনা আমার, আমার জুতোটাই ইউজ করিস। আমার ওয়াইফ যদি কোনোরকমে দেখতে পায় খুব খুশি হবে।"

জুতোটা পেয়ে রিকশাওয়ালা রামপ্রসাদের মেজাজ যে খুব খুশি হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারছেন নবগোপাল। ওর স্পিড যেন ডবল হয়ে উঠেছে। ওই হতভাগা জনার্দনেরও তাই হত। উপহার পেলে আনন্দে ডগমগ হয়ে জিজ্ঞেস করত "এখন কোথায় যাবেন?"

নবগোপাল এবার বুঝতে পারছেন, দুনিয়ার সব রিকশাওয়ালাই এক। খেতে পেলে, জুতো পেলে সবাই খুশি হয়ে পাসিঞ্জারকে কী করে খুশি করবে বুঝে উঠতে পারে না। জনার্দন তখন জানত কেন মেমসায়েব তার গাড়িতে ওঠেন না। কিন্তু মাঝে-মাঝে খোঁজখবর করত। তার ডেরাটা দেখিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, "যখন খুশি দরকার হবে খবর দেবেন।"

রামপ্রসাদ গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজছে। "হুজুর, এবার কোথায় যাবেন?"

এখন কোনো দ্বিধা নেই নবগোপালের মনে। সোজা বললেন, "মাটিয়া কলেজ।"

গাড়ি ছুটেছে মাটিয়া কলেজের দিকে। এই এক মজার ব্যাপার। অনেক বছর আগেও মেডিক্যাল কলেজ বললে কোনো রিকশাই চিনতে পারত না, অথচ মাটিয়া কলেজ চেনে না এমন রিকশাওয়ালা হয় না।

গাড়ি ছুটেছে। আর নবগোপালের মনে পড়ছে, একদিন গভীর রাতে এই রিকশারই শরণাপন্ন হতে হয়েছিল তাঁকে। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। পথ অন্ধকার ও জনহীন। সুখলতা ঘামছে নবাগতের জন্ম যন্ত্রণায়, তিনি ওর হাতটা ধরে আছেন, আর ঠুনঠুন করে আওয়াজ করতে-করতে মাটিয়া

কলেজের দিকে ছুটে চলেছে জনার্দন।

এখন মধ্যদিনও নয়। যখন কলকাতায় এসেছেন তখন নবগোপাল একবার মাটিয়া কলেজটা একটু দেখে যাবেনই।

সেই মধ্যরাতে সুখলতাকে ইডেন হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে, লাল বাড়িটার সামনে সারারাত জনার্দনের রিকশাতেই বসেছিলেন নবগোপাল। কত রিকশা যে ওখানে সমস্ত রাত ধরে আসে এবং যায়। রিকশা এবং ইডেনের মধ্যে কোথাও যেন নাড়ির টান সৃষ্টি হয়েছে। একই লগ্নে উভয়ের জন্ম বোধহয়। কোথায় যেন নবগোপাল পড়লেন, ইডেনও একশো বছরে পা দিল। অন্তত একশো বছর বয়স না হলে কলকাতা শহরে কোনো জিনিস জাতে ওঠে না।

রামপ্রসাদ রিকশাওয়ালা দেখল, সায়েব হাসপাতালের ভিতর ঢুকলেন না। রিকশার ওপর চুপচাপ বসে থেকে হাঁ করে তিনি বাড়িটা দেখছেন। এত বছরে একটুও পাল্টায়নি!

নবগোপাল ভাবছেন, ঠিক এই সময়ই তিনি জনার্দনকে নিয়ে আবার হাসপাতালে এসেছিলেন, সুখলতা ও সুমেধাকে বাড়ি নিয়ে যেতে। জনার্দন বলেছিল, সাহেব এবার কিন্তু কাপড় কিনে দিতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। মেমসায়েবের কানে গেলে কাপড়ের সঙ্গে জামা এবং গেঞ্জিও হয়ে যেত!

নবগোপাল দেখলেন, নবজাতকদের কোলে নিয়ে মায়েরা একের পর এক রিকশা চড়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ ধরে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে এই দৃশ্য দেখলেন। খুব ভালো লাগল। একবার ইচ্ছে হল, এদের কাউকে বিনামূল্যে কিছুক্ষণের জন্যে নিজের রিকশাটা ছেড়ে দেন। বলেন, "ঘুরে আসুন। আপনি যেখানে যাবেন, আমার এই রিকশা আপনাকে সেখানে পৌঁছে দেবে।"

কিন্তু সাহস পেলেন না নবগোপাল। অচেনা নিঃসঙ্গ পুরুষমানুষকে কলকাতা শহর এখনও বিশ্বাস করে না। সুখলতা সঙ্গে থাকলে নবগোপাল এখানে যা খুশি করতে পারতেন।

ইডেনে সকালে এই ডিসচার্জের সময় হাসিমুখের মেলা। মাটিয়া কলেজের এই একমাত্র বিভাগ যেখানে যত লোক ভর্তি হয় তার থেকে

অনেক বেশি ডিসচার্জ হয়। হাসি তো হবেই।

কিন্তু নবগোপাল জানেন, এই মাটিয়া কলেজের ভিতরেই আর একটা ছোট্ট বাড়ি আছে—কালো ক্রশ মার্কা হার্স গাড়িখানা তার সামনেই চুপিচুপি এসে থামে। জীবনের সঙ্গে যেখানকার কোনো সম্পর্ক নেই সেখানকার পরিবেশ প্রাণহীন তো হবেই। না, ওখানকার কথা ভাবতে চান না নবগোপাল। ভাবনা-চিন্তার অনেক কাজ আছে কলকাতায়।

নবগোপালের রিকশা আবার সচল হয়ে উঠেছে। যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানেই ফিরে চলেছেন তিনি। নবগোপালের মনে পড়ল, সুমেধা নামটা সুখলতা নিজেই ঠিক করেছিল। বাংলায় ওর বেশ দখল ছিল। নবগোপালের নিজস্ব বাংলা—সে আর বলে কাজ নেই!

সুখলতা বলেছিল, "মেয়েকে আমি ভালো করে বাংলা গান শেখাব।"

নবগোপাল বলেছিলেন, "তোমার মেয়ে, তুমি যা ইচ্ছে তাই শেখাবে।"

সুখের সংসার বলতে যা বোঝায়, তখন সবই সেরকম ছিল, নবগোপালের মনে পড়ল। কয়েকটা বছর যেন স্বপ্নের মতো কেটে গেল, কিন্তু তারপর...তারপর কখন যে শনি ঢুকল নবগোপাল নিজেই খেয়াল রাখতে পারেননি।

ওয়েলিংটনের মোড়ে এসে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গিয়ে টুক করে জানবাজারের গোয়ালটুলিতে ঢুকে পড়েছে রামপ্রসাদ রিকশাওয়ালা।

এবার কোথায় যাব? রিকশাওয়ালা জানতে চাইছে।

উত্তর দিতে পারছেন না নবগোপাল। কিছুই যখন মনে আসছে না তখন যাওয়া যাক একবার ওই জনার্দনের রিকশাপট্টিতে।

রিকশাপট্টিতে জনার্দনের অনেক খোঁজখবর করলেন নবগোপাল। কিন্তু কোথায় জনার্দন? সে তো কবে কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছে!

"ছেলে? ছেলেকে রিকশার লাইনে দেয়নি?" জানতে চান নবগোপাল।

"কোনো রিকশাওয়ালা তার ছেলেকে এ-লাইনে দিতে চায় না, হুজুর।" ওখানকার রিকশাওয়ালা বলল নবগোপালকে। জনার্দনের ছেলে এখন বোকারোতে কাজ করছে।

ব্যাটা জনার্দন। অনেক আশা করে নবগোপাল এখানে এসেছিলেন। আজ ৮ই সেপ্টেম্বর অন্তত একবার ওর সঙ্গে দেখা হবে আশা করেছিলেন

নবগোপাল।

"হুজুর আপনি খেলেন না কিছু দুপুরে?" বহুক্ষণ ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত রামপ্রসাদ এবার জিজ্ঞেস করল।

"না রে ব্যাটা। আজ আমার খাবার রুচি নেই। আমার বউয়ের তাজা চিঠি আমার পকেটে রয়েছে।"

"বুঝেছি, বুঝেছি। দাঁড়া।" রিকশা থামালেন নবগোপাল। "আমার খুব ভুল হয়ে গিয়েছে। আমার খিদে পাচ্ছে না বলে ভাবছি দুনিয়ার কারও খিদে পাচ্ছে না! আমি রিকশা পাহারা দিচ্ছি। এই নে টাকা, যত খুশি খেয়ে আয়।"

রিকশাওয়ালা একটু লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু নবগোপাল ওকে জোর করে রেস্তোরাঁয় পাঠালেন। "ভালো করে খাবি কিন্তু।"

খাওয়া শেষ করে রিকশাওয়ালা রামপ্রসাদ আবার ফিরে এসেছে। নবগোপাল আবার গাড়িতে উঠে বসলেন।

নবগোপাল এখন ভাবছেন তাঁর সংসারের কথা। সুখলতা চাকরি ছেড়ে দিয়েছে মেয়ের জন্যে। মেয়ে একটু বড় হয়ে তিন বছর বয়সে ছোট্ট কী এক স্কুলে যাচ্ছে। যাতায়াতের কোনো ভাবনা নেই। জনার্দন রিকশাওয়ালা তো হাতের গোড়াতেই আছে। সেই সময় শরীর খারাপ করল সুখলতার। তার শরীরটা একটু শুকিয়ে আসছে। আর শনি ঢুকল নবগোপালের মনে। না-হলে হঠাৎ ডেভিডের সঙ্গে আলাপ হবে কেন?

ডেভিডের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপিসেই। কিছু অর্ডারের ব্যাপারেই সে নবগোপালের কাছে আসত। ডেভিডের বান্ধবী ভায়োলেট। দু'জনেই বেশ আমুদে। ডেভিড বলেছিল, "একদিন আসুন। কোথাও গিয়ে একটু হইচই করা যাক।"

'হইচই' কখনও করেন না নবগোপাল। কিন্তু যখন দুঃসময় আসে!

সেদিন আপিস শেষ হবার একটু পরেই ডেভিড পাকড়াও করল নবগোপালকে। একটা রিকশায় চড়ে দু'জনে চললেন ডেভিডের প্রিয় জায়গা খালাসীটোলায়। খালাসীটোলাটা কখনও দেখা হয়নি নবগোপালের। ওখানে অনেকক্ষণ গল্প করে, ডেভিড বলল, "কাম অন। ভায়োলেটের বাড়িটা দেখে যাও। এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়।"

না, ভায়োলেটের বাড়িতে ঢুকবেন না নবগোপাল। টোটি লেনে

ভায়োলেটের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিলেন ডেভিডকে, তারপর বাড়ি ফিরে এলেন।

সামান্য ব্যাপার। কিন্তু দু'দিন পর সুখলতা হঠাৎ তাঁর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। "তুমি সন্ধেবেলায় মদের আড্ডায় গিয়েছিলে? তারপর খারাপ পাড়ার একটা নোংরা বাড়িতে?"

"কী বলছে সুখলতা?" যতই বোঝাচ্ছেন নবগোপাল, তিনি গিয়েছেন খালাসীটোলায়, কিন্তু কিছু খাননি, ততই ধৈর্য হারাচ্ছে সুখলতা। নবগোপালের রাগও তত বাড়তে শুরু করেছে।

এসব খবর সুখলতা পেল কোথায়? ভেবে পাচ্ছিলেন না নবগোপাল।

"তুমি একদম কোথাও যাবে না। সোজা অফিস থেকে বাড়ি চলে আসবে।" সাবধান করে দিয়েছিল সুখলতা। ওর রাগটাও ক্রমশ বেড়েছে।

নবগোপালের নিজের রাগটাও তখন বেড়ে চলেছে। সুখলতা কি তাঁর পিছনে স্পাই লাগিয়েছে?

নবগোপাল সেনশর্মা অনেক ভাবতে-ভাবতে রাগের মাথায় ৭ই সেপ্টেম্বর আবার ডেভিডের খবর করলেন। অফিসের সাপ্লায়ার ডেভিডকে সঙ্গে নিয়েই সন্ধের পর তিনি খালাসীটোলায় মদের দোকানে হাজির হলেন। দিশি মদের এই কটু গন্ধ সহ্য করতে কষ্ট হয় নবগোপালের, তবু অনেকক্ষণ ডেভিডের পাশে বসে সঙ্গসুখ উপভোগ করলেন, রইলেন। তারপর ডেভিডকে রিকশায় চড়িয়ে নবগোপাল টৌটি লেনে এলেন। ভায়োলেটের ফ্ল্যাটে ঢুকে ওকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। এও এক ধরনের বিদ্রোহ বলা যায়। সুখলতা যত জোর করবে তত বেপরোয়া হয়ে উঠবেন নবগোপাল।

পরের দিন সকালে সুখলতা বাজার করতে বেরুল। বেরিয়েছিল হাসি মুখে, ফিরল নিতান্ত গম্ভীর গোমড়া মুখে। কিন্তু মুখ দেখে তখনও কিছু বুঝে উঠতে পারেননি নবগোপাল।

অনেকদিন পরে স্বামীকে সুখলতা বলল, "চলো, আজ তোমায় অফিস পৌঁছে দিয়ে আসি।"

জনার্দনের রিকশায় তিনজন চড়েছে—সুখলতা, সুমেধা ও নবগোপাল। সুখলতা বলল, "তোমাকে নামিয়ে দিয়ে, সুমেধাকে স্কুলে পৌঁছব। তারপর আমাকে আর একবার বাজারে যেতে হবে।"

অফিস যাবার পথে বিশেষ কথাই হল না। শুধু সুখলতা একবার মনে করিয়ে দিল, "কাল বাড়ি ফিরতে তোমার দেরি হয়েছিল।"

"দেরি হয়ে যায় সুখলতা। অফিসে কতরকম কাজ থাকে।"

"আজও দেরি হবে নাকি?" বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছিল সুখলতা। আর বোকার মতোই নবগোপাল উত্তর দিয়েছিলেন, "বলা যায় না! দেরি হলেও হতে পারে।"

সুখলতা তো বললেই পারত, "আজ তুমি দেরি কোরো না।" কিন্তু সে ওদিকেই গেল না।

ডেভিড লেনের দিকে ছুটতে-ছুটতে রামপ্রসাদ রিকশাওয়ালা শুনল তার বাবুজী আপন মনে বিড়বিড় করছে, "সুখলতা, তুমি বললেই পারতে, আজ দেরি কোরো না। তা হলেই তো সব গোলমাল মিটে যেত।"

"বাবুজী, কিছু বলবেন?" রামপ্রসাদ বোকার মতো জিজ্ঞেস করল।

"বাপধন, আর যাই করো, নিজের জেনানার সঙ্গে সবসময় খোলাখুলি কথা বলবে, কখনও কিছু চেপে রাখবে না, ভুলেও রাগ দেখাবে না।"

"বাবুজী, রাগ করব কখন? জেনানা তো সীতাকুণ্ডে থাকে।"

"বহুত আচ্ছা, রামপ্রসাদ। ওই ভালো। স্বামীর কাছে থাকলেই জেনানাদের রাগ বেড়ে যায়।"

রাস্তার ভিড় কাটিয়ে রিকশা এবার বেশ জোরে ছুটছে। ঘড়ির দিকে তাকালেন নবগোপাল। এখন দুটো বেজে গিয়েছে। ঠিক এই সময়েই রিকশা চড়ে অফিস থেকে পাগলের মতো ছুটতে-ছুটতে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন নবগোপাল।

সে কতদিন আগেকার কথা! টিফিনের পর আফিসে বসে কাজ করছিলেন নবগোপাল। ফাইল খুলে রেখেই মাঝে-মাঝে ভাবছিলেন, গত সন্ধ্যার খালাসীটোলা ও টোটি লেন ভ্রমণের ঠিক খবরটা সুখলতার কানে পৌঁছবে কিনা। সুখলতার বিষ খাওয়ার খবরটা ঠিক সেই সময়েই অফিসে হাজির হয়েছিল।

পাগলের মতো ডেভিড লেনের বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলেন নবগোপাল। কিন্তু তখন সব শেষ। দরজা ভেঙে পাশের ঘরের মিস্টার অ্যান্ড মিসেস দাস ভিতরে ঢুকে পড়েছেন। সুখলতার মাথার কাছে ফলিডলের একটা

খালি টিন পড়ে রয়েছে। ইচ্ছে করেই বীভৎস যন্ত্রণাময় মৃত্যুর পথ পছন্দ করে নিয়েছে সুখলতা। আত্মহননের আগে নীল খামে নীল কাগজে দু'খানা চিঠি লিখে গিয়েছে সুখলতা।

রিকশাওয়ালা জনার্দন ঠিক সেই সময়েই ইস্কুল থেকে সুমেধাকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। মেমসায়েব তাকে বলে দিয়েছিলেন, "আজ সুমেধাকে চারদিক ঘুরিয়ে একটু দেরি করে বাড়িতে এনো। তিনটার আগে বাড়িতে এসো না, আমাকে পাবে না।"

তিনটের সময়ে ফিরে জনার্দন দেখছে মেমসায়েব এই পৃথিবীতে নেই। ওই টিনটা—ফলিডলের ওই টিন দেখেই চমকে উঠেছিল জনার্দন। সায়েবকে অফিসে এবং মেয়েকে ইস্কুলে নামিয়ে দিয়ে মেমসায়েব আবার মার্কেট গিয়েছিলেন—ওই টিনটা হাতে করেই তো বাড়ি ফিরলেন!

"শালা! তুই কেন ওকে মার্কেটে নিয়ে গেলি।" পাগলের মতো জনার্দনকে এক থাপ্পড় মেরেছিলেন শোকান্ধ নবগোপাল।

৩ নম্বর ডেভিড লেনের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে রামপ্রসাদের রিকশা।

"ঘুরিয়ে নাও, ঘুরিয়ে নাও। ওখানে আমি যেতে চাই না," কাতর আর্তনাদ করে উঠলেন নবগোপাল। "আমার ভুল হয়ে গিয়েছে ভাই। ওখানে আমি যেতে চাই না।" বাইশ বছর পরেও ও-বাড়িতে ঢুকবার শক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না নবগোপাল।

রিকশার মোড় ঘুরিয়ে উল্টোদিকে চলতে আরম্ভ করেছে রামপ্রসাদ। ডেভিড লেনের বাড়িটা যত দূরে সরে যাচ্ছে তত স্বস্তি অনুভব করছেন বাহান্ন বছরের নবগোপাল সেনশর্মা।

বুকে হাত দিলেন নবগোপাল। বাইশ বছর আগের ৮ই সেপ্টেম্বর ওইখানে চিতাগ্নির মতো জ্বলছে এখনও। নীল খামে সুখলতার চিঠিটা ওই বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয়েছিল।

পকেট থেকে বের করে বহু বছরের পুরনো চিঠির আর একবার পড়লেন নবগোপাল। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় জোরে রিকশা চললে চিঠি পড়া যায় না। তবু নবগোপাল বহুবছরের পুরনো চিঠির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন।

সুখলতা স্বামীকে লিখেছে, "আমার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। আমি চললাম। তুমি কিন্তু সুমেধাকে দেখবে। ওর বিয়ে না-হওয়া পর্যন্ত তোমার দায়িত্ব শেষ হবে না ইতি—"

কলকাতা ছেড়ে বরোদায় চলে যাবার আগে অনেক কষ্টে এই চিঠিটা পুলিশের কাছ থেকে উদ্ধার করেছিলেন নবগোপাল।

চিঠিটা এবং সুখলতা দু'জনের কথাই এখন ভাবছেন নবগোপাল।

সুখলতার ওপর অভিমানটা এবার বাড়ছে। "সুখলতা, তুমি আমার ওপর সুবিচার করোনি। মিথ্যে একটা সন্দেহ করে তুমি আমাকে মস্ত শাস্তি দিয়েছ, সুখলতা।"

"সুখলতা, আমি কিন্তু তোমার দেওয়া দায়িত্ব পালন করছি। সুমেধার বিয়ে হওয়া পর্যন্ত আমি পাথরের মতন স্তব্ধ থেকেছি।"

"আজ আমিও ভয়ংকর প্রতিশোধ নেব, তোমার ওপরে, সুখলতা।"

"রিকশা রিকশা, তুমি আমাকে সোজা খালাসীটোলায় নিয়ে চলো।"

ঠুনঠুন ঘণ্টা বাজিয়ে রামপ্রসাদের রিকশা ছুটে চলল খালাসীটোলার দিকে।

শুঁড়িখানার সামনে সায়েবের অপেক্ষায় রামপ্রসাদ রিকশাওয়ালা অনেকক্ষণ বসেছিল।

বহুক্ষণ পরে সম্পূর্ণ মত্ত অবস্থায় সেনশর্মা সায়েব বেরোলেন। রামপ্রসাদকে বললেন, "রিকশাওয়ালা জাতটার ওপরেই আমার ঘেন্না হয়ে গিয়েছে। লাইফের প্রথম মদ খেতে খেতেই বুঝলাম ওই শালা জনার্দন রিকশাওয়ালাই আমার বউকে রিপোর্ট দিয়েছিল। টোটি লেনের সামনে সেদিন সন্ধ্যায় জনার্দন আমাকে দেখেছিল। ব্যাটা জনার্দনের রিকশা আমি নিইনি। ওই ব্যাটাই বাড়ি ফিরে এসে আমার বউকে খবরটা দিয়েছিল নিশ্চয়। রামপ্রসাদ, ওই ব্যাটা জনার্দনকে ধরে নিয়ে আয়, ওকে আমি মারব।"

"হুজুর, জনার্দন তো নেই, জনার্দন অনেক বছর আগে কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছে।"

"খুব বেঁচে গেল শালা", মত্ত অবস্থায় বললেন নবগোপাল।

এবার কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন নবগোপাল। তারপর পকেট থেকে

তিনখানা একশো টাকার নোট বের করে রামপ্রসাদ রিকশাওয়ালার হাতে দিয়ে বললেন, "তোকেও শালা, তিন জুতো মারব। তোকে আমি এত ভালোবাসলাম, বউয়ের কথা শোনবার মতলব দিলাম, অথচ তুই আমাকে বাধা দিলি না, এই খালাসীটোলার শুঁড়িখানায় আসতে দিলি!"

আবার কী যেন ভাবলেন নবগোপাল। রিকশায় চড়ে ওবেরয় গ্র্যান্ড হোটেলে ফিরে যাবার পথে তিনি বললেন, "না, তোকে আমি মারব না, রামপ্রসাদ। তুই আরও দুশো টাকা নে। তোর কী দোষ? ব্যাটা জনার্দন রিকশাওয়ালা সেবার আমার হাতের থাপ্পড় খেয়ে বলেছিল, "আমি বারণ করবার কে হুজুর। যে যেখানে যেতে চায় তাকে বিনা প্রশ্নে সেখানে পৌঁছে দেওয়াই তো রিকশাওয়ালার কাজ।"

কলকাতার রাজপথে সন্ধ্যা নেমেছে। মত্ত রিকশার মত্ত প্যাসেঞ্জার নবগোপাল সেনশর্মা বললেন, "রিকশাওয়ালাদের কোনো দায়দায়িত্ব নেই—যে মন্দিরে পৌঁছতে চায় তাকে মন্দিরে, যে শুঁড়িখানায় পৌঁছতে চায় তাকে শুঁড়িখানায়, যে টোটি লেনে পৌঁছতে চায় তাকে টোটি লেনে পৌঁছে দেবার জন্যেই তো কলকাতার রিকশাওয়ালার জন্ম।"

আজব স্টেথো

অবশেষে অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। যা বহুযুগ ধরে মানুষ অনুসন্ধান করছে, যার জন্যে জাপান, জার্মানি, আমেরিকা যে-কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত তা আয়ত্তে এসেছে একজন মানুষের—শ্রীশিবনাথ সমাদ্দার।

শিবনাথের এই আবিষ্কার সমস্ত মানবসমাজে আলোড়ন তুলবার সম্ভাবনা রাখে। শিবনাথের হাতে হয়েছে সেই আশ্চর্য স্টেথো যার সাহায্যে পঁচিশ বছরের শিবনাথ সমাদ্দার মানুষের মনের কথা শুনতে পায়।

আমার বন্ধু মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার সুধাকর চ্যাটার্জি বললেন, "ব্যাপারটা এমনই জটিল এবং অবিশ্বাস্য যে কীভাবে শিবনাথের ব্যাপারটা লিখবেন তা আপনাকে ঠিক করতে হবে।"

সুধাকর চ্যাটার্জি পরামর্শ দিলেন, "ঘটনাগুলো আপনি রূপকথার স্টাইলে সাজিয়ে যান, আফটার অল শিবনাথ নামের লোক শুধু এই ইন্ডিয়াতেই থাকতে হবে এমন কোনো মাথার দিব্যি নেই। লর্ড শিভা তো শুধু বাঙালি বা ইন্ডিয়ানদের ওপরেই রাজত্ব করছেন না—মহাবিশ্বের সমস্ত সৃষ্টিকে প্রবলপয়োধিতে ফেলে লস্যি বানাবার দায়িত্ব তাঁর ওপর রয়েছে।"

ডাক্তার সুধাকর চ্যাটার্জির কাছ থেকে শুনে এর আগে দুটো গল্প আমি লিখেছি। সুধাকর বললেন, "আমি ডাক্তার নই। আমি অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজির এম এসসি। আমি মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারি পাশ নই, আজকাল যাদের সাইকিয়াট্রিস্ট বা মনোরোগ চিকিৎসক বলে আমি তাও নই। তবে সাইকিয়াট্রিস্টরা যা ওষুধ দিয়ে, ইঞ্জেকশন দিয়ে, ইলেকট্রিক শক দিয়ে, মস্তিষ্কে অপারেশন করে সারাতে চান তা আমরা চেষ্টা করি সারাতে মানসিক প্রক্রিয়ায়। মানসিক হাসপাতালেও আমাদের ডাক পড়ে ভাই। স্রেফ কেমিক্যালের জোরে মানসিক রোগ সব সময় বাগে আনা যায় না ; কেবল গুচ্ছের ওষুধ খাইয়ে মানুষকে আধাঘুমন্ত জাগ্রত অবস্থায় রেখে তাকে ভেজিটেবল বানানো যায়।"

সুধাকরবাবুর প্রচণ্ড প্র্যাকটিস নয়, কিন্তু মোটামুটি চলে যায়। তাঁর চেম্বারে রোগীকে আরাম কেদারায় শুইয়ে, লাল আলো জ্বালিয়ে সম্মোহিত করে মনোবীক্ষণ চলে। কত যে অদ্ভুত মানুষের আনাগোনা আমাদের এই সংসারে, কত যে তাদের দুঃখ এবং যন্ত্রণা!

আজকাল আবার সুখে থাকতে মানুষকে ভূতে কিলোয়। সুস্থ মানুষ আগে অসৎসংসর্গে বিড়ি সিগারেট গাঁজা আফিম মদের খপ্পরে পড়ত। এখন ড্রাগ-এর যুগ। ড্রাগ বলতে আমাদের প্রজন্মের সবাই ওষুধ বুঝত। মাত্র ক'টা বছরের ব্যবধানে 'ড্রাগ' তার আদি জাত খুইয়ে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করল ; আমাদের সময়কার ড্রাগের এখন নতুন নাম মেডিসিন। বাংলায় ওষুধ কথাটা সৌভাগ্যক্রমে তার স্বধর্ম হারায়নি। একালের ড্রাগের দৌরাত্ম্য বোঝানো যায় না। কারণ ওর মধ্যে মদ শব্দটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ড্রাগের ওপর প্রবন্ধ লিখতে বসিনি এখন। যা বলতে চাইছি, ড্রাগের প্রকোপে ডাক্তার সুধাকর চ্যাটার্জির রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। ড্রাগের নেশা চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র মার্কিন দেশের বেটিফোর্ড সেন্টার—সেখানে যেমন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার আছেন, তেমন মনোবিজ্ঞানীও আছেন। ড্রাগ জিনিসটা দেহ ও মন দু'টিকেই একই সঙ্গে আক্রমণ করে এবং মানুষকে কাবু করে ফেলে। তার সঙ্গে লড়তে গেলে পুনরাক্রমণ চালানো প্রয়োজন রসায়ন ও মনোবিজ্ঞানের দুই রণাঙ্গন থেকে।

শরীরকে বিভিন্ন কেমিক্যালসের ডাস্টবিন করে তোলার পক্ষপাতী নন ডাক্তার সুধাকর চ্যাটার্জি। তাঁর ধারণা নিজেকে নিজেই সারিয়ে তোলার অবিশ্বাস্য শক্তি ঈশ্বর মানুষের মনের মধ্যেই রেখেছেন। আমরা এখনও এই নিরাময় শক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার শিখিনি। এ-বিষয়ে আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে বহুদিন ধরে।

সেদিন হঠাৎ ডাক্তার সুধাকর চ্যাটার্জি ফোন করলেন। আচমকা শান্তিভঙ্গ করার জন্যে মার্জনা চাইলেন, তারপর বললেন, "আমি মশাই বাংলায় ভীষণ উইক। যে-লোক অপরের মনের কথা বুঝতে পারে তাকে এক কথায় কী বলে?" 'অন্তর্যামী' শব্দটা সুধাকর চ্যাটার্জির মনে আসছে।

হাতের গোড়ায় অভিধান ছিল। খুলে বললাম, "যিনি মনের ভিতর

অবস্থান করেন এবং মনের সকল কথা জানেন তাঁকে অন্তর্যামী বলা চলে।"

সুধাকর সন্তুষ্ট হলেন না। "ওই তো বিপদ বাধালেন। যিনি মনের কথা জানতে পারেন অথচ মনের ভিতরে অবস্থান করেন না তাঁকে কী বলা হবে?"

"এই রকম সিচুয়েশন তো সেযুগে হয়নি, তাই অভিধানে সেরকম শব্দের ব্যবস্থা নেই, ডাক্তার চ্যাটার্জি।"

ওঁকে আবার অপেক্ষা করতে বললাম। অভিধানটা আর-একটু ঘাঁটা যাক। "একটা শব্দ পাওয়া গিয়েছে, ডাক্তার সায়েব। অন্তর্ভেদী—মনের গুপ্তভাব জানতে পারে বা চেষ্টা করে এমন কেউ।"

সুধাকর চ্যাটার্জি ফোনে বললেন, "কিন্তু ধরুন যদি ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়ার ব্যাপার না থাকে? স্রেফ বুকে একটা যন্তর বসিয়ে যদি কেউ মনের কথা শুনতে পায়?"

সুধাকর বললেন, "আপাতত অন্তর্যামী কথাটাই 'ইয়ুজ' করি। পরে দেখা যাবে। এতোদিন এই বিরল সম্মান একমাত্র ঈশ্বরই পেয়েছেন, একমাত্র তিনিই মানুষের মনের কথা অটোম্যোটিক্যালি জানতে পেরেছেন, তাই অন্তর্যামীর অপর অর্থ ঈশ্বর। কিন্তু আমাদের শিবনাথ তো ঈশ্বর নয়।"

সুধাকর চ্যাটার্জি মনের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে তুললেন। ফলে একদিন হাজির হওয়া গেল ওঁর চেম্বারে।

সুধাকরের কাছে একটি রোগী ছিল। এই রোগীটির ধারণা, উত্তমকুমারের আত্মা তার ওপর ভর করেছে, অতএব সে নিজেই উত্তমকুমার। ফলে সারাক্ষণ ভুগতে হচ্ছে আপনজনদের।

সুধাকর চ্যাটার্জি তাকে বলছেন, "আপনি উত্তমকুমার এটা মেনে নিচ্ছি। নিশ্চয়ই আপনি বুঝছেন আপনি উত্তমকুমার, না-হলে আপনি ওই দাবি করে ঝুটঝামেলা বাড়াবেন কেন? এখন কথা হলো, উত্তমকুমারের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যে-কোনো ভূমিকায় অভিনয় করতে পারতেন এবং যে-কোনো চরিত্রকে রূপ দিতে পারতেন। সেক্ষেত্রে আজ উত্তমকুমার আপনি রতন সামন্তর ভূমিকায় অভিনয় করে যান এক সপ্তাহের জন্যে। সবাই দেখুক, তখন বিশ্বাস হয়ে যাবে আপনি রতন সামন্ত নন, আপনি উত্তমকুমার।"

রোগীকে আরামকেদারায় আধশোয়া অবস্থায় রেখে সুধাকর বললেন, "উত্তমবাবু, এখন আপনি রতন। আপনি ডাকুন, কোথায় আছো রতন? এসো এখানে।"

আধশোয়া রোগী বলল, "প্রায়ই মাথা চুলকোতো।"

"বেশ তো, ভালো কথা। আপনিও অ্যাজ অরিজিন্যাল রতন সামন্ত মাথা চুলকোন।"

রোগীটি সহজ নয়। সে এবার উত্তমকুমারের নায়িকাদের সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছে। তারা না থাকলে, উত্তমকুমার হওয়াটাই বৃথা!

সুধাকর চ্যাটার্জি বললেন, "যখন যেরকম ভূমিকা সেরকম কাজকর্মের জন্যেই তো উত্তমকুমার বিখ্যাত। রতন সামন্তর জীবন তো স্ত্রী ভূমিকাবর্জিত, তিনি তো এখনও ইয়ং, অবিবাহিত ইয়ংম্যান।"

ছেলেটা চটে উঠছে, "নায়িকা না থাকলে কোন দুঃখে সে উত্তমকুমার হতে যাবে?"

সুধাকর চ্যাটার্জি বলছেন, "সে বললে চলবে না। সামান্য রতন সামন্তর ভূমিকায় উত্তম অভিনয় করতে পারছেন না তা কেউ বিশ্বাস করবে না। আপনি উত্তমকুমার হয়ে উত্তমকুমারকে এভাবে ডোবাতে পারেন না। চেষ্টা চালিয়ে যান, তবে অ্যাজ রিয়েল উত্তমকুমার ফিরে আসুন সামনের শনিবার।"

এইভাবে সেশন শেষ হলো। রোগী বিদায় নিল, সুধাকর চ্যাটার্জি ঘরের উজ্জ্বল আলোটা জ্বেলে দিলেন, সহকারিণী রুমা সাহাকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বললেন।

বেসিনে হাত ধুতে-ধুতে ডাঃ সুধাকর চ্যাটার্জি বললেন, "মনের ইচ্ছে চেপে রাখার চেষ্টা থেকেই মানুষের যত মানসিক অসুখ। যে যা হতে চায় তাকে তাই করবার স্বাধীনতা দিলে প্রায়ই উল্টো ফল হয়, সে আর এগোতে চায় না। কারণ চাপের সংসারে থাকতে-থাকতে তার প্রত্যাশা ছিল আপনজনরা তাকে চেপে রাখতে চাইবে, ফলে সে তাদের সঙ্গে লড়াই করে মজা পাবে।"

চা খেতে-খেতে অন্তর্যামীর কথা ফিরে এলো। ডাক্তার সুধাকর চ্যাটার্জি বললেন, "স্ট্রেঞ্জ কেস মশাই, পৃথিবীতে বিরাট কিছু ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিবনাথ সমাদ্দারের গোপন ব্যাপারটা আপনি ফলো করতে আরম্ভ করুন। যদি শেষ পর্যন্ত সত্যিই তেমন কিছু একটা ঘটে যায় তাহলে আপনি খোলাখুলি এ বিষয়ে লিখতে পারবেন, পৃথিবীর লোকদের বিশ্বাসও করাতে পারবেন।"

"ব্যাপারটা কী?"

সুধাকর গলা নামিয়ে বললেন, "এর সম্ভাবনা যে কত সুদূরপ্রসারী তা ভাবলে মাথা ঘুরে যায়, মশাই। একটা লোক যে বলে দিতে পারছে অন্য একটা মানুষের মনের ভিতরের কথা। যেমন ধরুন আমার নিজেরই কথা। আমি রোগীকে বললাম, তুমি এখান থেকে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত আমার চিন্তা থেকে যাবে। রোগী ঘচাং করে আমাকে পরীক্ষা করল। তারপর বলল, তুমি আমার কথা চিন্তাই করছ না। তুমি ভাবছ, আরও দুটো নতুন রোগী আজ আসবে তো?"

সুধাকর আমাকে ক্রমশই অবাক করে দিচ্ছেন। কী অদ্ভুত শক্তি মানুষের আয়ত্তে এসে যাচ্ছে। এক্স-রে আবিষ্কার করে মানুষ তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় পৌঁছতে পারেনি ভিতরে।

আমি বললাম, "কিছুটা পেরেছে গত শতাব্দীতে। একজন ফরাসি ডাক্তার ফুসফুস রোগের বিশেষজ্ঞ স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার করলেন যা গলায় না ঝোলালে ডাক্তার হওয়ারই কোনো মানে হয় না। এই ফরাসি ডাক্তারকে দেখতে ছুটে এসেছিলেন বিস্মিত আমেরিকান ডাক্তাররা। তাঁদের একজনের লেখা চমৎকার বর্ণনা কিছুদিন আগে কোথায় পড়েছি। স্টেথো শব্দটা গ্রিক, মানে বুক।"

সুধাকর খুব আগ্রহী হয়ে উঠলেন। "দেবেন আমাকে ঐ লেখাটার কপি? নিজে পড়ব, শিবনাথ সমাদ্দারকে পড়াব।"

আমার যতটুকু মনে ছিল বললাম। জগদ্বিখ্যাত ফরাসি ডাক্তার তাঁর দলবল নিয়ে হাসপাতালের রাউন্ডে বেরিয়েছেন। বুকের আওয়াজ শোনার পথ তিনি আবার আবিষ্কার করেছেন, যার ফলে চিকিৎসায় বিপ্লব এসেছে। এই যন্ত্র তিনি আবার আবিষ্কার করেছেন প্যারিসের চত্বরে ছেলেদের

বাঁশের চোঙা নিয়ে খেলতে দেখে। আসলে পথটা ছেলেরাই আবিষ্কার করেছে যাদের নাম আমরা জানি না, আর ব্যাপারটা সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন ফরাসি ডাক্তার। হাসপাতালের ওয়ার্ডে এক-এক রোগীর সামনে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন ফরাসি ডাক্তার। সেই সময়কার এক মজার বর্ণনা আছে। তরুণ ডাক্তাররা স্টেথো যন্ত্র দিয়ে রোগীর বুক পরীক্ষা করেছে। কিন্তু তাদের সকলের লক্ষ্য এক সুন্দরী বালিকার দিকে। সব ছাত্রই একবার তার বুকে স্টেথো বসাবার সুযোগ গ্রহণ করছে, আর সুন্দরীটি একটু লজ্জা পাচ্ছে।

ডাক্তার সুধাকর চট্টোপাধ্যায় আবার অনুরোধ করলেন, "স্টেথোসকোপ সম্বন্ধে যেখানে যত খবর আছে সংগ্রহ করে রাখুন। আপনার খুব কাজে লেগে যাবে।"

সুধাকর চ্যাটার্জি এবার শিবনাথ সমাদ্দারের ওপর আলোকপাত করলেন। "এই লাইনে মশাই এতোদিন আছি, এমন জটিল কেস কখনো আমি দেখিনি। ওর বাবার বিশেষ অনুরোধে আমি ওকে সেন্ট্রাল অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে দেখে এলাম। একেবারে সুস্থ সবল তরতাজা মানুষ। কোথাও কোনো গোলমাল খুঁজে পেলাম না। সত্যি কথা বলতে কী, যারা হাসপাতালের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই শহরে তাদের মধ্যেই মানসিক অসুস্থতা বেশি। সেকথা বললাম ওই ছোকরা শিবনাথ সমাদ্দারকে। কিন্তু কী অদ্ভুত সিচুয়েশন—ছোকরা ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে মোটেই রাজি নয়। অথচ আপনি তো জানেন, মানসিক হাসপাতালে সবচেয়ে যা কষ্ট দেয় তা হলো রোগীরা কাতর অনুরোধ করে—আমাকে এখানে রাখবেন না, আমাকে বাইরে যেতে দিন।"

সুধাকর আমাকে কিছু খবরাখবর দিলেন। "ব্যাপারটা না বাড়িয়ে, মূল খবরগুলো জেনে রাখুন। পার্টির নাম : শিবনাথ সমাদ্দার। পুরুষ। বয়স : পঁচিশ। বাবার নাম : সত্যশরণ সমাদ্দার। উচ্চতা : ১৬৮ সেমি। রঙ : শ্যামবর্ণ। স্বাস্থ্য : রোগাটে। ওজন : আটান্ন কেজি। চোখের রঙ : কালো। মুখের আকার : ঘোড়া।"

শেষ আইটেমটা বুঝতে পারছিলাম না। সুধাকর হেসে বললেন, "ওটা টেকনিক্যাল কোড, আমারই আবিষ্কার। মানুষকে দু'রকম ভাগ করেছি :

ঘোড়া অ্যান্ড চিম্প বা শিমপাঞ্জি। যাদের মুখ লম্বাটে তারা ঘোড়া, আর যাদের মুখ আপনার মতন গোল তারা চিম্প।"

আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছি। সুধাকর কিন্তু ছাড়লেন না। "আপনি গোল মুখ ঘোড়া একটাও দেখেছেন? লম্বাটে মুখ ছাড়া ঘোড়া হয় না, একটু শার্প ফিচার। তাই ঘোড়ামার্কাদের ছবি তোলা খুব সহজ—ফটোতে ওদের ভালো দেখায়। শিমপাঞ্জি মুখ আপনি দু'রকম দেখবেন—উইথ গর্দান, উইদাউট গর্দান। যাদের গর্দান থাকে না, যেমন সত্যশরণ সমাদ্দারের, এরা গায়েগতরে একটু সমৃদ্ধ হলেই ডবল-চিন হয়ে যায়। যাদের থুতনি ডবল তাদের ছবি তোলা দায়, ফটোগ্রাফারদের জিজ্ঞেস করে দেখবেন। এদের ক্লোজআপ নেওয়ার উপায় নেই, সব সময় দূর থেকে শট নিতে হয়।"

"আপনি কি ফটোগ্রাফিরও চর্চা করছেন?"

হাসলেন সুধাকর। "আমি করছি না। আমার এক রোগী আছে সে একসময় ফটোগ্রাফার ছিল। বড়লোকদের সামাজিক উৎসবের ছবি তুলত। একবার এক বিয়েতে তার তিনটে রোলই গোলমাল হয়ে গেল, ছবি উঠল না। পার্টির কাছে লোকটা এমন গালাগালি খেল যে পাগল হয়ে গেল। বড়লোক তাকে উকিলের চিঠি দিয়ে ভয় দেখিয়েছিল মামলা করবে ক্ষতিপূরণের। অথচ দোষটা ওর নয় ছবির ফিল্মগুলোই খারাপ ছিল। ওর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আমি ফটো সম্বন্ধে প্রায় এক্সপার্ট হয়ে গিয়েছি। এই রোগী মশাই, মেয়েদের মুখ দেখে ফলের কথা মনে করে। সব মেয়েরই মুখ নাকি কোনো না কোনো ফলের মতন। কেউ আম, কেউ বেদানা, কেউ আপেল, কেউ দার্জিলিং কমলালেবু, কেউ সরবতিয়া, কেউ পেঁপে। একজন মোটা মহিলাকে দেখে ওর তরমুজ বলে মনে হয়েছিল। ওইখান থেকেই তো আইডিয়া নিলাম—পুরুষমানুষদের দু'ভাগে ভাগ করে ফেললাম। ডারউইনের পর কেউ এই দুঃসাহস দেখাতে সাহস পাননি।"

শিবনাথের বর্ণনা আবার শুরু করলেন সুধাকর চ্যাটার্জি। "শিবনাথের চোখটা দেখলেই বোঝা যায় একটু উদাসী, একটু অন্তর্মুখী। সংসার-বিবাগীদের চোখ অনেকসময় ঐরকম হয়—ফোকাস বাইরের দিকে থাকে না, মনে হয় টর্চ জ্বেলেছেন, কিন্তু আলো বাইরে না এসে টর্চের ভিতরের

দিকে চলে যাচ্ছে। মানুষটা আপনার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যেন পিছন ফিরে তাকিয়ে আছে।" সুধাকরবাবুর পরবর্তী ব্যাখ্যা : "চোখ হচ্ছে ক্যামেরার লেন্‌সের মতন। লেন্‌স দিয়েই ক্যামেরার বিচার।"

সুধাকর চ্যাটার্জি বললেন, "শিবনাথ সমাদ্দার সম্বন্ধে ওর বাবার ধারণা, এক সময়ে সে ড্রাগের খপ্পরে পড়েছিল। সব সময় একটু নেতিয়ে থাকা, ভাবের ঘোরে থাকা। আজকাল অসৎ সংসর্গে পড়াটা তো আশ্চর্য কিছু নয়। ওই সময় ওর বাবা এক আধবার আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন। অনেক জেরা করেও তেমন কিছু বের করতে পারলাম না। বন্ধুবান্ধবদের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলল না। এই হয় মশাই। সমস্ত দুনিয়ায় দেখবেন, এক নেশাখোরের আনুগত্য অন্য এক নেশাখোরের দিকে। নিতান্ত বাধ্য না হলে আরেকজনকে ডোবাবে না। এক গেলাসের ইয়ার বলে একটা কথা খুব চালু ছিল, এখন বিদেশে এক সিরিঞ্জের ইয়ার! একটু-একটু করে ইঞ্জেকশন ভাগ করে নিচ্ছে তূরীয় আনন্দ পাবার জন্যে।"

শিবনাথ সমাদ্দার যে জেনেশুনে খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশেছে তা বিশ্বাস করছেন না সুধাকর চ্যাটার্জি। তার শরীর যে খারাপ হয়েছে তা ঠিক, পড়াশোনাতেও বিপর্যয় এসেছে। যে-ছেলে স্কুল ফাইনাল তরতর করে পাশ করে বেরিয়ে এসেছে সে-ছেলেই উচ্চমাধ্যমিকে ব্রেক কষেছে। ওখানে বছর নষ্ট হয়েছে অযথা। তারপর বি-এ। মিস্টার সমাদ্দারের ইচ্ছে, ছেলেকে গ্র্যাজুয়েট হতেই হবে, না-হলে সমাজে মুখ দেখাবেন কী করে?

সুধাকর চ্যাটার্জি অবশ্য সত্যশরণ সমাদ্দারকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, "ছেলের ডিগ্রি নিয়ে অযথা উদ্বিগ্ন হবেন না। মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী কারুর বি-এ ডিগ্রি ছিল না।"

কিন্তু সত্যশরণ সমাদ্দারের দুঃখ শেষ হতে চায় না। "আমাদের পারিবারিক ইতিহাসটা দেখুন। আমার প্রপিতামহ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট। আমার পিতামহ মেডিক্যাল কলেজের এম-বি। আমার বাবা বি. এস-সি। আমি নিজে বি-এ, বি. কম। আমার বড় ছেলে বি-টেক ফ্রম আই আই টি। আর আমার ছোটো ছেলেটার নামের পাশে দুটো অক্ষর থাকবে না?"

সুধাকর বুঝিয়েছিলেন, "রবিঠাকুর, রামকৃষ্ণদেব, রামপ্রসাদ এঁরা

বিশ্ববিদালয়ের ছাপ ছাড়াই জীবন চালিয়েছেন।" সত্যশরণবাবুর দুঃখ তবু কমেনি।

এর ওপর যদি নেশাভাঙের কথা ওঠে তা হলে কেমন লাগে বাবা মায়ের? সুধাকর বললেন, "মশাই, এই ছেলেটার একদিন বাড়ি এসে ভীষণ অবস্থা। রামকেষ্ট দেবের মতন ঘন-ঘন সমাধি, ঘন-ঘন আনন্দলোকে উত্তরণ। সবাই ধরে নিল ড্রাগের মাত্রা আচমকা বাড়িয়েছে এই শিবনাথ সমাদ্দার। নিন্দুকরা বলল, রাখো শিবের নামে ছেলের নাম। নেশাভাঙের রাজার নামে নাম রাখবে, আর ছেলে ড্রাগের দিকে একটু নড়বে না তা তো হয় না।"

সুধাকর বুঝিয়েছিলেন, "আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে নিজের কষ্ট বাড়াবেন না, সত্যশরণবাবু। এই তো আমার বন্ধু শংকরবাবু, থাকেনও শিবপুরে, কিন্তু যদ্দূর জানি নেশা নেই। ধরুন কবিরাজ শিবকালি ভট্টাচার্য—শুধু শিব নয় সেই সঙ্গে স্বয়ং মা কালী—কিন্তু বোতল, পুরিয়া, গুলি, কোনোদিকে টান নেই। তাছাড়া আমাদের মনে রাখতে হবে—গাঁজাফাঁজার সঙ্গে শিবের সম্পর্ক থাকলেও, ড্রাগের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি বিড়ি সিগ্রেটের সঙ্গে। পুজোর সময় কত প্যান্ডাল তো ঘুরেছেন, দেখেছেন কোথাও শিবের ঠোঁটে বিড়ি, সিগ্রেট, চুরুট এটসেটরা?"

সুধাকরবাবু এবার দুঃখ করলেন, "বাবাকে যখন এই সব বোঝাচ্ছি তখন একটা বকাটে ছোঁড়া সেখানে বসেছিল। সে ফোড়ন কাটল, সিগ্রেট ধরাবে কী করে? জানেন না, ফায়ার ব্রিগেডের অর্ডারে, প্যান্ডালে নো স্মোকিং—ধূমপান নিষেধ? এই সব ছোঁড়ার সঙ্গে কে এঁড়ে তক্কো করবে যে ধূপ ধুনো ছাড়া পুজো হয় না, এবং এসবও একধরনের স্মোকিং। জার্মানিতে তুমি জ্বালাও না ধূপ—যদি-না হাজতবাস করায় তো আমার নামে কুকুর রেখো।"

শেষ পর্যন্ত সুধাকরবাবুর যা মনে হলো, শিবনাথ সমাদ্দার জেনেশুনে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ড্রাগফ্রাগ ধরেনি। আজকাল অজান্তেও ড্রাগের শিকার হওয়া যায়। কোথাও কলেজের সামনে মুখরোচক হজমিগুলি কিনে খেত মাঝে-মাঝে। আজকাল কী নামে কী জিনিস যে বিক্রি হচ্ছে ঠিক

নেই। একদিকে রয়েছে ভেজিটেবল স্টেক বা হ্যামবার্গার যার মধ্যে গোরুর মাংসও নেই শুয়োরের মাংসও নেই, নির্ভেজাল নিরামিষ। আবার অন্যদিকে রয়েছে বিড়ি, সিগ্রেট, হজমি এটসেটরা যা আসলে ড্রাগ।

সেবারে যে সিরিয়াস আক্রমণ হলো, তার পিছনে রয়েছে, ঠান্ডা কোলা। বিশেষ এক দোকানে গিয়ে শিবনাথ ওই ঠান্ডা কিনেছে। ওখানে একনম্বর, দু'নম্বর সবরকম জিনিসই থাকে। মালিক কিছুক্ষণের জন্যে টয়লেট গিয়েছিল, সেইসময় অন্য একটা ছেলে দোকানে বসেছিল। সেইসময় শিবনাথ হাজির। ছোঁড়াটা না-বুঝে দু'নম্বরি জিনিস খুলে দিয়েছে। তারপরেই হাঙ্গামা। ডাক্তার বদ্যি হাসপাতাল।

আজকাল হাসপাতালের ত্রিসীমানায় যেতে নেই। রোগের চিকিৎসা কী হবে তা ভগবান জানেন, ডাক্তারের খপ্পর থেকে সোজা ট্রান্সফার হয়ে যাবেন পুলিশের খপ্পরে। প্রতিটি স্পেশাল কেসের রিপোর্ট থানায় চলে যাবে। তারপর আপনি রোগী সামলাবেন, না পুলিশ সামলাবেন। পুলিশ সামলাতে গিয়ে আপনাকে উকিলের খপ্পরে পড়তে হবে। তারপর তেমন অবস্থা হলে পুলিশ ও উকিল আপনাকে নিয়ে পিংপং খেলবে, যতক্ষণ-না আপনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে মেন্টাল হাসপাতালে যাচ্ছেন, অথবা ব্যাক টু হাসপাতাল হচ্ছেন উইথ হার্টের ব্যামো। জানেন মশাই, যে সোসাইটি আমরা তৈরি করেছি সেখানে শ্মশানের ডাক্তার ও ডোম ছাড়া আমাদের সমস্ত যন্ত্রণা থেকে অন্য কেউ রিলিফ দিতে পারবে না। অবশ্য মরার খরচ ইন্ডিয়াতে এখনও খুব কম, এ-ব্যাপারে দুনিয়ার কোনো দেশ আমাদের সঙ্গে কমপিটিশনে লড়ে যেতে পারবে না।

ড্রাগের প্রতি শিবনাথ নিজেই আসক্ত, না ড্রাগ রোগীর লক্ষণ তার অজান্তেই তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে তা বলা কঠিন।

এই সব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেই বা লাভ কী? কেউ-কেউ তো বলবেই, ঠান্ডাপানির এতো দোকান থাকতে বেপাড়ার ওই দোকানেই বা শিবনাথ সমাদ্দারের যাওয়ার প্রয়োজন হলো কেন? ওই দোকানটা শিবনাথ চিনলোই বা কী করে?

যদি ওর পক্ষে বলতে হয়, তা হলে বলতে হয়, একটা-না-একটা কোনো দোকানে যেতেই হবে মানুষকে। তেষ্টা পেলে মানুষ অতশত ভাবে

না, দোকানের ঠিকুজিকুষ্ঠি মিলিয়েও দেখে না। স্রেফ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা বোতলের অর্ডার দেয়।

যারা সন্দেহপ্রবণ, তাদের বক্তব্য : জিনিসটা অত সহজ নয়, দাদা। আজকাল কোন দোকানে কী বিক্রি হয় তা জানতে কারও বাকি থাকে না। যে যেখানে যেতে চায় সে ঠিক সেখানেই পৌঁছে যায়। একটু চাপ দিলে, পুলিশে একটু নাড়াচাড়া করলে ঠিক বেরিয়ে পড়বে ওই দোকানে শিবনাথ সমাদ্দার এই প্রথম যায়নি। আগেও সে গিয়েছে এবং কেউ না কেউ মালিকের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ব্যাংকে এবং দুষ্টচক্রে এটা ভীষণ প্রয়োজনীয় ব্যাপার ; ওখানে কেউ ইনট্রোডাকশন করিয়ে না দিলে দোকানদার নরম হবে না। কখন কোথায় অজানা লোক সেজে কে ব্যবসার বারোটা বাজাবে তার ঠিক নেই।

সুধাকর চ্যাটার্জি বললেন, "ওসব তাত্ত্বিক ব্যাপারে আপনাকে ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই। মোদ্দা কথাটা হলো, ছেলেটা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। আমি শেষ পর্যন্ত শিবনাথের চিকিৎসা করেছি। খুব সিরিয়াস এবং খুব পুরনো রোগ নয়, তাই শিবনাথকে খাড়া করতে সময় লাগেনি। তবে নজর রাখতে বলেছি।"

আরও কিছু খবর পাওয়া গেল। শিবনাথের বাবা সত্যশরণবাবুর দুশ্চিন্তার অবধি নেই, কারণ পুত্র পরীক্ষা বৈতরণী পার হতে পারছে না।

সুধাকর চ্যাটার্জি এই ব্যাপারেও উপদেশ দিয়েছেন, উদ্বিগ্ন হতে বারণ করেছেন। কিন্তু সত্যশরণ জানেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছাপ না-থাকলে এদেশে কোথাও প্রবেশ করা যায় না। "গেরস্ত অবস্থা থেকে একেবারে নিচু স্তরে নেমে যেতে হবে। বাবা দীর্ঘায়ু হলে তা নিজের চোখে দেখে যাবেন।"

সুধাকর বললেন, "সত্যশরণবাবুর আশঙ্কা, শেষপর্যন্ত ওই হাতুড়ে হোমিওপ্যাথ হয়ে ওকে জীবন কাটাতে হবে। ওই একটা ব্যাপারে ছোকরার একবার আগ্রহ হয়েছিল, বাড়িতে পৈতৃকসূত্রে একখানা মহেশ ভট্টাচার্যির বই ও একটা কাঠের মেডিসিন বাক্স আছে।"

এরপরেও সুধাকর চ্যাটার্জির সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। লোকটির মধ্যে সাহিত্য-প্রেম এবং সেই সঙ্গে বিশ্বসংসার সম্বন্ধে ভালোবাসা-

মেশানো কৌতূহল আছে।

সুধাকরের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বললেন, "মানুষ যদি সত্যিই সর্বজ্ঞ হওয়ার পথ বের করতে পারে তা হলে কী ভীষণ ব্যাপার হবে একবার ভেবে দেখুন।"

একটু ভেবে সুধাকর নিজেই বললেন, "স্যরি, সর্বজ্ঞ শব্দটার মানে অনেক ব্যাপক। যে ভূতভবিষ্যৎ সবকিছু জানে সে সর্বজ্ঞ। আমরা শুধু মানুষের মনের কথা আলোচনা করছি। মানুষের বুকের মধ্যে একটা মানুষ সারাক্ষণ কথা বলছে। এর উৎস হয়তো ব্রেন, কিন্তু কথাটা শেষ পর্যন্ত নিস্তব্ধ শব্দে রূপান্তরিত হচ্ছে বুকের মধ্যে।"

নিস্তব্ধ শব্দ কথাটা অভিনব। সুধাকরকে এর জন্যে অভিনন্দন জানালাম। সুধাকর বললেন, "এছাড়া তো এই অভাবনীয় ব্যাপারটার আর কোনো বর্ণনা আমি দিতে পারছি না, যদিও এর মধ্যে কনট্রাডিকশন বা স্ববিরোধ রয়েছে।"

"আজকাল স্ববিরোধ পাবলিকের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। স্ববিরোধের উল্টো যদি সমন্বয় হয় তাহলেও জিনিসটা সমাজ থেকে উঠে যেতে চলেছে। এখন আমাদের কোনো ভাবনাই পরস্পরকে কাছে টেনে ধরে রাখছে না, সব কিছুই দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। অথচ এত বড় সমাজ, এত রকমের মানুষ, একটু চিটচিটে ভাব দরকার, না-হলে মুড়ি থেকে মোয়া হবে কী করে, মিহিদানা কেমন করে লাড্ডু হবে?" সুধাকরবাবু মানুষকে মুড়ির দানা আর সমাজকে মোয়া হিসেবে কল্পনা করছেন। লোকটির চিন্তায় বিশেষত্ব আছে।

সুধাকর চ্যাটার্জির পরবর্তী পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করছি। তিনি বলেছিলেন, "ঘটনাটা রূপকথার স্টাইলে লিখুন। কেন মশাই শুধু নিজের দেশের লোকদের টানাটানি করবেন? এই ধরনের ঘটনা সব দেশেই সব সময়ে ঘটতে পারে। আপনি গোড়াতেই সোজাসুজি জানিয়ে দিন এখানকার চরিত্রদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এই ঘটনায়।" অতএব—

কোনো এক সময়ে কোনো এক দেশে মস্ত এক শহর ছিল। ধরা যাক

সেই শহরের নাম 'মহানগর'।

মহানগরের এক ঘিঞ্জি অঞ্চলে সরু এক গলিতে নায়ক শিবনাথ সমাদ্দারের বসবাস। শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের কায়দায় শিবনাথ সম্পর্কে ২৫/১৬৮/বিএ/৩০০০ বলতে পারলে খুবই সুখের হতো। বিশেষ করে আনন্দ পেতেন সত্যশরণ সমাদ্দার ও তাঁর সহধর্মিণী সুনয়না সমাদ্দার। কিন্তু বয়স ২৫ ও উচ্চতা ১৬৮ সেমি হলেও শিবনাথের পক্ষে ডিগ্রিলাভ অথবা মাসিক তিন হাজার টাকা উপার্জন সম্ভব হয়নি। অথচ সুনয়নার স্বপ্ন ছিল তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ডাক্তার হবে মেডিক্যাল কলেজ থেকে, যেমন ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন তাঁর অপর পুত্র দেবনাথ সমাদ্দার। কিন্তু আজকাল ডাক্তারিতে ভর্তি হওয়া সহজ কথা নয়—বংশে একদা কেউ ডাক্তার ছিলেন বলে বাড়তি কোনো সুবিধাও নেই। যদিও বদ্যির পরিবারে বদ্যি হলে ধারাবাহিকতা রক্ষায় সুবিধে হয়।

সত্যশরণ মুখে বলেন না, কিন্তু তাঁর ভীষণ দুঃখ, যে বংশে সেকালের নামকরা এম. বি ডাক্তার বেরিয়েছে সেখানে একজন হাতুড়ে হোমিও স্থান পাবে। সত্যশরণ সমাদ্দার কেমন করে ভোলেন যে এই বাড়িটি পিতামহের ডাক্তারি পেশার ফলশ্রুতি এবং তাঁর নাম এখনও শ্বেতপাথরে অঙ্কিত হয়ে গেটের কাছে মলিন অবস্থায় শোভা পাচ্ছে।

শিবনাথ এসব ব্যাপারে খেয়াল করে না। বাবার পিতামহের একটা আলমারি এবং সেখানে কিছু ডাক্তারির স্মৃতি এখনও কালের শাসন অমান্য করে শোভা পাচ্ছে। ডাক্তার দুঃখহরণ সমাদ্দারের ছবি এখনও টাঙানো রয়েছে বসবার ঘরে। ছবিতে তাঁর গলায় একটি স্টেথো ডাক্তারের পৈতের মতন শোভা পাচ্ছে। সেযুগে স্টেথো ছাড়া ডাক্তার কল্পনাই করা যেত না, যদিও স্টেথোটার আকৃতিটা ছিল অন্যরকম—স্টেথোসকোপ এখনকার মতন আধুনিক হয়নি, একটা চোঙার মতন ছিল।

এরপরের ঘটনা আকস্মিক। ঠান্ডাপানি খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে শিবনাথকে কয়েকদিন ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে অবস্থান করতে হয়েছে। ডাক্তাররা চিকিৎসার সঙ্গে-সঙ্গে থানার সঙ্গেও যোগাযোগ রেখেছেন। থানার এক ছোট দারোগাবাবু কিছুক্ষণের জন্যে হাসপাতাল বেডের কাছে এসেছিলেন। তাঁর হাজার কাজ। সোজা বললেন, "মিনিস্টার এবং লিডার

সামলাতে-সামলাতে প্রাণ আইঢাই, চোর ডাকাত ধরব কখন মশাই? তার ওপর গোদের ওপর এই বিষফোড়া—ডাক্তারবাবুদের আর কি, একখানা কাগজ বোঝাই করে পাঠিয়ে দিলেন, এখন বুঝুক ঠেলা পুলিশ। পুলিশের তো মা বাবা নেই, ঘর সংসার নেই। খুন হলে মশাই কথা ছিল। কে কোথায় শরবত খেয়ে ঠান্ডাই খেয়ে একটু বেসামাল হলো তার খোঁজখবর রাখতে হবে।"

শিবনাথ বলেছিল, "কষ্ট করে এলেন কেন?" দারোগা বলল, "একবার না এসে উপায় আছে? বলা নেই কওয়া নেই রোগী টেঁসে গেলে আমার ট্রান্সফার অবধারিত। ভালো ইনকাম এই থানায়, কোন দুঃখে পানিশমেন্ট পোস্টিং নিয়ে ধাধ্বাড়া গোবিন্দপুরে চলে যাব? ডাক্তারেরা মশাই আজকাল ডেঞ্জারাস, কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না, সব কেসে লিখে দেয় রোগীর অবস্থা সিরিয়াস। মরল বলে। পুলিশকে একটু শান্তি দেবে না এই হাসপাতালের ছোকরা ডাক্তারগুলো।"

তারপর শিবনাথ ছাড়া পেয়েছে হাসপাতাল থেকে, কিন্তু পুলিশের হাত থেকে সহজে ছাড় নেই, সেখানে কেসটা শিঙি মাছের মতন জিওনো আছে, মর্জিমাফিক ডাক পড়া আশ্চর্য নয়।

শিবনাথ বাড়িতে একটু নিঃসঙ্গ। সবাই এখনও একটু সন্দেহের চোখে দেখছে—ঠান্ডাই বোতলটা আকস্মিক না ইচ্ছাকৃত তা এখনও অনেকের কাছে বোধহয় স্পষ্ট নয়। এক্ষেত্রে ভাইপো ভোঁদুলালই একমাত্র শিবনাথের দিকে। ভোঁদুলাল বলাবাহুল্য একটি ডাক নাম, তার বয়স এখনও পাঁচ হয়নি। ভালো নাম শুভসুন্দর সমাদ্দার। ভোঁদুবাবুর সঙ্গে শিবনাথের একটু স্পেশাল সম্পর্ক—ভোঁদুলাল ঠান্ডাই বোতল রহস্য সম্পর্কে মোটেই চিন্তিত নয়।

শিবনাথ ছোট্ট ঘরে একলা থাকে। ভোঁদুলালের বাবা-মা পাশের বড় ঘরে থাকেন। ভোঁদুলালের সব ভালো, শুধু কাক ডাকার আগে জেগে ওঠার অভ্যাস ছাড়া। অত ভোরে ভোঁদুর মা বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দেয়, আর ভোঁদুলাল হাজির হয় শিবনাথের কাছে।

সে-রাত্রে শিবনাথ সমাদ্দার নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। চোখ

বুজলেই মনে হয়েছে সমস্ত আকাশ বাজির আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কখনও বা চোখের সামনে আগুনের চরকি ঘুরছে। পরমুহূর্তে শিবনাথ ডুবে যাচ্ছে নিবিড় নীলিমায়। তখন বড় শান্তি—সমস্ত শরীরে তখন কে যেন মেনথল ঘসছে—শরীর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত জ্বালানি কোথায় অদৃশ্য হচ্ছে।

ভোঁদুলাল সেদিন ভোরে ঘরে ঢুকেই দেখল অন্যদিনের মতন কাকুকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার প্রয়োজন নেই। কাকু জেগেই রয়েছেন।

ভোঁদুলাল গতকাল বল খেলতে গিয়ে একটা অন্যায় করে ফেলেছে। দাদুর দাদু যে আলমারিটা রেখে গিয়েছিলেন তার একটা কাচ বলের ধাক্কায় ভেঙে ফেলেছে। সেখানে দাদুর-দাদুর একটা গ্রুপ ফটো ছিল—বহু বছর আগে ইডেন হাসপাতালের সামনে তোলা। তখনকার দিকপাল ডাক্তাররা সেখানে চেয়ারে বসে রয়েছেন, দাঁড়িয়ে রয়েছে ছাত্ররা, তার মধ্যে অবশ্যই রয়েছেন দুঃখহরণ সমাদ্দার। এই দুঃখহরণ শুধু রোগীদের কষ্টহরণ করেননি, সংসারে দুঃখহরণ করেছিলেন দু'হাতে রোজগার করে। তার ফলভোগ এখনও করছে এই সমাদ্দার পরিবার।

দুঃখহরণের একটি সন্তান। নাম চিন্তাহরণ। সে বি. এসসি পাশ করে সায়েববাড়িতে চাকরিতে ঢুকেছিল। কম বয়সে সুলক্ষণা বধূর সঙ্গে বিয়েও দিয়েছিলেন।

কিন্তু তারপরেই দুঃখহরণের স্ত্রী কালব্যাধিতে পড়লেন। একবছর চিকিৎসা করেও কালাজ্বর সারাতে পারলেন না দুঃখহরণ। স্ত্রী চলে গেলেন জীবনসাগরের ওপারে।

দুঃখহরণ এরপর একটু অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলেন—মন দিয়ে প্র্যাকটিশ করতেন না। এর বদলে শুরু করলেন তন্ত্রসাধনা। বিখ্যাত নগেন গুরুর শিষ্যত্ব নিয়ে সারাক্ষণই হ্রীং ক্রীং করতেন। পকেটে স্টেথো থাকত, কিন্তু গুরুভাইদের চিকিৎসা ছাড়া তেমন ব্যবহার হতো না।

ঘোর অমাবস্যায় কালীপুজোর রাতে গুরুর গৃহে তন্ত্রসাধনা করতে-করতে দুঃখহরণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। তাঁর স্টেথো সমেত মরদেহ এই বাড়িতে এসেছিল।

শিবনাথ লক্ষ্য করল, ভোঁদুলালের গলায় একটা স্টেথো। সে

ডাক্তারবাবুকে আসতে দেখেছে, কাকুকে তিনি কীভাবে পরীক্ষা করেন তাও দেখেছে সে। এখন সে নিজেই ডাক্তারের ভূমিকায়। স্টেথোটি সে উদ্ধার করেছে দুঃখহরণের আলমারির কাচ ভাঙবার পরে। স্টেথোটি এতোদিনের অবহেলা সহ্য করে এখনও টিকে রয়েছে, যদিও তার বয়স অনেক।

শিবনাথ আরও লক্ষ্য করল, স্টেথোর গায়ে এখনও লাল-লাল দাগ—মনে হয় হোমের সময় তেল সিঁদুর লেগেছিল দুঃখহরণের জীবনের শেষ রাত্রে।

আর সকলে অবহেলা করলেও, কাকুর প্রতি ভোঁদুলালের টান যথেষ্ট। সে শিবনাথের তক্তপোষের ওপর উঠে পড়ে অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো কাকুকে পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর স্টেথো নামিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "তোমার খুব দুঃখু হচ্ছে কাকু?"

শিবনাথের অবাক হবার পালা। এইটুকু ছেলে কীভাবে বুঝল শিবনাথ সমস্ত রাতই দুঃখ পাচ্ছে।

"বাঃ রে, তোমার বুকে কল বসিয়েই তো শুনতে পেলাম।"

কী বলে ছেলেটা।

ভোঁদুলাল আবার বুকে ডাক্তারি নল বসাল এবং একটু পরই বলল, "এখন দিদুর জন্যে দুঃখ হচ্ছে তোমার। তুমি বলছো, দিদু কেন তোমাকে ছেড়ে চলে গেল?"

শিবনাথের বিস্ময় বেড়েই চলেছে। ছেলেটা অন্তর্যামী হয়ে উঠল নাকি? ভোঁদুলাল এবার যন্ত্রটা কাকুর হাতে দিয়ে বলল, "তুমি শুনে দেখো।"

স্টেথোটা নিজের বুকে বসাল শিবনাথ। ভীষণ ডিস্টার্বেন্স। খারাপ রেডিওতে সাগরপারের রেডিও নিউজ যেমন শোনায়। কিন্তু শিবনাথ নিজের মনের কথা শুতে পেল—"মা বেঁচে থাকলে ভালো হতো। মা বেঁচে থাকলে ভালো হতো।"

এবার খেলাচ্ছলে ভোঁদুলালের বুকে স্টেথোটা বসাল শিবনাথ। ঘড়ঘড় শব্দ একটু কম—শিবনাথ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে : "কাকু তুমি ভালো হয়ে ওঠো। কাকু তুমি কষ্ট পেয়ো না। আমরা দু'জনে একটু পরে বল খেলব।

কাকু তুমি কাল আমাকে নিয়ে পার্কে খেলতে যাবে।"

আশ্চর্য স্টেথোটি ভাইপো কিছু না বুঝেই কাকার হাতে দিয়ে নিজের মায়ের ডাকে নিজের ঘরে চলে গেল।

শিবনাথ এই মন্ত্রঃপূত স্টেথো নিয়ে খেলা করতে লাগল। প্রায় একঘণ্টা পরে ভোঁদুলালকে আবার পাওয়া গেল। শিবনাথ তার বুকে স্টেথো বসিয়ে দিল। ঘড়ঘড় শব্দ, তারপর কানে এলো : "মা, কাকু আমাকে খারাপ করবে না মা। আমাকে কাকুর কাছে যেতে দাও।"

তাহলে যা সন্দেহ করা গিয়েছিল তাই! ভোঁদুলালের মায়ের মনে নানা ভয়। ছেলেকে কাকুর কাছে পাঠাতে চান না।

দুঃখ হলো, কিন্তু কষ্ট পাচ্ছে না শিবনাথ। সংসারে এমন হওয়াই স্বাভাবিক। ভোঁদুলালের মায়ের বুকে স্টেথো বসাতে পারলে হতো, সব কথা জানা যেত। কিন্তু আচমকা বউদির বুকে হাত বাড়ালে হইচই বাধতে বাধ্য।

দোতলা থেকে শিবনাথ একটু পরে একতলায় নেমে এলো। সামনের বস্তিবাড়ির এক বুড়ো স্টেথো দেখেই হাজির। তার অন্য কোথাও যাবার সামর্থ্য নেই। শিবনাথ বুকে যন্ত্র বসাল। আবার ঘড় ঘড় শব্দ। তারপর সে শুনতে পাচ্ছে : "ডাক্তারের কড়ি তো লাগবে না। কিন্তু ওষুধ? ওষুধ কিনব কী করে?"

শিবনাথ জানে এই রোগের চিকিৎসা সে করতে পারবে না। তবু বলল, "ভয় পেয়ো না। ওষুধ দেব আমি, পয়সা লাগবে না।"

এরপর বাবা ওপর থেকে ছেলের দৃশ্য দেখে ভেঙে পড়েছেন। একটা ছাগলকে ধরে তার বুকে স্টেথো বসাচ্ছে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র। তারপর বউদিকে অনুরোধ করছে, "ওকে খেতে দাও, আটাগম যা আছে। ছাগলটা শুধু ভাবছে, কোথায় খেতে পাব, কোথায় খেতে পাব?"

বউদির ভয় বাড়ছে। দেওর এবার সত্যিই উন্মাদ হতে চলেছে।

সত্যশরণ অবস্থা সামাল দেবার জন্যে অসুস্থ অবস্থায় নিজে নেমে এলেন। নেশায় পড়ে ছেলে এবার খপ করে বাবার বুকে যন্তর বসিয়ে দিয়ে বলল, জোরে জোরে নিশ্বাস নাও। এই ছেলের বয়স পঁচিশ হয়েছে।

স্টেথো নামিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল শিবনাথ, বাবার বুকের ভিতরটা সে

শুনতে পাচ্ছে। "কবে আমার মৃত্যু হবে? ওগো কবে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে? কিন্তু এই ছেলেটার কী হবে? তুমি আগে চলে গেলে। কে ওকে দেখবে?"

ছেলে হঠাৎ বলে বসল, "বাবা তুমি ভেব না। আমি তো কোনো দোষ করিনি।"

সত্যশরণের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়াতে লাগল। আবার বাবার বুকে স্টেথো বসিয়ে দিল শিবনাথ। ঘড় ঘড় আওয়াজ : "ছেলেটা কি পাগল? না রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণের মতন সাধকের লক্ষণ রয়েছে?

বাবাকে বোঝাচ্ছে শিবনাথ। "আমি কেন পাগল হতে যাব বাবা? পরীক্ষায় ফেল করেছি, ড্রাগ খেয়েছি, কিন্তু আমি পাগল নই। আমি রামপ্রসাদও নই বাবা, দেবতাদের আমি দেখতে পাই না। কালী, দুর্গা, শিব কেউ আমার কাছে আসে না। তুমি তো আমাকে ডাক্তার শিবনাথ সমাদ্দার দেখতে চেয়েছিলে।"

সত্যশরণের শরীর সত্যিই খুব খারাপ। তার ওপর বউমা এসব দৃশ্য দেখলে খুব ভয় পেয়ে যাবে। নিজের ছেলেটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করতে স্বামীকে না বলে বসে আলাদা হয়ে অন্য কোথাও চলো!

এরপর কোনো এক সময়ে শিবনাথ সমাদ্দার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ইচ্ছে ছিল বউদির মনের কথাটা কল বসিয়ে ভালোভাবে জেনে নেয়। কারণ মুখে বউদি বলে যাচ্ছেন শ্বশুরকে, "আপনার ছোট ছেলের ভালো হোক, মঙ্গল হোক। ছোট দেওর, আমার আদরের, নিজের ছোট ভাইয়ের মতন।" স্টেথো বসালেই সব পরিষ্কার হয়ে যেত, অথচ উপায় নেই ; এখনই ভেবে বসবে দেওর সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।

শিবনাথ একসময় বাবাকে বলেছে, "কয়েকদিন মামার কাছে ঘুরে আসি।"

তার মানে মহানগর থেকে দূরে অন্য এক ছোট শহরে। সেখানে টেলিফোন নেই। বাবা সেই শুনে কিছু টাকা হাতে দিয়েছেন এবং বলেছেন, "ছাইপাঁশ কিছু কিনে খেও না যেন। সোজা ওখানে যাও, হাওয়া বদলালে মন বদলায়।" শিবনাথের অবশ্য ধারণা, মন বদলালে হাওয়া বদলায়।

বেরুবার আগে বাবা বলেছিলেন, "হিতেনের সঙ্গে একটু দেখা করো।

হিতেনের চাকরি আমি নিজে অনেক কষ্টে আপিসের কোশ্চেন পেপার বের করে এনে করিয়ে দিয়েছিলাম। হিতেন এখন লেবার অফিসার হয়েছে। আমাকে বলেছিল, নিশ্চয় একটা কিছু করে দেব, আপনি ভাববেন না।"

অতএব হিতেনের আপিস। কারখানার ডিসপেনসারি ও লেবার আপিস এক জায়গায়। ওইখানেই শিবনাথ স্লিপ দিয়েছে। হিতেনবাবুর কখন দয়া হবে।

আসলে হিতেনবাবু এখনও হয়তো হাজির হয়নি। কে যেন বলছিল, লাখ-লাখ লোক চাকরি নিয়ে কাজে যাবার জন্যে আইটাই করছে অথচ সুযোগ পাচ্ছে না। আর যারা চাকরি পেয়েছে তারা লেট করবার, কামাই করবার পথ খুঁজে বের করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। কাজে যেতে তাদের ভালো লাগে না।

শিবনাথের কাজকর্ম নেই, সুতরাং শিবনাথ যতক্ষণ প্রয়োজন বসতে পারে, দুনিয়ার সব চাকুরে তো গ্র্যাজুয়েট হয়ে বসে নেই, সুতরাং তাদেরও কাজ পাবার অধিকার আছে।

গলার স্টেথোটাই কাল হলো শিবনাথের। একজন ওয়ার্কার ভিতরে ঢুকে ডাক্তারবাবুদের কাউকে না দেখে ধৈর্য হারাল। তারপর নজর পড়ল স্টেথোসহ শিবনাথের দিকে। বলল, "বেশ মাল আপনি! ডিউটিতে এসে বেঞ্চিতে বসে হাওয়া খাচ্ছেন। আর রোগীর প্রাণ বেরোবার দাখিল!"

রোগীর সঙ্গে আর একজন সঙ্গী ছিল। তার মন্তব্য : "এই জন্যেই তো ডাক্তাররা প্যাঁদানি খায়। ডাক্তারি পাশ করে সাপের পাঁচ পা দেখে বসে আছে।"

কিছু বলবার সুযোগ পায়নি শিবনাথ। রোগীর মাথায় নাকি ভীষণ যন্ত্রণা। অসহ্য যন্ত্রণা। চোখে অন্ধকার দেখার মতন অবস্থা। "ডাক্তারবাবু আমি কাজ করব কি, দাঁড়াতে পারছি না।"

বুকে স্টেথো বসাল শিবনাথ। ঘড়-ঘড় শব্দ। তারপর শিবনাথ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে মনের কথা : "শালা আমার কিছু হয়নি। কাজ ভালো লাগছে না। আমি দুপুরে একটু জুয়ো খেলতে বসবো। কোন শালা বদ্যি আমাকে

আটকায়। দরকার হলে ইউনিয়নের গদাইদাকে ডেকে আনব, ম্যানেজার এবং বদ্যির বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।'

"আপনার মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা?"

"ভীষণ যন্ত্রণা। তাড়াতাড়ি ছাড়ুন। বমি আসছে।"

"জুয়ো খেলতে ইচ্ছে করছে?" শিবনাথের কথায় তড়াং করে সোজা হয়ে বসল লোকটা।

লোকটা ভীষণ ধাক্কা খেল। এক কথায় তার রোগ ছুটে যাচ্ছে। এই সময় অনেক ডাক্তারবাবু এসে গিয়েছেন। লোকটা আর কথা না বাড়িয়ে কেটে পড়ল।

হিতেন হাজরা সেই সময় হাজির হলেন। শিবনাথকে নিয়ে তিনি অফিস ঘরে গেলেন। ব্যাপারটা তিনি লক্ষ্য করেছেন। স্টেথো নিয়ে ঘুরে বেড়াবার বিপদ কি তা তাঁর অজানা নয়। দুঃখু করলেন, "ওয়ার্কারদের ক্যারাকটার বলে কিছু থাকছে না। সবাই কোম্পানিকে গ্যাঁড়া দেবার জন্য উচিয়ে রয়েছে। ডাক্তাররাও ওদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে, আমি কত সামলাব?"

এরপর হিতেন হাজরা বললেন, "সত্যশরণদা কেমন আছেন? তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা যত্ন করে রেখে দিয়েছি, সুযোগ পেলেই হায়েস্ট প্রেফারেন্স দেব। সত্যশরণদার ছেলে বলে কথা। তা এখন কি হাত গুটিয়ে বসে থাকা হচ্ছে? আমাদের জাতের ছেলেদের যেটা স্বভাব। অন্য রাজ্যের ছেলেদের দেখেও আমাদের শিক্ষা নেই, তারা টুকটাক টুপাইস কামিয়ে যাচ্ছে যে করেই হোক।"

শিবনাথের উত্তর শুনে খুব খুশি হলেন হিতেন হাজরা। "তুমি হোমিওপ্যাথি করছো, খুব ভালো কথা। অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের যে অধঃপতন হচ্ছে তাতে হোল ওয়ার্ল্ড শেষ পর্যন্ত না হোমিওপ্যাথিকে হোমে ডেকে নেয়।"

ভাগ্য সুপ্রসন্ন। হিতেন হাজরার কড়া ক্যাপশুল খেয়ে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। চান্স পেয়ে সত্যশরণদার ছেলেকে দেখিয়ে নিতে চাইলেন।

বুকে স্টেথো বসাল শিবনাথ। ঘড়-ঘড় শব্দ। তারপর : "কেন যে ওই বুড়ো সত্যশরণ আমাকে জ্বালায়। আমি তো ওর অ্যাপ্লিকেশন পর্যন্ত

হারিয়ে ফেলেছি।”

শিবনাথ : “একটা নতুন অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে যাব?”

হিতেন : “এটা নামকরা কোম্পানি। সত্যশরণদার ট্রেনিং—কাগজ এখানে নড়চড় হয় না।”

জোরে নিশ্বাস নিতে হচ্ছে হিতেন হাজরাকে। বুকের ভিতর থেকে শিবনাথ শুনছে, “একটা চাকরি বেচলে শালা এগারো হাজার টাকা কাঁচা পাব। আমি কোন দুঃখে সত্যশরণকে তেল দেব?”

শিবনাথ : “বাবা বলছিলেন, কাউকে যদি কিছু দিতে হয়। বাবার আপত্তি নেই। তিনচার মাসেই তো ওটা উঠে আসবে।”

হিতেন : “ছি ছি। ওকথা মুখে আনতে নেই। এখানে সব কিছু যোগ্যতার ভিত্তিতে। শুধু তোমার ক্ষেত্রে ভালোবাসার ভিত্তিতে, সত্যশরণদার কাছে কৃতজ্ঞতার ভিত্তিতে। তুমি আর চারটে হপ্তা একটু ধৈর্য ধরো।”

আরও জোরে নিশ্বাস নিতে বলছে হিতেন হাজরাকে। স্টেথো বসানো হচ্ছে বুকে। তারপর, “চার হপ্তা কেন, চল্লিশ বছরে তোমার কোনো চান্স নেই। কিন্তু লোককে ঝুলিয়ে রাখতে হয়, মুখের ওপর না বলতে নেই।”

শিবনাথ : “আমি কি ধরে নেব, চাকরি হবে না।”

হিতেন : “হতে বাধ্য। আমি সত্যশরণদার সঙ্গে দেখা করব।”

স্টেথোর মধ্য দিয়ে শিবনাথের কানে তখন ভেসে আসছে, “আমার খেয়েদেয়ে কাজ নেই ওই বুড়ো ভামের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ছেলে-ছেলে করে পাগল করে মারল। আমাকে যদি আদৌ কাউকে বিনাপয়সায় কাজ করে দিতে হয় তা হলো রেখা দাসের ভাইকে। রেখা আমার বান্ধবী। রেখার সঙ্গে দেখা হবে না আজ? রেখার জন্যে মনটা চনমন করছে। রেখাকে খুশি না করলে সে আড়ি করে দেবে। তখন আমাকে ওই বুড়ি বউকে নিয়ে সুখী থাকতে হবে।”

শিবনাথ : “আজ আপনি বিশ্রাম নিন। আপিস থেকে চলে যান। শরীরে অস্থিরতা রয়েছে।”

হিতেন : “আপিস থেকে যাব, কিন্তু এইসব পোস্টে না-মরা পর্যন্ত ছুটি নেই। ওয়ার্কারদের মতন আমরা মাথার যন্ত্রণা রিপোর্ট করতে পারি না।”

স্টেথো থেকে : "রেখা, সুইট রেখাকে আমি গাড়িতে তুলে নেব। তারপর চলে যাব কোম্পানির গেস্ট হাউসে।"

শিবনাথ : "আপনি ওষুধ খাবেন না। একটু পরেই সব ভালো হয়ে যাবে, আপনি খুশি হবেন।"

হিতেন : "খুশি হবার উপায় আছে? সিটি সেন্টারে মিটিং রয়েছে— ওখানে কোম্পানির জন্যে অনেক খবরাখবর জোগাড় করতে হবে।"

স্টেথোতে শোনা : "গাড়িটাকে এক জায়গায় রেখে রেখাকে কি ট্যাক্সিতে তুলে নেব? না কোম্পানির খরচে লাক্সারি ট্যাক্সি করব? রেখা বোধ হয় তাই পছন্দ করবে।"

শিবনাথ : "আপনি কি সিটি সেন্টারের দিকে যাবেন? ওদিকে আমারও দরকার ছিল।"

স্টেথো : "ওরে হারামজাদা, তুই আমার দু'দণ্ডের সুখে ছাই ফেলবি।"

হিতেন মুখে : "খুব খুশি হতাম ভাই। কিন্তু এখন মিটিংয়ে বসব। কখন যে যাব, আদৌ যাব কিনা কিছুই ঠিক নেই।"

হিতেনের বিদায়কালীন উপদেশ : "রোগী পরীক্ষা করলে সবসময় একটা ওষুধ দেবে। ওষুধের দরকার নেই এটা কখনও বলবে না, এতে পসার কমে যাবে, রোগীও হতাশা বোধ করবে, ভাববে আমার এমন রোগ যার ওষুধই নেই।"

কাঁটাতলা থানা :

ছোটবাবু ফোন ধরলেন : "হ্যালো, কাঁটাতলা থানা স্পিকিং। ও আপনি রিপোর্টার নরেনবাবু? কেমন আছেন স্যর্? আপনার 'অন্যযুগ' পত্রিকা তো ফাটিয়ে দিচ্ছে, স্যর। আপনাদের কলমের এক খোঁচায় ডি এস পি সায়েব বদলি হলেন, আমরা তো কোন ছার! তবে স্যর যদি সত্যিকথা বলতে বলেন, গোলমালটা পাকালেন থানার ওসি, খাঁড়াটা পড়ল ডি এস পি সায়েবের ওপর।...হ্যাঁ...পুলিশ তো স্যর আপনাদেরই পাঁঠা, আপনারাই ঠিক করবেন মাথার দিকে কাটবেন, না ল্যাজের দিক থেকে কাটবেন।"

"হ্যালো, আপনি জিজ্ঞেস করছেন, বড়বাবু কোথায়? বড়বাবু স্যর, শালীর ছেলের মুখেভাতে খেতে গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন, রাউন্ডে

গিয়েছেন। কাউকে যেন বলবেন না, আপনি ঘরের লোক তাই বললাম।"

"কোনো খবর? খবর তো স্যার, আজকাল সব হেড কোয়ার্টারে। আমাদের তো মুখ বন্ধ। কী বললেন? বন্ধ মুখই বেশি খোলা পাওয়া যায়? একটা স্টোরি দিতে হবেই—আজকে খবরের বাজার খুব খারাপ—শহরে তেমন খুনোখুনি, লেঠোলেঠি, বক্তৃতাবাজি কিছু হয়নি। এত ভালো কথা। খবর তেমন নেই বলে একদিন সাদা কাগজ দিন না—ছেলেদের এক্সাইজ বুক পাওয়া যাচ্ছে না, কাজে লাগবে। পাবলিক খুব তারিফ করবে।"

"আচ্ছা স্যার, দিচ্ছি একটা গরম। একটু স্পেশাল টাইপের ঘটনা। শুধু একটা উপকার করতে হবে। মাঞ্জা চড়াবেন একটু, লিখবেন সংবাদ পাওয়া মাত্রই কাঁটাতলার থানার কর্তব্যপরায়ণ ছোটবাবু ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে আসামীকে গ্রেপ্তার করেন।"

"ওইভাবে লজ্জা দেবেন না স্যার, ছুটব কোথা থেকে? বুকে একটু ব্যথা আছে—ওসি বলছে ভুঁড়ি কমাও। তা শালা আমার একটু শাঁসে জলে চেহারা তা তোর কী? আমার ভুঁড়ি আমি সামলাবো—তুই কে? আসলে স্যার কোনো ঘটনাস্থলেই ঠিক সময়ে যেতে পারি না। যাব কী করে? সেপাইগুলো যা আড্ডাবাজ। ওদের জড়ো করতে সময় লাগে। জড়ো হলেও ড্রাইভার পাওয়া যায় না। যখনই খোঁজ করবেন শুনবেন চা খেতে গিয়েছে। আসলে নিজের প্রাইভেট ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা আছে, ওতে ব্যস্ত থাকে। ফাঁকি মারে না আমার সেপাইগুলোর মতন।"

"তা শুনুন কেসটা। ভীষণ সিরিয়াস। একটা লোক ডাক্তার সেজে হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঢুকে রোগী পরীক্ষা করছিল। কোত্থেকে একটা স্টেথো পর্যন্ত যোগাড় করেছে! কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার ভাবুন—মেয়েদের ওয়ার্ডে পর্যন্ত ওই কারবার চালিয়েছে। ছুটে গিয়ে ধরে এনেছি—যদিও সত্যি কথা বলছি, স্যার, ছুটিওনি, ধরিওনি। ধরেছে হাউস সার্জেন, ওরাই পুলিশকে দিয়েছে। কিন্তু কী সিরিয়াস অবস্থা ভাবুন। অ্যাদ্দিন শুধু ওয়ার্ডে কুকুর এবং বিছানায় ছারপোকা ঘুরে বেড়াত। এখন ডাক্তারও দু'নম্বরি। নিরাপত্তা বলতে কিছু থাকবে না।"

টেলিফোন নামিয়ে ছোটবাবু এবার আসামী শিবনাথ সমাদ্দারকে তাঁর

সামনে আনতে বললেন। তাকালেন কাগজের দিকে, তারপর বললেন, "তুমি ফেঁসে গেলে বাছাধন। অন্তত এগারোটা চার্জ থাকবে তোমার বিরুদ্ধে। তুমি বিনা পারমিশানে নিষিদ্ধ এরিয়ায় ঢুকেছ, নিজেকে গভরমেন্ট সারভেন্ট বলে চালাবার চেষ্টা করেছ। লাইসেন্স ছাড়া ডাক্তারি করবার চেষ্টা চালিয়েছ, চিটিংবাজি করেছ রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে, সিরিয়াস রোগীর প্রাণনাশের চেষ্টা করেছ, মেয়েদের শ্লীলতাহানি করেছ—তাদের বুকে হাত দিয়েছ—এটসেটরা, এটসেটরা, ঠিকমতন সাজাতে পারলে জেল থেকে যখন বেরুবে তখন বয়স পঁচিশ থেকে চল্লিশে পৌঁছে যাবে।"

শিবনাথ বলল, "আমি এসব কিছুই করিনি, আপনি কী বলছেন?"

"করেছ, করেছ, বুঝতে পারোনি। নেহাত আমি ভালো লোক, তাই রেপের চেষ্টার চার্জ আনবার কথা এখনও পর্যন্ত ভাবছি না। ওটি হলে পুরো ফেঁসে গেলে তুমি।"

ছোটবাবু এবার কাগজগুলো পড়ছেন। "তুমি হাসপাতালে প্রথমে গিয়েছিলে আউটডোরে? ওখানে রোগীদের বুকে টকাটক স্টেথো বসিয়েছ। তুমি মাল একটি!"

"আমি কী করব, দারোগাবাবু? সব রোগী মুখে বলছে, ডাক্তারবাবু বাঁচান। আর স্টেথো লাগিয়ে দেখি অন্য কথা। বলছে, এতগুলো কালাপাহাড় হাসপাতালে জড়ো হলো কী করে? এদের হাড় মাঝে-মাঝে কেন ভাঙে বুঝছি।"

"তুমি কি সর্বজ্ঞ নাকি?" ছোটবাবু ব্যঙ্গ করলেন। "অন্তর্যামীর মতন সব জেনে বসে আছ!"

"স্টেথো লাগালে সব বোঝা যায় স্যর", শিবনাথ বোঝাবার চেষ্টা করছে।

ছোটবাবু বললেন, "তুমি এরপর কেবিনে ঢুকেছিলে বলাই রক্ষিতের। বলাই রক্ষিতের ছেলেও একই সঙ্গে পাশের কেবিনে রয়েছে। দু'জনেই একসঙ্গে পথ দুর্ঘটনায় পড়েছে। ছেলে বলছে, "বাবা ভালো হয়ে উঠবেন তো?" তুমি অমনি ওর বুকে স্টেথো লাগালে আর খিলখিল করে হাসতে লাগলে। তারপর বললে, "তোমার মনস্কাম পূর্ণ হবে।"

শিবনাথের কোনো উপায় ছিল না। ছেলের বুকে স্টেথো লাগিয়ে সে শুনেছিল, "বুড়ো কবে মরবে, মরবে তো? একটা পয়সা হাতে দিতে দেয় না, যখের ধন আগলে বসে আছে।"

"তারপর তুমি বুড়ো রক্ষিত মশায়ের কেবিনে ঢুকলে এবং তাকে একজামিন করতে লাগলে।"

শিবনাথ অপারগ। রক্ষিত মশায়ের পুত্রবধূ ততক্ষণে স্বামীর নির্দেশে এই কেবিনে এসে শ্বশুরকে নরম পাকের সন্দেশ খাওয়াচ্ছে, আর কড়াপাকের প্রশ্ন করছে। "বাবা, আপনার চাবিগুলো সাবধানে রাখতে হবে, যা চোরছ্যাঁচড় চারদিকে।"

বিজনেসম্যান বলাই রক্ষিত মুখে বলছেন, "যা বলেছ বউমা! চোর-ছ্যাঁচড়ে দেশটা বোঝাই হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় যে চাবিগুলো গেল মনে করতে পারছি না। মাথাটা একটু হাল্কা হলে আবার মনে আনার চেষ্টা করব।"

এই সময় শিবনাথ বলাই রক্ষিতের বুকে স্টেথো বসিয়েছিল। ওখানে সে শুনতে পাচ্ছে : "এক নম্বর চোর তো তোমার স্বামী, যার এজেন্ট হয়ে তুমি এসেছ। চাবিগুলো আমি সুকুমারীর আলমারিতে লুকিয়ে রেখে এসেছি—সুকুমারী নিজেও জানে না। যদি আমাকে বে করে তবে জানবে। ভারি মিষ্টি মেয়ে সুকুমারী, টুকটুকে বউ হবে আমার।"

ছোটবাবু বকুনি লাগালেন, "আষাঢ়ে গপ্পো ফাঁদবার জায়গা পেলে না। কেন তুমি হাসপাতালের ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকলে? বদ মতলব না থাকলে কোনো লোক জেনানা ওয়ার্ডে ঢোকে না।"

"আমি ওখানে ঢুকিনি. স্যর। আমাকে হাতে-পায়ে ধরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।"

শিবনাথ মিথ্যে কথা বলছে না। তখন ভিজিটিং আওয়ার। কোথাও কোনো ডাক্তার নেই, নার্সরাও টি-ভি দেখতে উধাও। সেই সময় স্টেথো গলায় দিয়ে পুরুষ ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে আসছিল শিবনাথ। এক ভদ্রমহিলা জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন, "ডাক্তারবাবু দয়া করে একবার আসুন, গিয়ে দেখি এক বেডের রোগী মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না।"

ওই দৃশ্য দেখে যে মহিলা শিবনাথকে ডেকে এনেছেন তিনিও মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন। মহিলা বলছেন, "আমার লক্ষ্মী প্রতিমা বউমা। স্টোভ জ্বালাতে গিয়ে কী হলো। ডাক্তারবাবু বাঁচবে তো?"

এই মহিলার পিঠে স্টেথো লাগাল শিবনাথ। তারপর সে শুনতে পেল মনের কথা : "বউমা মাগী বড় জ্বালা জ্বালিয়েছে। মরবার সময় আবার ফাঁসিয়ে না যায়। আমি ওকে মরতে বলেছি। কিন্তু পরের কথায় যদি কেউ গায়ে কেরোসিন ঢালে তা আমি কী করব?"

মহিলা তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলছেন, "বউমা, কোনো ভয় নেই, ঠাকুর তোমাকে রক্ষে করবেন। ঘরের লক্ষ্মীকে আমি বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব।"

আরও দু-একটা কেস দেখেছে শিবনাথ। তারপরেই ধরা পড়েছে শিবনাথ।

তারও একই বক্তব্য : "ডাক্তার যদি না থাকে, আমাকে যদি জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, আমি কী করব? আমার নিজেরই তো মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা। এমনি এক রকম শুনছি, স্টেথো লাগালেই আর একরকম কানে আসছে।"

ছোটবাবু বিশ্বাস করছেন না, জানতে চাইছেন সে ড্রাগ খেত কিনা। "থানায় ধোলাই খেলে ছোটখাট নেশা বাপ বাপ করে পালাবে।"

ঠিক এই সময় হইচই পড়ে গেল। কাঁটাতলা থানা এলাকায় গোলাপ মিত্তিরের ব্যাগ ছিনতাই হয়েছে। গোলাপ মিত্তির বুঝতেই পারছেন মিনিস্টারের শালা। একটা কিছু ব্যবস্থা না হলে শালাবাবু তো ফোন তুলে জামাইবাবুকে এক হাত নেবে। শালাবাবুর থানায় আসার সময় নেই। তাঁর চামচা কেসটা তদ্বির করছে। ছোটবাবু জানেন এর অবধারিত ফল হোলসেল ট্রান্সফার—কাঁটাতলা থানার ইঁদুরগুলোকে পর্যন্ত বদলি করে অন্য ইঁদুর আনবার অর্ডার দেবেন বড় সায়েব।

ছিনতাইয়ের ব্যাপারে দুটো লোককে অপহরণ করে এনেছে ইতিমধ্যে। তার মধ্যে একটাকে বিরাট এক থাপ্পড় লাগালেন ছোটবাবু। তবু সে বলবে না কোথায় শালাবাবুর ব্যাগ রেখেছে।

আর একটা থাপ্পড় পড়ল। তবু ফল হলো না। হঠাৎ বড়বাবু শিবনাথকে

চান্স চিলেন। "খুব লেকচার দিচ্ছিলে মনের কথা শুনতে পাও। দেখাও দিকি বিদ্যেখানা।"

শিবনাথ এবার লোকটাকে স্টেথো দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

স্টেথো : "মিনিস্টারের ব্যাগ আমি নিইনি। আমি এখনও এতো বড় চোর হইনি, হইনি।" আরও শব্দ আসছে।

শিবনাথ বলল, "লোকটা বাসন চুরি করেছে তিনদিন আগে দেশবিক্রম লেন থেকে।"

ছোট্টবাবু প্রথমে খুব সন্তুষ্ট হলেন না। দ্বিতীয় আসামীকে আনালেন এবং আক্রমণ করলেন। কোনো ফল হলো না।

আবার চান্স পেল শিবনাথ। আসামীর বুকে স্টেথো বসিয়ে জোরে-জোরে নিশ্বাস নিতে বলল। লোকটা নিশ্বাস নিতে চাইছিল না। ছোটবাবুর ধমকানিতে কাজ হলো।

শিবনাথের ঘোষণা, স্টেথো বলছে : "শালাবাবুর ব্যাগ আমি নিয়েছি, নিয়েছি। রেখেছি লুকিয়ে কয়লার ডিপোয়।"

ছোটবাবু বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তবু সঙ্গে-সঙ্গে কয়লার ডিপোয় লোক পাঠালেন উইথ আসামী।

আধঘণ্টা পরে ছোটবাবু খুব আদর করলেন, চা খেতে দিলেন শিবনাথকে। বসতে বললেন। কারণ সেপাই ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে শালাবাবুর হারানো ব্যাগ সমেত। ছোটবাবু মা কালীকে নমস্কার করলেন। "মস্ত ফাঁড়া থেকে বেঁচে গিয়েছি, মা।"

ছোটবাবু এবার শিবনাথের স্টেথোটা ধরে নাড়লেন চাড়লেন, কিছু বুঝতে পারলেন না। নিজে একবার স্টেথোটা লাগিয়ে শিবনাথের বুকে দিয়ে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু তিনি ঘড়-ঘড় আওয়াজ ছাড়া কিছুই পেলেন না।

জিজ্ঞেস করলেন, "বংশে কেউ তান্ত্রিক ছিলেন? দাদুর বাবার হিসট্রি শুনে কপালে হাত ঠেকালেন—তন্ত্র, মেডিসিন সব মিলেমিশে অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটেছে।"

ফিস ফিস করে তিনি বললেন, "তোমাকে আমি ট্রাব্‌ল দেব না, অন কন্ডিশন যে আমাকে মাঝে-মাঝে তুমি একটু হেল্প করবে। আর শোনো

ছোকরা, তোমার এই স্টেথোর ব্যাপারটা ভীষণ গোপন রেখো, না-হলে বিপদে পড়ে যাবে।"

ভাঁড়ের চা খাওয়া শেষ করে ছোটবাবু একবার নিজেকে পরীক্ষা করালেন, পুলিশকে কেউ এসব পরীক্ষা করে না, কিন্তু ছোটবাবুর হুকুম।

বুকে স্টেথো লাগিয়ে অনেকক্ষণ কথা শুনলো শিবনাথ। তারপর বলল, "বড়বাবু সম্বন্ধে ভীষণ দুশ্চিন্তা করছেন।"

ছোটবাবুর বিস্ময় বেড়ে চলেছে। "তুমি যখন জেনেই গিয়েছ, আমাকে একটু হেল্প করো। তোমাকে পাঠাচ্ছি ওঁর কাছে, উনি কী ভাবছেন দেখো।"

বড়বাবুর বুকে আচমকা স্টেথো বসানো যায় না। আবার হাঙ্গামায় পড়ে যাবে শিবনাথ।

ছোটবাবু বললেন, "তোমার তো সুবিধে রয়েছে। তুমিও তো হোমিওপ্যাথ।"

শিবনাথ স্বীকার করল, মহেশ ভট্টাচাজ্যির বই কিনেছে, কিন্তু এখনও পড়া হয়নি।

ছোটবাবু বললেন, "ওই হয়েছে। সব বই উকিল ডাক্তাররা পড়ে না, হাতের গোড়ায় রেখে দেয়, দরকার হলে দেখে নেয়।"

ছোটবাবু এবার থানার ওপরে বড়বাবুর কোয়ার্টারে চলে গেলেন। বড়বাবুর কাজের মেজাজ নেই। শালীর ওখানে দু'খানা চিংড়িমাছ ভাজা খেয়ে পেটটা ইতিমধ্যেই ভুটভাট করছে।

"খুব ভালো হোমিওপ্যাথ স্যর, ভবিষ্যতে বিধান রায় হতে পারে।"

বড়বাবু: "তুমি একটা গবেট। বিধান রায় হোমিও ছিলেন না। হোমিওপ্যাথ ছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকার, স্বয়ং রামকেষ্টদেবের চিকিৎসা করেছিলেন। ছিলেন ডাক্তার জ্ঞান মজুমদার, পি ব্যানার্জি (মিহিজাম)।"

একটু পরে শিবনাথ ফিরে এল ছোটবাবুর কাছে। বড়বাবুর মুখে ছোটবাবু সম্পর্কে অত মিষ্টি কথা। কিন্তু স্টেথোতে শোনা যাচ্ছে: "তোকে আমি এই থানা থেকে হটাব, হটাব। তোকে আমি বাঁশ দেব, যতই ডাক্তার পাঠিয়ে মাখন লাগাও।"

ছোটবাবু আরও এক ভাঁড় চা অফার করলেন শিবনাথকে। বললেন,

"দূর থেকে লোকের দিকে তাকিয়ে তার মনের কথা তুমি শুনতে পাও না?"

শিবনাথ বলল, "সেটা তো পরবর্তী পদক্ষেপ, তার জন্যে রিসার্চ করতে হবে। এখন এই স্টেথোটাই ভরসা।"

ছোটবাবু বললেন, "তোমার কেস আমি তুলে দিচ্ছি না। ওখানে ওই ব্যাগ চোরের নামও জড়িয়ে দিচ্ছি। লিখে রাখছি ওকেও হাসপাতালে ফিমেল ওয়ার্ডে মেয়েদের ইজ্জতে হাত দিতে দেখা গিয়েছে। তুমি আমার কথাবার্তা না শুনলে তোমার ওই কেস আমি শুবলেট করে দেব কিন্তু যখন যা বলব শুনতে হবে।" ছোটবাবু যেন বিশ্বাস করছেন, রিসার্চের কাজেই হাসপাতালে ঢুকে পড়েছিল শিবনাথ।

ছোটবাবু এবার ফোনে সি আই সায়েবকে ধরলেন। বিনয়ে বিগলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার খুকখুকে কাশিটা কেমন আছে স্যর? একজন নতুন ডাক্তারকে অনেক কষ্টে আবিষ্কার করেছি স্যর। আপনার কাছে পাঠাচ্ছি স্যর—একেবারে নতুন লাইন—তান্ত্রিক হোমিওপ্যাথ। ফ্যামিলিতে এম-ডি পর্যন্ত ছিল, মেডিক্যাল কলেজে না ঢুকে তান্ত্রিক হোমিও হয়েছে।"

শিবনাথ এইসব হাঙ্গামায় যেতে চায় না। সি-আইকে কী ওষুধ দেবে সে?

ছোটবাবু পরামর্শ দিলেন, "খুব সহজ। একটা নাম মুখস্থ করে নাও। পালসেটিলা ২০০। দাঁড়াও দাঁড়াও। শুধু ওই লিখলে তোমার প্রেসক্রিপশন জমবে না। তুমি লিখবে—হ্রীং ক্রীং বৃহৎ পালসেটিলা—মনে রাখবে তুমি তান্ত্রিক হোমিও। অর্ডিনারি হোমিওপ্যাথ তুমি নও।"

"হোমিওপ্যাথরা আমাকে হাজতে পাঠাবে, স্যর। ওটা এখন সায়েন্স হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"কিসসু ভেব না। থানা মানে তো আমি। এখানেই তুমি আসবে, চা খাবে, থানা তো তোমার মামার বাড়ি এখন থেকে। বড়বাবুকেও তো লটকে দিয়েছি।"

শিবনাথ বলল, "আরও বিপদে পড়ে যাব স্যর। বড়-বড় হোমিও দোকানে ওই প্রেসক্রিপশন তো সার্ভ করবে না।"

ছোটবাবুর মাথায় কথাটা ঢুকল। "তোমাকে যত বোকা দেখায় তত বোকা তুমি তো নও। শোনো, প্রেসক্রিপসনটা মুখে বলবে। তারপর শুনিয়ে দেবে এটা কোনো দোকানে পাওয়া যাবে না। তুমি নিজে সাপ্লাই করবে। প্রথম ডোজটা সঙ্গে-সঙ্গে দিয়ে দেবে। নো অসুবিধে—তোমার গাঁটের কড়ি খরচ নেই। আমার কাছে গোটা পুরনো হোমিও শিশি পড়ে আছে, ওগুলো নিয়ে যাও।"

সি-আই সায়েবের ফোন ছোটবাবুকে। ইতিমধ্যে সি-আই সায়েবের স্টেথো রিপোর্ট শিবনাথের কাছ থেকে ছোটবাবু পেয়ে গিয়েছেন— "ছেলেটি ভালো, ছেলেটি ভালো...ও সি-র থেকে ভালো...অথচ এর নামে ডেলি কমপ্লেন করছে ওসি, বলছে ট্রান্সফার করাও ওয়ারলেস সেকশনে।" এই ওয়ারলেস হলো ওয়ার্থলেস সেকশন—একটা কাঁচা পয়সা নেই।

সি-আই সায়েব বলছেন: "হ্যালো সুধাময়...তোমার ওই তান্ত্রিক হোমিওর ওষুধ খেয়ে ড্রামাটিক রেজাল্ট। খুকখুকে কাশিটা সেভেনটি ফাইভ পার্সেন্টি চলে গিয়েছে। ভাবছি একবার ওঁকে মিনিস্টারের শালাবাবুর কাছে পাঠাব কি না। জানো তো গোলাপ মিস্তিরের একটা বিশ্রী মাথা ধরে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না।"

"ছেনতাই ব্যাগ ফেরতে পেয়ে উনি খুশি তো স্যর?"

"খুশি বলে খুশি! ওই ব্যাগে জরুরি সব কাগজপত্তর ছিল। সেসব যদি কাগজের লোকের হাতে পড়ত তা হলে খুবই বিপদ হতো। তা তোমার নেকসট প্রমোশন কবে যেন ডিউ হচ্ছে?"

"আপনারা গুরুজন রয়েছেন, ওসব নিয়ে চিন্তা করি না, স্যর। এই কাঁটাতলা থানাকে পরিষ্কার করতে হবে, আরও পরিষ্কার করতে হবে স্যর। আমি এখন স্যর অন্য জায়গায় সি-আই হয়েও আনন্দ পাব না।"

সি-আই সায়েব সব বুঝতে পারছেন। তিনি ইঙ্গিত দিলেন, কাঁটাতলা থেকে নড়ানো হবে না, ওখানেই সেজোবাবু হবেন সুধাময় পাল, আপনাদের ছোটবাবু।

"তান্ত্রিক হোমিও। একেবারে নিউ লাইন। রেভলিউশন বলা চলতে

পারে। আগে অ্যালোপ্যাথ-হোমিও দেখেছি। সায়েন্সের নীতিবাগীশরা কী বলল তাতে কিছু এসে যায় না, জনগণের কীসে উপকার হয় সেটাই সবাইকে দেখতে হবে," মিনিস্টারের শালাবাবু জ্ঞান দিলেন।

তারপর শিবনাথকে বললেন, "সি-আই সায়েব আমার বিশেষ বন্ধু। এমন লোক হয় না। ভীষণ এফিসিয়েন্ট। যে ভাবে আমার ব্যাগ উদ্ধার করলেন ভাবা যায় না! ওয়াশিংটন পুলিশ অতো এফিসিয়েন্ট নয়। জেনেভাতে তো নয়ই। লন্ডনে তো ব্যাগ ছিনতাই হয়েছে শুনলে পুলিশ খাতাই খুলবে না। এখানে সি-আই সায়েব আমার বহুদিনের প্রাণের বন্ধু। তাই।"

শিবনাথ এবার শালাবাবুর বুকে স্টেথো বসাল। ঘড়-ঘড় শব্দ।...বুকের ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে..."বন্ধু না ছাই! জামাইবাবু মিনিস্টার না থাকলে তোমরা শালারা আমার দিকে তাকাবে না। জামাইবাবু থাকতে-থাকতে আমাকে গুছিয়ে নিতে হবে।"

শালাবাবু একটু কথা বলতে ভালোবাসেন। শিবনাথকে বললেন, "রোগটা আমার মাথায়, আপনি কিন্তু পরীক্ষা করছেন বুক।"

"বুকটাই তো সব। পুলিশের কন্ট্রোল রুম।"

"জানেন ডাক্তারবাবু, জামাইবাবু নিজে আমার এই মাথা ধরা নিয়ে চিন্তিত। নিজে সাজেস্ট করলেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ধরে মেডিক্যাল বোর্ড বসিয়ে দিচ্ছি, সরকারি হাসপাতালের সাতজন চিফ তোমাকে দেখুক। আমি ভাবলুম, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। তা যা বলছিলাম, আমার জামাইবাবুটির শালা অন্তপ্রাণ। এমন লোক হয় না।"

"জোরে নিশ্বাস নিন।" স্টেথো বসাল শিবনাথ।

ঘড়-ঘড় আওয়াজ। স্টেথোর মধ্য দিয়ে শিবনাথ শুনতে পেল: "ভালো লোক না মুণ্ডু। ঘড়িয়াল দ্য গ্রেট। আমার থ্রু দিয়ে যা কামাই হচ্ছে তার সিংহ ভাগ নেবে—মিনিস্টারশিপ চলে গেলে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ রেখে চালাবে।"

শালাবাবু বললেন, "চিরকালই ব্রিলিয়ান্ট, আমার জামাইবাবু। দেখেই বুঝেছিলুম আমরা, তাই-না বাবা অমন জামাই করলেন। আমরা চিরকালই ভীষণ প্রগতিবাদী। প্রগ্রেসিভ আন্দোলনের জন্যই সব রকম ত্যাগ করেছি

আমরা।"

শালাবাবুর বুকে বসানো স্টেথো থেকে অন্য কথা আসছে : "বাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না ওই বাউন্ডুলের সঙ্গে দিদির বিয়ে দেন। কিন্তু উপায় ছিল না। দিদি তখন গোপন সম্পর্ক থেকে গোলমেলে কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছে। বিয়ের পরও দিদি হাড়ে-হাড়ে জ্বলেছেন। স্বামী কুটোটি নেড়ে দুটো করেননি। দিদি ইস্কুল মাস্টারি করে সংসার চালিয়েছে। বাবা শেষ জীবন পর্যন্ত দুঃখ করেছেন, একটা হতভাগার হাতে পড়ে মেয়েটার জীবন নয়ছয় হলো।"

শালাবাবু বলছেন, "আমার জামাইবাবুর জীবনটা ত্যাগের—ভোগকে তিনি সারা জীবন শতহস্ত দূরে রেখেছেন, সুখকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দিয়েছেন।"

স্টেথো থেকে অবশ্য অন্য কথা শোনা যাচ্ছে : "সুখের স্বাদ পেয়ে জামাইবাবু এখন উপোসী ছারপোকার মতন হয়ে উঠেছেন। আমি তো নিমিত্তমাত্র—যেখান থেকে যা ওঁর নাম করে গুছোচ্ছি তার কড়াক্রান্তি হিসেব দিতে হবে ওঁর কাছে। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে জামাইবাবুর নয়—অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে সুখের স্বাদ চাইছেন জামাইবাবু।"

"বৃহৎ পালসেটিলা হ্রীং ক্লীং"—প্রেসক্রিপশন দিল শিবনাথ। তারপর পকেট থেকে মোড়ক বের করে শালাবাবুকে দিল।

পুরিয়া হজম করে শালাবাবু জানতে চাইলেন কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ সম্বন্ধে শিবনাথের ধারণা কী রকম? জামাইবাবুর কাছে নিয়ে যাবে একদিন। সকালবেলায় মেজাজটা ঠিক থাকে না।

ঠিক এই সময় মিস্টার শেঠিয়া হাজির হলেন। শালাবাবুর বিজনেস পার্টনার!

শেঠিয়াজী বললেন, "টু হানড্রেড টোয়েন্টিফাইভ ইয়ার্স ধরে এইরাজ্যে আছি। আমি তো এখানকারই লোক।"

শেঠিয়াজীর একটু হাঁপ-এর সমস্যা আছে। তান্ত্রিক হোমিওপ্যাথির এমন দুর্লভ সুযোগ ছাড়া যায় না। শেঠিয়াজীর বুকে স্টেথো বসিয়ে ঘাবড়ে গেল শিবনাথ, ওখান থেকে সে শুনতে পাচ্ছে : "দুশো পঁচিশ বছর আছি তো শালা কী হয়েছে? এখানকার লোকগুলো ওঁচাটে—কারু-না-কারু

টাকার ভাগ নেবে। জোচ্চুরির, বদমাইসির রাজা, কিন্তু রবিঠাকুর থেকে কোটেশন ঝাড়বে।”

“এই শালাবাবু আমার আপন ভাইয়ের থেকে বেশি,” শেঠিয়াজী মৃদু হেসে শিবনাথকে বললেন।

আবার স্টেথো বসাল শিবনাথ। ওখান থেকে আওয়াজ : “তিন বছর আগে গোলাপ মিস্তিরকে চিনতাম না। কোন দুঃখে তুমি শালা আমার ভাই হতে যাবে? মিনিস্টার ভীষণ ত্যাঁদড়—তোমার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে কোনো বিজনেস দেবে না, তাই তোমাকে পার্টনার করেছি।”

শালাবাবু এবার শিবনাথকে বললেন, “শেঠিয়াজী আমার দাদা, দেবতুল্য মানুষ। আমাকে পার্টনার করে আর একটা কোম্পানি স্টার্ট করবেন। আজ লেখাপড়া হবে।”

মিষ্টি হাসলেন শেঠিয়াজি।

ওঁর বুকে স্টেথো পরীক্ষা তখনও চলছে। সেখানে এবার শোনা যাচ্ছে : “আমাকে যত বোকা ভাবছ আমি তত বোকা নই। কিছু কিছু দগদগে প্রমাণ রাখছি মন্ত্রীর স্বজনপোষণের। যেমন আজকের কনট্রাক্ট। ওটা আমার সঙ্গে করাচ্ছি না, করাচ্ছি অন্য এক পার্টির নামে। মন্ত্রী কখনও বেঁকে বসলে কাগজে সব খবর পাঠিয়ে দেব, দলিলের ছবি সমেত। 'অন্যযুগ' পত্রিকায় একটা আইটেমে চাকরি যাবে মন্ত্রীর।”

এবার শেঠিয়াজীকে ওষুধ দিল শিবনাথ। ভাগ্যে অনেক কষ্টে আর একটা ওষুধের নাম মনে পড়ল—বৃহৎ ক্যালকেরিয়া ফস হ্রীং ক্রীং।

শিবনাথ আকারে-ইঙ্গিতে শালাবাবুকে বোঝাল, “আজ দিনটা ভালো নয়, তান্ত্রিক দিক থেকে। আজ সই না হলেই ভালো।”

শেঠিয়াজী ইতিমধ্যেই ভক্ত হয়ে উঠেছেন শিবনাথের। কাগজপত্তর যখন সই হচ্ছে না, তখন নতুন কর্মসূচির প্রয়োজন। তিনি ইতিমধ্যেই হাঁপের প্রকোপ কম বোধ করছেন।

শেঠিয়াজী বললেন, “চলুন আমার এক ফ্যামিলি ফ্রেন্ডের কাছে। তাঁর প্রায়ই এক কপালে ব্যথা হয়। ভীষণ কষ্ট পান। ওঁকে একটু খাড়া করে দিন আপনার তান্ত্রিক হোমিওতে।”

শেঠিয়াজীর বুকে আর একবার স্টেথো লাগাবার লোভ সামলাতে

পারল না শিবনাথ। স্টেথোর মাধ্যমে সে শুনল, "ফ্যামিলি ফ্রেন্ড না কচু। আমার রক্ষিতা শ্যামলী দাস, যাকে একবার সিনেমায় নামিয়েছিলাম। এখন একটু শ্যামলীর ওখানে যাবার জন্যে মনটা চনমন করছে। একটা ছুতো পাওয়া গেল।"

শ্যামলী দাস তো ডাক্তারসহ শেঠিয়াজীকে দেখে অবাক। এমন ডাক্তার দুষ্প্রাপ্য তাই শেঠিয়াজী সুযোগ পেয়েই বিনা নোটিশে ধরে নিয়ে এসেছেন।

সুদেহিনীকে একটু পরীক্ষা করতে হবে। ডাক্তারবাবুকে প্রস্তুত হতে শেঠিয়াজী বাইরে যেতে চাইলেন। শিবনাথ ভদ্রতা করে বলল, "তেমন প্রয়োজন নেই।"

শ্যামলীর পিঠের দিকে স্টেথো লাগাল শিবনাথ। সেখানকার শব্দ : "শেঠিয়াজীর ঢং দেখলে মাথা ঘোরে।"

শ্যামলী এবার শিবনাথকে বলল, "শেঠিয়াজী আমার পারিবারিক বন্ধু—অভিভাবকের মতন।"

জোর করে নিশ্বাস নিতে বলল শিবনাথ। শ্যামলীর বুকের খবর : "অভিভাবক না মুণ্ডু। মাসোহারা দেন, ইচ্ছে হলে আসেন, না-হলে আসেন না। আরও কোথায় কি বাধিয়ে রেখেছেন ঠিক নেই। একবার অন্য কাউকে পাঠাতে চেয়েছিলেন, মুখের ওপরে বলে দিয়েছি, আমি ভাড়ার ট্যাক্সি নই। চটেছিলেন। তা চটলে আমার বয়ে গেল!"

চিকিৎসা হয়ে যাবার পরে শেঠজী কিছুক্ষণ থেকে যাবেন ইঙ্গিত দিলেন। শ্যামলী বলল, "আজ আমার যা মাথা ধরেছে না! অজ্ঞান হয়ে না যাই।"

"জোরে নিশ্বাস নিন," শিবনাথ বলল। স্টেথোতে সে যা শুনছে তাতে বোকা বনে যাচ্ছে : "আমার মাথা ধরেছে না ছাই। ওই মাথা ধরার নাম করে তো বুড়োটাকে বিদায় করি যখন ওর মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া, মিস্টার সুরেকার সঙ্গে আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে। বলা নেই কওয়া নেই, হুড়ুম করে এসে পড়লে হবে কী করে? এটা কি খাবারের

দোকান যে সারাক্ষণ ঝাঁপ খোলাই আছে? হপ্তায় একদিনও দোকান বন্ধ হয় না?"

শেঠজী এবার শ্যামলীকে বললেন, "ডাক্তারবাবু যে ওষুধ দেবেন এখনই ওষুধটা খেয়ে নাও।"

শ্যামলীর বুকে শিবনাথের স্টেথো লাগানোই আছে। ওখানকার রিপোর্ট : "হা ভগবান! এখন কী হবে? তান্ত্রিক ডাক্তারের ওষুধ খাওয়া মানেই তো রোগ ভাল হয়ে যাওয়া। এখন আমি কী বলব?"

শিবনাথ আর হাঙ্গামায় গেল না। সে প্রেসক্রিপশন দিল : বৃহৎ পালসেটিলা হ্রীং ক্রীং।

"ওটা কী ডাক্তারবাবু? আমার তো তিনটে মাদুলি আছে—হ্রীং ক্রীং।"

শেঠিয়াজী ব্যাখ্যা করলেন, "এইটাই তো ওঁর বিশেষত্ব। অনেক কষ্টে সন্ধান পেয়েছি মিনিস্টারের থ্রু দিয়ে। আসলে ওষুধের মধ্য দিয়ে তান্ত্রিক চার্জ করা হয়। তুমি এখনই কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যেতে পারো। আমি নিজে বসে থেকে দেখে যাব তুমি ভালো হয়ে উঠেছো।"

শিবনাথ আর পারল না। বলল, "এই ওষুধ মাথা ধরা অবস্থায় খাওয়া চলবে না। খেতে হবে সূর্যোদয়ের আগে। ওষুধের দু'ঘণ্টা আগে ও পরে খালি পেটে থাকতে হবে।"

কৃতজ্ঞ শ্যামলী ডাক্তারের পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করল। শেঠিয়াজী ঘর থেকে একটু এগিয়ে যেতে জিজ্ঞেস করল, "ডাক্তারবাবু, আপনি কি অন্তর্যামী?"

উত্তর দিতে পারল না শিবনাথ। শ্যামলী ওর টেলিফোন নম্বর জানতে চাইল। টেলিফোন নেই, তাই নিজের নম্বরটা দিয়ে ওকে আবার টেলিফোন করতে অনুরোধ জানাল শ্যামলী। "আপনাকে আমার খুব দরকার, ডাক্তারবাবু।"

ওই দিনেই টেলিফোন করেছিল শিবনাথ। শ্যামলী নাছোড়বান্দা, আজকেই আসতে হবে, শ্যামলীর কাছে।

শিবনাথ যখন আবার শ্যামলী দাসের ফ্ল্যাটে পৌঁছল মিস্টার সুরেকা তখনও বিদায় নেননি। তবে বিশ্রামপর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। জামাকাপড় পরে ফিটফাট হয়ে বেরুবার জন্যে রেডি।

শ্যামলী পরিচয় করিয়ে দিল, ভূতপূর্ব বিজনেসম্যান ও বর্তমানে সমাজসেবী। বিখ্যাত সমাজসেবী হৃদয়চাঁদ সুরেকা। আগে জে-পি ছিলেন। শীঘ্র ডেপুটি মেয়র বা শেরিফ হতে পারেন।

মিস্টার সুরেকারও ক্রনিক ব্যাধি আছে। শ্যামলীর অনুরোধে নিজেকে একটু পরীক্ষা করিয়ে নিতে উৎসাহী হয়ে উঠলেন সুরেকাজী।

বিশিষ্ট রুগীকে স্টেথো দিয়ে পরীক্ষা করবার জন্যে প্রস্তুত হল শিবনাথ। ইতিমধ্যে শ্যামলী বলল, "ওষুধটা আমি খেয়ে ফেলেছি। কিন্তু যন্ত্রণাটা যেন বাড়ছে।"

চিন্তিত হয়ে উঠল শিবনাথ। প্রথমে শ্যামলীকেই সে পরীক্ষা করতে লাগল।

শ্যামলী লম্বা নিশ্বাস নিচ্ছে শিবনাথের নির্দেশ মতন, আর শিবনাথ স্টেথোর মধ্য দিয়ে শুনতে পাচ্ছে: "অ্যাদ্দিন আমার মাথা ব্যথা, মাইগ্রেইন ব্যথা কিছু ছিল না, স্রেফ কাউকে বিদায় করবার জন্যে ছাড়া ব্যথার কথা উঠত না। আজ আমার কিন্তু সত্যিই মাথা ব্যথা করছে। মিস্টার শেঠিয়া, আচমকা এসে অনিচ্ছুক ভাবে ফিরে গেলেন, কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না। লোকটাকে আমার পছন্দ হয় না, বড্ড কৃপণ, সব ব্যাপারে দরদস্তুর না করে সুখ পায় না। লোকটার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না আমি, মিস্টার সুরেকা সেদিকে অনেক দিলদরিয়া লোক। কিন্তু সুরেকাজী কি আমাকে বেশি দিন রাখবেন?"

পকেট থেকে আর একটা ডোজ বের করে দিল শিবনাথ। কাল খেয়ে নিতে হবে। শনি ও মঙ্গল ছাড়া এই তান্ত্রিক হাইডোজ চলে না।

সুরেকাজী সারাদিনের সুমধুর সান্নিধ্যে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে আছেন। জানালেন, তিনি এখন ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু করেন না। সারাক্ষণ ভগবতী ট্রাস্টের সেবা করেন—সোস্যাল ওয়ার্কার ছাড়া তাঁর অন্য কোনো পরিচয় নেই। ব্যবসা চলে গিয়েছে জামাইদের হাতে। ভগবতীদেবী যে তাঁর সদ্যপ্রয়াতা স্ত্রী তাও জানা গেল।

সুরেকাজীর রোমশ বুকে স্টেথো বসাল শিবনাথ। ঘড়-ঘড় শব্দ। তারপর শোনা গেল: "জামাইকে সামনে রেখে ব্যবসার কলকাঠি সব আমিই নাড়ছি। একটু সোস্যাল ওয়ার্ক না করলে মিনিস্টার এবং গভর্নরের

কাছে যাওয়া যায় না, বিজনেসের খুব অসুবিধা হয়। ওই শালা, শেঠিয়াজী কী ছিল? এই ক'দিনে কী হল? স্রেফ ওই মিনিস্টারের দয়ায়। শালাবাবুকে এমন কবজা করেছে।"

সুরেকাজী একটু কাশলেন। মিষ্টি হেসে বললেন, "আমার এই ভগবতী ট্রাস্টের স্বপ্ন হল মেয়েদের মঙ্গল করা। আমার ওয়াইফ চাইতেন মেয়েরা জেগে উঠুক। তাই মেয়েদের আমি সব সময় সামনে রাখছি। শ্যামলীকে আমি অ্যাডভাইসার রেখেছি, মেয়েদের প্রবলেম ওর মতন কে বুঝবে?"

লজ্জা পেল শ্যামলী। বুকে স্টেথো লাগাল শিবনাথ। স্টেথোর খবর : "শ্যামলীকে মাসে-মাসে যে টাকা দিচ্ছি সেটা নিজের পকেট থেকে দিতে হচ্ছে না, ট্রাস্ট দিচ্ছে। মেয়ে-জামাইয়েরও কোনো সন্দেহ হচ্ছে না। একটা উড়োখবর গিয়েছিল বোধ হয়—মেয়ে কান্নাকাটি করে হাঙ্গামা বাধাবার তালে ছিল। এই ভগবতী ট্রাস্ট দেখিয়ে মানসম্মান রক্ষে করা গিয়েছে।"

শ্যামলী বলল, "সুরেকাজীর বাঁ-চোখটা মাঝে-মাঝে নাচে। যন্ত্রণা নেই, কিন্তু ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেন। এখানে আসার পরে বাঁদিকে একটু মলম লাগাই, তবে চোখ নাচা কমে। আলোপ্যাথিতে এর চিকিৎসা নেই, ডাক্তারবাবু।"

শিবনাথ স্টেথো লাগাল সুরেকাজীর বুকে। ওখানকার মেসেজ : "স্রেফ ধাপ্পা, পাছে শ্যামলী বলে আজ আসবেন না। শ্যামলী আমার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলে ভালো লাগে। ওর নরম হাতটা বড় মিষ্টি। ও নিজেও খুশি হয়, ওর যত্নে আমি ভালো হয়ে যাই বলে।"

শ্যামলী এবার সুরেকাজীকে আশ্বাস দিল, "আপনার এই রোগ ডাক্তারবাবু ঝপ করে ভালো করে দেবেন। এই দেখুন না, আমার এক কপালে যন্ত্রণা সত্যিই কমে আসছে।"

শ্যামলীর মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হচ্ছে শিবনাথের। স্টেথো লাগালেই ধরা পড়বে : "শেঠিয়াজী? সুরেকাজী? কোন ঘোড়াটা আমার পক্ষে নিরাপদ!"

সুরেকাজীকে লম্বা নিশ্বাস নিতে বলে বুকের আওয়াজ শুনে খুশি হচ্ছে না শিবনাথ।

স্টেথো বলছে : "শ্যামলী চালাক মেয়ে, ভগবতী ট্রাস্টের ট্রাস্টি হতে

চাইছে। তা হলে আমি বাঁধা পড়ে যাব। তা হচ্ছে না। কাল আমি নীলিমাকে দেখতে যাব—শুনেছি ভেরি সুইট মেয়ে। ম্যারেড মহিলা—স্বামী থাকা অবস্থায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করলে অনেক হাঙ্গামা কম। তাছাড়া...”

স্টেথোটা আরও ভালোভাবে বুকে ঠেকাল শিবনাথ। একটা বেয়াড়া শব্দ আছে, ভীষণ রাগ হয়েছে মনে হচ্ছে। “তা ছাড়া শ্যামলীর ভাই আমাকে জোচ্চোর বলেছে। শ্যামলী ক্ষমা চেয়েছে, কিন্তু আমার আপিসের অন্য লোক শুনেছে। নীলিমাকে যদি পছন্দ হয়, যদি সে আগ্রহ দেখায়, তা হলে...”

“কালী করালী নাক্স ভমিকা হ্রীং ক্রীং”—প্রেসক্রিপশন দিল শিবনাথ। পকেট থেকে ওষুধ বের করল সুরেকাজীর জন্যে।

শ্যামলীর প্রশ্নের উত্তরে শিবনাথ বোঝাল, অনেক কষ্ট করে এই ওষুধ জোগাড় করতে হয়। অমাবস্যার রাতে কালীমূর্তির সামনে এই নাক্স ভমিকা ডাইলিউট করতে হয়।

সুরেকাজী এবার বিদায় নিলেন। তারপর শ্যামলী এসে ডাক্তারের সামনে বসল। শিবনাথ নিজে থেকেই বলল, “দুটো ঝুড়ি থাকলে একটা ঝুড়ি ফেলতে নেই।”

শ্যামলী অবাক। আবার জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি অন্তর্যামী?”

কোনো উত্তর দিল না শিবনাথ। এবার শ্যামলী বলল, “আমার ভাইকে একটু দেখুন দয়া করে। ওকে আপনি ভালো করে দিন ডাক্তারবাবু।”

শিবনাথ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, “কাউকে কি আপনার ভাই কটু কথা বলেছিল?”

“ওমা। আপনি জানলেন কী করে? ওকে তো অনেক কষ্ট করে সুরেকাজীর অপিসে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর একদিন মালিককেই বলে কিনা জোচ্চোর, লম্পট, হতভাগা।”

শ্যামলীর চোখে জল। “তখনই তো রোগটা ধরা পড়ল। মাথার ব্যামো—পাগলামি। অনেক কষ্টে মেন্টাল ওয়ার্ডে ঢোকানো হয়েছে। কিন্তু নিজের ভাই বলে কথা। ক'দ্দিন কষ্ট পাবে? আপনি একটা ভালো ওষুধ।...”

আজ সারাদিন শ্যামলী খবরের কাগজটা ভালো করে পড়তে পারেনি। "গেস্ট থাকলে কোনো কাজই করা যায় না ঠিকমতন!...ওমা...আজ কী ডেনজারাস খবর। আজেবাজে লোক হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঢুকে রোগী পরীক্ষা করছে! হাসপাতালগুলোকে কেউ দেখবার নেই।"

শিবনাথ ভাবল, শুধু হাসপাতাল কেন? এই দুনিয়ায় কেউ কাউকে দেখবার নেই।

শিবনাথের কথাটা এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন মনস্তাত্ত্বিক সুধাকর চ্যাটার্জি।

"জানেন মশাই, ওই শ্যামলীর রিকোয়েস্টে শিবনাথ তো মেন্টাল ওয়ার্ডে ওর ভাই মানবেন্দ্র দাশকে দেখতে গেল। ওখানে, ওই পাগল বলে কিনা 'তুমি সুরেকার কাছ থেকে আসোনি তো? লোকটা জোচ্চোর, লম্পট...মানবেন্দ্রর বুকে স্টেথো লাগিয়ে বিরাট ধাক্কা খেল শিবনাথ। স্টেথো থেকেও ওই একই কথা শোনা যাচ্ছে।...'সুরেকা জোচ্চোর, লম্পট।"

গত এক দিনের অভিজ্ঞতায় শিবনাথ ভেবেছিল, মুখের কথা আর বুকের কথা এক হয় না। আর একজন পাগল বলছিল, "আমি বাড়ি যাব না, যাব না।" তার বুকে স্টেথো লাগিয়ে শিবনাথ শুনল একই কথা · "আমি বাড়ি যাব না, যাব না।"

একটু থামলেন সুধাকর চ্যাটার্জি। জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা আপনি কী বুঝছেন?"

"অবশ্যই তাজ্জব ব্যাপার। এই ম্যাজিক বলুন, ভৌতিক বলুন, তান্ত্রিক বলুন, স্টেথোর কী অসীম সম্ভাবনা আপনি ভেবেছেন ডাক্তার চ্যাটার্জি? কোটিপতি হয়ে যাবে আপনার ওই শিবনাথ সমাদ্দার অ্যান্ড ফ্যামিলি। ইন্ডিয়াও তার সমস্ত বিদেশি মুদ্রা ঘাটতি মিটিয়ে ফেলবে ওই সুপার হাইটেক স্টেথোর জোরে। এখনই ওটা পেটেন্ট করিয়ে নিতে হবে গোপনে-গোপনে, ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবার আগে। যতদূর মনে হচ্ছে মেকানো-ইলেকট্রো কেমিকো-বায়োটেকো-তান্ত্রিকো কমবিনেশন, যা জাপানি বা জার্মানের বাপও মাথায় ঢোকাতে পারবে না। শুধু ব্যাপারটা

সুপার সিক্রেট রাখতে হবে।"

"যত দেশ তাদের প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীকে পাঠাবে আলোচনার জন্যে কৌশলে তাদের বুকে স্টেথো বসাতে হবে এবং শিবনাথবাবুর রিপোর্ট পাওয়ার পরে ওদের মন বুঝে আলোচনায় বসতে হবে। বিজনেস টাইকুনরাও ওই স্টেথো রিপোর্টের জন্যে ছটফট করবেন কঠিন বিজনেস নেগোশিয়েশনের আগে। বাজেটের আগে অর্থমন্ত্রীর বুকেও এই স্টেথো বসাতে চাইবে আড়তদার থেকে মজুতদার সবাই। ট্রেড ইউনিয়নও চাইবে এই স্টেথোর সার্ভিস—মালিক দ্বিপাক্ষিক মিটিং-এ দরদস্তুর করতে বসবার সময় কত টাকা পর্যন্ত আসলে দিতে প্রস্তুত তাও জানা যাবে।"

সুধাকর চ্যাটার্জি আমার কথা শুনছেন, আর তাঁর চোখ আরও বড় হয়ে উঠছে। আমি বললাম, "খবরের কাগজের সাংবাদিকরা তো এই স্টেথো সার্ভিস পেলে চাঁদ হাতে পাবেন। বড়-বড় লোকের বড়-বড় বক্তব্যের পাশাপাশি এই স্টেথো রিপোর্ট ছাপিয়ে কাগজের সার্কুলেশন লাখ-লাখ বাড়িয়ে ফেলতে পারবেন।"

সুধাকরের চোখ আরও বড় হচ্ছে। আমি বললাম, "এই ধরুন আই-এম-এফের কর্তার বুকে স্টেথো বসিয়ে আমরা বুঝে নিতে পারব, ওঁদের কী কী মতলব আছে। আসলে, সমস্ত আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্ক ভেঙে পড়বে। স্টেথো সব ফাঁস করে দেবে।"

আমি বললাম, "শুধু একটা মুশকিল হবে, ব্যাপারটা তো বেশিদিন চাপা থাকবে না। তখন লোকে মরে গেলেও কোনো ডাক্তারকে বুকে স্টেথো বসাতে দেবে না। সমস্ত স্টেথো নিষিদ্ধ করার দাবি উঠতে পারে ইউনাইটেড নেশনস-এ, সিকিউরিটি কাউন্সিলে।"

"আর কিছু?" সুধাকর প্রশ্ন করলেন।

আমি মাথা চুলকে বললাম, "সমস্ত সমাজব্যবস্থাই না ভেঙে পড়ে—সবাই তো সবার মনের স্টেথো রিপোর্ট পেয়ে যাবে। ঘর সংসার ভাঙবে, প্রেমে ভাঁটা পড়বে, ব্যবসা-বাণিজ্যে গোপনীয়তা বলে কিছু থাকবে না, স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সব কথা জানতে পারবে—অর্থাৎ প্রাইভেসির বিপর্যয় ঘটবে।"

সুধাকর চ্যাটার্জি ম· ন্ত করলেন, "কিন্তু আবিষ্কারকে, বিজ্ঞানকে তো

কেউ চিরদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। মানুষের ব্রেন যদি আমরা স্ক্যান করতে পারি তা হলে মনও বা স্ক্যান হবে না কেন?"

আমি বললাম, "যারা এই স্টেথো পছন্দ করবে না তারা বলতে পারে এটা এক ধরনের আড়িপাতা—টেলিফোনে আড়িপাতা থেকে সহস্র গুণ বিপজ্জনক এই স্টেথো দিয়ে আড়িপাতা।"

সুধাকরের পরবর্তী মন্তব্য : "আপনি বলছেন এই যন্ত্র পেলে ইন্ডিয়া বাজিমাত করবে, দুনিয়ার কেউ আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না?"

আমি বললাম, "পরবর্তী পদক্ষেপটা আপনি ভেবে নিন না। এখন স্টেথো বুকে বসিয়ে মনের কথা শুনতে হচ্ছে। দু'দিন পরে নিশ্চয়ই রিমোট কন্ট্রোল বেরিয়ে যাবে, মানে বুকে যন্তর না বসিয়ে বেতার স্টেথো দিয়ে আপনি অপরের মনের সব কথা শুনে নেবেন। তখন কী ভীষণ ব্যাপার হবে আপনি আন্দাজ করে নিন।"

সুধাকর চ্যাটার্জি খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। "ইস্ আপনার সঙ্গে আগে একটু কথা বললাম না কেন? শিবনাথের বৃদ্ধ বাবা সত্যশরণ সমাদ্দারের কান্না যদি দেখতেন। ছেলেকে বহু কষ্টে ওই মেন্টাল হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সারাক্ষণ সে অন্যের বুকে স্টেথো লাগাতে চাইছে। স্টেথো লাগাবার পরেই আবার উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে। বলছে, তোমাদের মনে এক মুখে আর এক কেন?"

মেন্টাল হাসপাতালে গেলেই শিবনাথ সুস্থ হয়ে উঠছে। ওখানেও সে স্টেথো লাগাচ্ছে। "কিন্তু পাগলদের নাকি মুখেও যা মনেও তা।"

দুঃখ করলেন সুধাকর। "কী সিচুয়েশন বুঝুন! একটা মানুষ পাগলদের মধ্যে সুস্থ থাকছে, আর সুস্থদের মধ্যে এলেই পাগল হয়ে যাচ্ছে, ওই একটা অপয়া স্টেথোর জন্যে।"

আমি বললাম, "শিবনাথকে সুস্থ করে ফিরিয়ে নিয়ে আসা ভীষণ প্রয়োজন। দেশের স্বার্থে, দশের স্বার্থে। পরের বছর যদি সত্যশরণবাবুর ছেলে নোবেল প্রাইজ পেয়ে যায় তা হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নয়।"

সুধাকর চ্যাটার্জির অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না, ওঁর সঙ্গেই যেতে হল মেন্টাল হাসপাতালের অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে, পাকাপাকিভাবে পাগল ডিক্লেয়ার হবার আগে যেখানে রোগীদের রাখা হয়।

সুধাকর বললেন, "প্রশ্নটা বেশ জটিল। যে-লোক পাগলদের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে অথচ তথাকথিত সুস্থ লোকের মধ্যে এলেই পাগল হয়ে যায় সে সুস্থ না অসুস্থ? দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই তান্ত্রিক হোমিওপ্যাথিটা জিনিয়াসের লক্ষণ না পাগলের লক্ষণ? বড়-বড় চিন্তাবীর ও আবিষ্কারকদের পৃথিবীর লোক প্রথমে পাগল বলেছে।"

প্রথম প্রশ্নটি জটিল। দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর আমি ডাক্তার ভোলানাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা না করে বলতে পারব না। পৃথিবীতে কতকগুলো জিনিসের সমন্বয় হয়, কতকগুলো জিনিসের সমন্বয় বা সহাবস্থান সম্ভব নয়—যেমন সত্য ও মিথ্যা, আলো ও অন্ধকার, ভালোবাসা ও ঘৃণা, ন্যায় ও অন্যায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ওই রোগীটির খবর কী? শ্যামলী দাসের ভাই মানবেন্দ্র দাশ না কী নাম? যাকে চিকিৎসা করতে এসে শিবনাথের এই অবস্থা হল।"

"আছে। ওইখানেই আছে। দু'জনে খুব ভাব হয়েছে, কেউ নাকি কাউকে ছাড়তে চাইছে না।" সুধাকর বললেন।

হাসপাতালের দরজার গোড়ায় এসে আমি বললাম, "আপনার এখন মস্ত দায়িত্ব সুধাকরবাবু। দেশের কথা ভেবে, নোবেল প্রাইজের কথা ভেবে আপনাকে ওই শিবনাথ সমাদ্দারকে বের করে আনতে হবে এবং সেই সঙ্গে ওই দুর্লভ স্টেথোসকোপটা, ওর পুরো হিসট্রিও আপনাকে তৈরি রাখতে হবে। ইনক্লুডিং শিবনাথের দাদুর বাবা দুঃখহরণ সমাদ্দার কার কাছে তন্ত্রসাধনা করছিলেন, এবং কেনই বা তিনি এই স্টেথো গলায় রেখে মারা গেলেন। অদ্ভুত কিছু ঘটেছিল কি না সেই সময়ে?"

আমি বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সুধাকর চ্যাটার্জি মেন্টাল হাসপাতালের ভিতর ঢুকে গেলেন। একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে তিনি বললেন, "আপনি আসুন এখনই। স্টেথোটা ওর কাছে দেখতে পাচ্ছি না।"

আমি গিয়ে দেখি একটা ঘরের মধ্যে শিবনাথ সমাদ্দার ও তার রোগী মানবেন্দ্র দাশ গলা জড়াজড়ি করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। মুখে তাদের কোনো উদ্বেগের চিহ্ন নেই। কিন্তু শিবনাথের সমস্ত গায়ে ছোট-ছোট আঘাতের চিহ্ন। কিছুটা রক্ত বেরিয়েছে।

সুধাকরকে দেখে শিবনাথ খোসমেজাজে বলছে, "বাঁদর এসেছিল একটা। বাঁদরটা দাঁত খিঁচোচ্ছিল। মানবেন্দ্র মতলব দিল, ওর বুকটা একবার পরীক্ষা করে দেখো। যেমন, আমি ওই বাঁচরের বুকে স্টেথোটা লাগিয়েছি অমনি ভীষণ রেগে গেল বাঁদরটা। আমাকে থাপ্পড় মেরে আঁচড়ে দিয়ে স্টেথোটা নিয়ে লাফ মেরে চলে গেল। আর পাত্তা নেই বাঁদরটার। যদি কাল আসে ফেরত দেয় স্টেথোটা ভালো কথা।"

"আর যদি না দেয়!" কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে বলে উঠলেন সুধাকর চ্যাটার্জি।

শিবনাথের বাবা সত্যশরণ সমাদ্দার কাছাকাছি ছিলেন। তিনি বললেন, "ওই তান্ত্রিক স্টেথোটা থেকেই আমার ছেলের অসুখটা বেড়ে গেল। কাল আবার কাঁটাতলা থানা থেকে পুলিশ এসেছিল। বাঁদরটা আর ওই স্টেথোটা না-ফেরাই ভালো ডাক্তারবাবু, আমার ছেলেটা তা হলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারবে।"

যাদের নিয়ে এতো সব আলোচনা, সেই শিবনাথ সমাদ্দারের কিন্তু কোনো খেয়ালই নেই। মানবেন্দ্র দাশের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে দু'জনে নিজের খেয়ালে মনের আনন্দে হেসেই চলল। আমার দিকে তারা আর তাকাল না।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত

হরিহরের জীবনে এখন প্রচণ্ড ক্রাইসিস। যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো অঘটন ঘটতে পারে। বিবাহ বিচ্ছেদ, আত্মহনন, খুন জখম কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু নাটকীয় এই দ্বিতীয় পর্বে পৌঁছতে গেলে প্রথম পর্বটাও জানা প্রয়োজন।

একেবারে আদি থেকেই শুরু করা যাক। হরিহর ও শকুন্তলার জীবনকাহিনির প্রথম পর্বটা অনেকটা রূপকথার মতোই মধুর। আমাদের এই অর্ডিনারি লাইফে একজন পুরুষ ও একজন আধুনিকা মহিলার এর থেকে মিলনাত্মক পরিণতির কথা সিনেমার ডাকসাইটে চিত্রনাট্যকারও ভাবতে পারবেন না। ইন ফ্যাক্ট, হরিহরের বন্ধু তরুণ চলচ্চিত্রকার দিগন্ত সিনহা বলেছিল, "তোদের দু'জনের লাইফকে একটু এদিক-ওদিক করে নিয়ে কর্মজীবনের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ছবি করলে বক্স অফিস হিট হতে বাধ্য।

"মফস্বলে ছবিটা ফ্লপ হবে, ওখানে কেউ অফিস-টফিস নিয়ে মাথা ঘামায় না", উত্তর দিয়েছিল হরিহর হালদার।

"একদম ভুল ধারণা। এখন অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়েরাও ওয়ার্কিং গার্লদের চোখের সামনে দেখতে চাইছে—স্রেফ বেডরুম, রান্নাঘর এবং ঠাকুরঘরের সিন দেখে-দেখে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে", বলেছিল দূরদর্শী দিগন্ত সিন্‌হা।

"মফস্বলের মেয়েরা কী চাইছে তা তোমরা জানতে পারো কী করে?" ইয়ং এবং অনুসন্ধিৎসু হরিহর প্রশ্ন করেছিল।

দিগন্ত সিন্‌হাও একসময় বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছিল। তার ঝটপট উত্তর : "যেভাবে তোমরা কোম্পানিতে খরিদ্দারের মন জানতে পারো নিজের চেয়ারে বসে থেকেও। বাজার সংক্রান্ত গবেষণা বা মার্কেট রিসার্চ—অকুস্থলে দূত পাঠিয়ে তাদের মাধ্যমে খোঁজখবর নেওয়া।"

এই মার্কেট গবেষণার জোরেই দিগন্ত সিন্‌হা বলতে পারছে, "হরিহরের মতো একজন তরুণ এম-বি-এ এবং শকুন্তলার মতো একজন মহিলাকর্মীর পারস্পরিক সম্পর্কের গল্পটা সিনেমায় জমে উঠবে এবং মফস্বলের মহিলাদেরও হৃদয়হরণ করবে।"

"বহু ইংরিজি ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত বইপড়া হরিহরের প্রশ্ন : "কিন্তু আইডেনটিটি? গ্রামের বধূ অথবা মফস্বলের মহিলা কী করে শকুন্তলার মতো মেয়ের সঙ্গে অফিস পরিবেশে একাত্মতা অনুভব করবেন?"

দিগন্ত সিন্‌হা বলেছিল, "রূপকথার মানসিকতায়—অচিন দেশের রাজকুমারীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁরা যেভাবে নিজেদের জড়িয়ে নেন। আরও একটা সুবিধে আছে তোমাদের গল্পে—শকুন্তলার শিকড়টা আমাদের খুব কাজে দেবে।"

"তুমি ওর বাঁশবেড়িয়া ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা বলছ? বাঁশবেড়িয়ার মেয়ে কলকাতায় এল, হোস্টেলে থাকল, টাইপিং-স্টেনোগ্রাফি আয়ত্ত করল, তারপর হইচই করে একদিন আমাদের এই হাইটেক কোম্পানিতে জয়েন করে ঝড় তুলল—এসবই তুমি গাঁয়ের মেয়ের গল্প বলে চালিয়ে দিতে পারবে বলছ?"

দিগন্ত সিন্‌হা বলেছিল, "চিত্রনাট্য করাটা খুবই সহজ হবে। প্রথম দৃশ্যে লেডিজ সিটে বসে তুমি পরমসুখে ম্যানেজমেন্ট ম্যাগাজিন পড়ছ। একটি মেয়ে বিরক্তভাবেই বলল উঠুন উঠুন। তোমাকে উঠিয়ে সে লেডিজ সিটে বসে পড়ে একটা মেয়েলি ম্যাগাজিন পড়া শুরু করল। এই দৃশ্যে আমি নারী স্বাধীনতার প্রতি আমাদের চাপা অনুরাগ প্রকাশ করলাম—মেয়েরা খুশি হল।

"তারপরের দৃশ্যেই দেখাচ্ছি, তুমি অফিস ঘরে বিপুল-বিক্রমে রাজত্ব করছ, আর সেই মেয়েটিকেই তোমার পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট থেকে পাঠিয়েছে তোমার সেক্রেটারির কাজ করার জন্যে। জমে যাবে। বুঝলে হরিহর। তুমি যেভাবে সেদিনের বর্ণনা দিয়েছিলে সেভাবেই দৃশ্যটা টেক করব। শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে তুমিও অবাক এবং সেও অপ্রস্তুত। তুমি এবার একটু মজা পাচ্ছো মনে-মনে, কিন্তু এই অনুভূতিটা খুব প্রকট হবে না, কারণ শহরের প্রগতিবাদিনীরা ভাববে তুমি পুরুষমানুষের সুপিরিয়রিটি

দেখাচ্ছ—সুযোগ সুবিধে পেলে ওই শকুন্তলাও তোমার পোস্টে বসতে পারত।"

"সুপিরিয়রিটি দেখালে কই? যিনি নায়ক তিনিও তো ট্রামের সাধারণ যাত্রী, মার্সেডিজ গাড়ি চড়ে তিনি তো নায়িকাকে রাস্তায় অবজ্ঞা করে অফিসে চলে আসেননি, যেমন দেখানো হয় বম্বের রঙিন ছবিতে।"

"এটা তো গেল ব্যাখ্যার ব্যাপার। বাংলা সিনেমায় ওই সুযোগ তুমি পাবে কোথায়? মেয়েরা হল্-এ বসে প্রথম দফায় যা ভেবে নিল তাই তোমার কাছে সুপ্রিম কোর্টের রায়। আমাকে তাই দেখাতে হবে, ওই লেডিজ সিট থেকে তুলে দেওয়ার ব্যাপারটা যেন তোমার মনেই নেই, অথচ শকুন্তলা ভাবছে তুমি হয়তো প্রতিহিংসা দেখাবে। ইংরিজি ছবি হলে, ওই পয়েন্টে ছোটখাট একটা আলোচনা হয়ে ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যেত, কিন্তু এ-দেশে কোনো সন্দেহের নিরসন হোক এটা মানুষ চায় না, তুমিই তো বলে থাকো।"

হয়তো এদেশের সব মেয়েই এই দৃশ্যে শকুন্তলার পক্ষে। লেডিজ সিটে হরিহরের ঐভাবে বসবার কী দরকার ছিল? চলন্ত ট্রাম ম্যাগাজিন পড়বার শ্রেষ্ঠস্থান নয়। আর ম্যাগাজিনের আড়ালে মুখ লুকিয়ে লেডিজ সিটের আসন অধিকারিণীদের দেখতে না-পাওয়াটা একটা পুরনো পুরুষালি কায়দা, যা মেয়েদের এখন জানা হয়ে গিয়েছে। ফলে তাদের ঝাঁঝাল গলা শুনতে হয়। অনিচ্ছুক পুরুষদের গদিচ্যুত হতে দেখলে আধুনিকারা স্যাটিসফ্যাকশন পায়—পরিতৃপ্তির রসায়ন বড় জটিল।

কিন্তু দিগন্ত সিন্‌হা জানে না, হরিহরের দিদিমা ব্যাপারটায় মোটেই খুশি হননি। নাতির কাছে মন্তব্য করেছিলেন, "কোমর বেঁধে, পায়ে পা দিয়ে যে-মেয়ে ট্রামে-বাসে পুরুষমানুষের সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে অফিসে দয়া দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই।"

হরিহর তখন অবশ্যই আজকের, অর্থাৎ আমাদের এই গল্পের দ্বিতীয় পর্বের মানসিকতায় ছিল না। সে বলেছিল, 'মাই ডার্লিং দিদু, মেয়েটা কোমর বাঁধবার এবং পায়ে পা দেবার চান্স পাবে কী করে? তবে কটমট করে তাকিয়েছিল।"

দিদুকে সেদিন হরিহর আরও যা বোঝাতে চেয়েছিল—"অফিসে

কোনো মেয়ের প্রতি দয়া দেখাবার বিন্দুমাত্র স্কোপ নেই। নিজের জোরে পার্সোনেল বিভাগের পরীক্ষার হার্ডল-রেসে জিতে শকুন্তলা এসেছে আমার ডিপার্টমেন্টে পোস্টিং-এর জন্যে।" একখানা চিঠি ডিকটেশন দিয়েছে হরিহর। তড়িৎগতিতে সুন্দর সাজিয়ে নির্ভুলভাবে টাইপ করেছে শকুন্তলা সান্যাল।

হরিহর হালদার তখনকার মতো ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখতে পারত—ছুতোও ছিল, হরিহর তখনই চেম্বারের মিটিং-এ যাচ্ছিল। কিন্তু কুইক ডিসিশন নেবার অনিচ্ছাই এই জাতটাকে একশো বছর পিছিয়ে রেখেছে। হরিহর মানসনেত্রে ডিসিশন তালিকাটি দেখতে পেল—তার সামনে দুটি পথ। একনম্বর : শকুন্তলা সান্যালকে অমনোনীত করা। দু'নম্বর : শকুন্তলাকে জানানো তিনি এইখানেই কাজ করবেন। পথেঘাটে সামান্য কী ঘটে গিয়েছে তার জন্যে অফিসের সিদ্ধান্ত নড়চড় হয় না।

এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা শকুন্তলা নিজেও শুনেছিল। এবং কুইক সিদ্ধান্ত নেবার এই প্রবল ইচ্ছার জন্যে নাম দিয়েছিল হরিহর সিদ্ধান্তবাগীশ। ব্যাপারটা অবশ্য তখন হরিহরের কানে আসেনি। এলে হয়তো পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ অন্যদিকে মোড় নিত। ব্যাপারটা শকুন্তলা অন্যত্র প্রকাশ করেছিল, এবং রত্না দত্ত সেবার মরিয়া হয়ে হরিহরকে বলেছিল, "আপনি জানেন আপনাকে কী নাম দিয়েছিল? আপনি যে-কোনো পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেন না, কোনো সমস্যাকে দূরে সরিয়ে রাখেন না, সুতরাং অ্যাডমায়ার করে আপনার নাম দিতে পারত মিস্টার কুইক ডিসিশন অথবা মিস্টার ডিসিশন মেকার। তা নয় কি না বাংলায় সিদ্ধান্তবাগীশ!"

রত্না দত্ত যা বোঝাতে চেয়েছিল, এর মধ্যে চাপা ব্যঙ্গ রয়েছে। শকুন্তলা সান্যালের ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে হরিহর যেভাবে সিদ্ধান্ত নেয় তা তার সেক্রেটারি পছন্দ করে না।

রত্না দত্ত মেয়েটিকেও খুব ভালো লাগত হরিহরের। দু'জনে কয়েকবার একই ট্রামে ডালহৌসি থেকে পার্কসার্কাস গিয়েছে। একবার সিনেমা হল্-এও দু'জনের দেখা হয়েছে। মডার্ন বাঙালি মেয়ে বলতে যা বোঝায়—ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সুখপ্রদ সমন্বয়, নিজের অধিকার সম্বন্ধে

বিন্দুমাত্র ব্যগ্রতা নেই, অথচ নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সারাক্ষণ সজাগ। কিন্তু একটু বোকামি করে বসে আছে, বাড়িতে রেকর্ড করা নিজের কয়েকটা গানের একটা ক্যাসেট হরিহরকে উপহার দিয়েছে। গানগুলো রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু মানেগুলো যেন কেমন! দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত ধরনে এক অর্থ, দেবতার জায়গায় অন্য কাউকে বসালে অন্য মানে। সাধে কি আর বাঘা-বাঘা সায়েবরা বিরূপ হয়ে বলেছেন, এ-দেশের মানুষদের বোঝা শক্ত, এদের সবকথার একাধিক অর্থ!

রত্না দত্তর মন্তব্যের আলোকে হরিহর তখনই শকুন্তলা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছে। রত্না দত্তর মন্তব্যে কি ঈর্ষা রয়েছে? সংস্কৃত সাহিত্যে এক শ্রেণির রমণীর উল্লেখ রয়েছে যারা অপ্রিয়ভাষণের মাধ্যমে প্রিয়জনের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে। তাছাড়া সিদ্ধান্তবাগীশ শব্দটি বংশবাটী অঞ্চলে এখনও হয়তো শ্রদ্ধাবাচক।

হরিহর-শকুন্তলা কাহিনির প্রথম পর্বের সবক'টি ঘটনাই দিগন্ত সিন্‌হার ভালোভাবে জানা। দিগন্ত বলেছিল, "ব্যাপারটা সব মিলিয়ে খুবই সুইট। বাঙালি মেয়েরা ঠিক যেমনটি চায়। একটু মডার্ন বোতল, কিন্তু ভিতরের তরল পদার্থটি চিরন্তন। অফিসের তরুণ সায়েব এবং তাঁর একান্ত সহকারিণীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান। অথচ সর্বত্র আধুনিকতার ছোঁয়াচ। সেই সঙ্গে একটু নারী স্বাধীনতার নমুনা। মেয়েরা হাজার-হাজার বছরের পরনির্ভরতা বিসর্জন দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে—নতুন পরিবেশে তারা মন্দ করছে না। তারা ভালো রোজগার করছে।"

হরিহরের মনে পড়ছে, পরের দিনের কথা। দিদিমাকে সে বলেছিল, "তুমি কিছু ভেবো না। যদি দেখি ট্রামের সেই স্বভাব বদলায়নি তা হলে আবার একটা ডিসিশন নিয়ে ফেলব। শকুন্তলা সান্যালকে ফেরত পাঠিয়ে দেব—ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন। জানো দিদিমা, ড্রকার সায়েব বলেছেন, জীবনটা হচ্ছে একের পর এক সিদ্ধান্তের মালা।"

দিদিমা মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। "ও মা! এতো ম্লেচ্ছদের কথা হলো! জীবনের সবটাই তো ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। মানুষ তো নিমিত্ত মাত্র।"

"মাই ডিয়ার দিদিমা, ওপরওয়ালার ঘাড়ে সব সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব

চাপিয়ে দিয়েই তো আমাদের এই সর্বনাশ হয়েছে। আমরা বাড়িতে হিন্দু, অফিসে ম্লেচ্ছ।"

হরিহরের আরও মনে পড়েছে, দিদিমা বিশ্বাস করেননি নাতিকে। তবে আদর করে চুমু খেয়েছিলেন। বলেছিলেন, "হালদার বংশের ছেলে তুমি, সময় হলেই সব বুঝবে।"

সেবার বিকেলে অফিসে ফিরে এসে হরিহর অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার ঘরের এবং টেবিলের অবস্থা পাল্টে গিয়েছে। ছোট্ট অফিসটা ঝকঝক করছে। মাথার ওপর টাঙানো বাঁকা ছবিটা সোজা হয়েছে। অফিসের রঙিন ক্যালেন্ডারটা যথাস্থানে শোভা পাচ্ছে। টেবিলের বাড়তি কাগজপত্র সব ফাইলস্থ হয়েছে। সমস্তদিন অনুপস্থিতির সময় কে কে কখন কোথা থেকে কী কারণে টেলিফোন করেছিল তার তালিকা চমৎকার হস্তাক্ষরে একটি কাগজে লেখা রয়েছে। এই অফিসে এতদিন নিপুণতা ছিল, কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না। শকুন্তলা সান্যাল বসন্তের হাওয়ার মতো তা এই অফিসে নিয়ে এসেছে।

এই সব শিক্ষা কোথায় পেল শকুন্তলা? পুরনো অফিসে। মিস্টার ভট্টাচার্য অত্যন্ত সাজানো-গোছানো লোক ছিলেন। সব কিছু যত্ন করে শিখিয়েছেন শকুন্তলাকে। অফিসটা নাম-করা। মাইনে ভালো, মিস্টার ভট্টাচার্য এত যত্ন নিয়েছেন, তবু চাকরি পরিবর্তন কেন?

হরিহর সঙ্গে-সঙ্গে হিসেব করে নিয়েছে, কোন-কোন কারণে মেয়েরা ভালো অফিসে চাকরি ছাড়বার সিদ্ধান্ত নেয়? মিস্টার ভট্টাচার্যের বয়স কত? তাঁর বৈবাহিক স্ট্যাটাস কী? যদি মিস্টার ভট্টাচার্য সম্বন্ধে কোনো খারাপ ধারণা থাকত তা হলে শকুন্তলা নিশ্চয় এইভাবে তাঁর প্রশংসা করত না।

এর বেশি জানবার ইচ্ছে হলেও সব সময় জানতে চাওয়া যায় না। পরে অবশ্য শকুন্তলাই একদিন বলল। ভদ্রলোক কোরাপসান চার্জে পড়ে গেলেন। অমন সুন্দর লোক যে অমনভাবে ঘুষ নিতে পারেন তা শকুন্তলা জানবে কী করে? বড়সায়েবের পাতা ফাঁদে মিস্টার ভট্টাচার্য ধরা পড়লেন, অফিসে বসে টাকার বান্ডিল ব্যাগে পুরতে গিয়ে। তারপর কত ধরনের এনকোয়ারি, সমস্ত ফাইল নিয়ে কতবার টানাটানি। ব্যাপারটা ভালো লাগল না, শকুন্তলা পালিয়ে বাঁচতে চাইল।

শকুন্তলার মুখে গল্পটা শুনতে-শুনতে হরিহর বলেছিল, "নেগেটিভ ভাবে দেখছেন কেন? বলুন, আপনি অন্যত্র চাকরি খোঁজবার সিদ্ধান্ত নিলেন।"

দিগন্ত সিন্‌হা পরে রসিকতা করেছিল, "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তই বলতে হবে! না-হলে হরিহর ও শকুন্তলার পরিচয় ঘটবে কী করে?"

হরিহরের উত্তর : "তুমি বোঝাতে চাইছ আমরা সবাই ভবিতব্যের দাস! কিন্তু আসলে, বিশ্বসংসারটা চলছে অসংখ্য ডিসিশনের চেইন রিঅ্যাকশনে সিদ্ধান্তের উৎপত্তি অপরিহার্য হয়ে উঠছে। এইভাবেই তুমি ঘটনাপ্রবাহকে নিজের পরিকল্পনা মতো পরিবর্তিত করতে পারো, না-হলে নিজেই তুমি পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে যাবে।"

চমৎকার কয়েকটি মাস গায়ে বসন্তের হাওয়া লাগিয়ে এইভাবে কেটে গিয়েছে। হরিহর আবিষ্কার করেছে, আগে মাঝে-মাঝে অফিসে ডুব দেবার সিদ্ধান্ত নিতে লোভ হতো, শকুন্তলা সান্যাল আসবার পরে তার আর হয় না। শকুন্তলা সান্যাল দু'দিনের জন্যে অফিস কামাই করেছিল, তখন হরিহরের কাজকর্ম শ্লথগতি হয়েছিল। যদিও রত্না দত্ত সেই সময়ে খোঁজখবর নিয়ে গিয়েছে। বলেছে, খুব আর্জেন্ট কিছু থাকলে বলবেন, করে দেব। মিস্টার স্যামুয়েলকে না-জানিয়ে তার সেক্রেটারিকে কাজ দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু রত্না দত্ত বুঝিয়ে দিয়েছে, হরিহর ইজ এ স্পেশাল পার্সন। এর সঙ্গে অফিসি কানুনের কোনো সম্পর্ক নেই।

শকুন্তলা সান্যাল দু'দিন পরে অফিসে ফিরে এসে যখন শুনল তার অনুপস্থিতিতে ইয়ং হরিহরের 'ভীষণ' অসুবিধা হয়নি তখন মেজাজটা একটু খারাপ হল। অভিমানে তার মন ভরে উঠল। তার ওপর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে, হরিহর বলে বসল, "আরও একদিন ছুটি নিয়ে শরীরটা সম্পূর্ণ সুস্থ করে এলেন না কেন?"

সরল মনেই বলেছে হরিহর, কিন্তু সন্দেহবিষে জর্জরিত শকুন্তলা 'অন্য অর্থ করে বসে আছে। 'তাহলে রত্না দত্তকে এই ডিপার্টমেন্টে পাকাপাকি বদলি করার মতলবটা হাসিল করা যায়!' তা হচ্ছে না কিছুতেই, দরকার হলে হাসপাতাল থেকে রিস্ক বন্ডে রিলিজ নিয়ে শকুন্তলা অফিসে চলে আসত।

এদিকে তরুণ ও এলিজেব্‌ল ব্যাচেলর হরিহর নিজের ঘরে বসে পরবর্তী রণকৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। কিন্তু তার আগে সে ভাবছে, ইংরিজি এলিজেব্‌ল ব্যাচেলর কথাটার বাংলা তর্জমা কী হতে পারে? একটা ভদ্রস্থ টার্ম মনে আসছে না। দিদিমা যা বলেছিলেন—'সমর্থ আইবুড়ো' হয়ে আর কতদিন ঘুরবি?—মনে পড়ছে। মানে হয়তো এক কিন্তু ঠিক পাতে দেওয়া যায় না। কাগজে একবার লিখেছিল, 'বিবাহযোগ্য যুবকবৃন্দ মেলামেশার সুযোগের অভাবে যোগ্যাপাত্রী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাই পণপ্রথার বন্ধন শিথিল হচ্ছে না।' কিন্তু এটাও ঠিক হরিহর হালদারের মতো ইয়ংম্যানকে মানায় না—আসলে সর্ববিষয়ে সুযোগ্য যুবক, যে বিবাহেরও উপযুক্ত।

কিন্তু শকুন্তলা এসব ভাবনার অংশীদার হোক তা এই মুহূর্তে মোটেই কাম্য নয়। অনুপস্থিতির দু'দিন কাজের স্রোত বন্ধ না-হলেও, হরিহরের মন অকারণ শূন্যতায় ভরে উঠেছে। কিন্তু এ-খবর কোনোরকমেই ফাঁস না-করার ম্যানেজমেন্ট-সিদ্ধান্ত নিয়েছে হরিহর। ম্যানেজমেন্ট চায়, কারুর যেন এই ধারণা না-হয় যে সে এই প্রতিষ্ঠানে অপরিহার্য। কর্মীরা হচ্ছে কোম্পানিবৃক্ষের পাতার মতো, সম্মিলিতভাবে যার মূল্য আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কেউ মহামূল্যবান নয়।

শকুন্তলা-হরিহর সাক্ষাৎকারের সময় দুই পক্ষ দুই বিষয়ে সংবাদসংগ্রহে আগ্রহী। হরিহর দু'দিনের শূন্যতার কথা সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "গলা ব্যথা, জ্বর—টনসিলের প্রবলেম নেই তো?" বন্ধু দিগন্ত সিন্‌হার মুখে সে শুনছে, অনেক মিষ্টিমেয়ের এই টনসিল প্রবলেম থাকে। কুমারী পর্যায়ে শুনতে রোমান্টিক, কিন্তু গার্হস্থ্য পর্বে প্রায়ই শয্যাশায়িনী। দিগন্ত নিজেই তার জীবনসঙ্গিনীকে নিয়ে এই সমস্যায় ভুগছে, বন্ধুমহলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হোক তা সে চায় না।

টনসিলের প্রসঙ্গে সরল মনে হেসে উঠল শকুন্তলা, "আমার বড় মামা ই-এন-টির মস্ত ডাক্তার!" "আর বলতে হবে না, বুঝে নিয়েছি।" বিখ্যাত ই-এন-টি মামারা ভাগ্নীদের গলায় এইসব সমস্যা পরিণত বয়স পর্যন্ত পুষে রাখেন না।

কিন্তু যা ভীষণভাবে আঘাত দিয়েছে শকুন্তলাকে তা হল মিস্টার

হালদার একবারও তার অনুপস্থিতি ফিল করেননি।

এর পরেই আবার অসাবধানতাবশত রত্না দত্তর গানের টেপের কথা উঠেছে। টেপ করলেই যে গাইয়ে হওয়া যায় না, এই নির্মল সত্যটুকু শকুন্তলা বাধ্য হয়েই শুনিয়ে দিয়েছে হরিহর হালদারকে। সেই সঙ্গে হরিহরও শুনেছে, একটু-আধটু গান শকুন্তলাও গাইতে জানে। দু'একটা মেডেল এখনও তার কাছে আছে। তবে নিজেকে টেপে বন্দী করার স্টাইল শকুন্তলা দেখাতে রাজি নয়।

অর্থাৎ...হরিহর যথাসময়ে রত্না দত্ত ও শকুন্তলা সান্যালের মূল্যায়ন শুরু করেছে একটি কার্ডের দুইটি স্তম্ভে :

রত্না		শকুন্তলা
বয়স	২২	২৩
উচ্চতা	৫' ৩''	৫' ৪''
শিক্ষা	কনভেন্ট শিক্ষিতা	বি এ
গাত্রবর্ণ	উজ্জ্বল শ্যাম	একটু ফর্সার দিকে
ব্যক্তিত্ব	বন্ধুত্বপূর্ণ	লাজুক, কখনও মেঘ, কখনও রোদ
সঙ্গীত	টেপ	নো টেপ
স্বাস্থ্য	একদিনও কামাই নেই	দু'দিন অনুপস্থিত

আরও অনেক পয়েন্ট ক্রমশ লিখে যেতে হবে, তাই কার্ডখানা সযত্নে নিজের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছে হরিহর, এইভাবে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট বিশ্লেষণ না করে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে চায় না সে। সেই শিক্ষাই সে পেয়েছে ইনস্টিটিউটে।

তারপর ব্যাপারটা কিছু দ্রুত ঘটে গিয়েছে। বন্ধু দিগন্ত সিন্‌হা বলে, "এই মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটা অনেক ডিরেক্টর দীর্ঘসময় ধরে ঝুলিয়ে রাখেন। প্রথমে চাপা অনুরাগ, তারপর মাঝে-মাঝে ঝকঝকে প্রকাশ, তারপর একটি মাত্র পুরস্কারের জন্যে দুই নারীর টাগ-অফ-ওয়ার, ইতিমধ্যে খল নায়কের আবির্ভাব, নানা বিপদের উৎপত্তি, সাময়িক বিচ্ছেদ, সাময়িক দুঃখ এবং অবশেষে শেষদৃশ্যে পুনর্মিলন।"

হরিহরকে দিগন্ত বলেছে, "তোমার ব্যাপারটা খুব সহজ—একটা মিষ্টি

ছোটগল্পের মতন। তুমি রত্না দত্ত অথবা শকুন্তলা সান্যাল এই সিদ্ধান্তটা কোল্ডস্টোরেজে ঠেলে দিয়ে আরও একটু সময় নিতে চাইছিলে। রত্নার ওই গানের টেপটাই ওর বিরুদ্ধে যাচ্ছিল। গানগুলো বাড়িতে নিজের যন্ত্রে শুনে তুমি সুখ পাচ্ছিলে না, মাঝে-মাঝে বেসুরো ঠেকলেই বন্ধ করে দিচ্ছিলে। কিন্তু তুমি ভয় পাচ্ছিলে এইভাবে যখন-তখন টেপ বন্ধ করে দেবার স্বাধীনতা তোমার চিরদিন থাকবে কি? তুমি আর টেপ করবে না, এই শর্তে কোনো মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করা যায় না।"

দিগন্ত সত্যিই যে-কোনো ঘটনার সুন্দর সামারি করে। সে বলেছে, "তোমার টেলিফোনটাই তোমাকে বিপদে ফেলে দিল। প্রায়ই অজিত ঘোষ বলে একটি যুবকের টেলিফোন আসতে লাগল শকুন্তলার জন্যে। অজিত ঘোষ এবং শকুন্তলাকে একদিন তুমি স্কুটারে যেতে দেখেছ। তাতেও তুমি দমতে না। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে—তোমার প্রদর্শিত পথে শকুন্তলা একখানা কার্ড তৈরি করেছে। তাতে তোমার ও অজিত ঘোষের তুলনামূলক বিবরণ লেখা হয়েছে। সেই কার্ড দেখে তোমার মাথায় হাত দেওয়ার অবস্থা! তোমার ভয় হচ্ছে, প্রায় সব পয়েন্টেই তুমি ওই অজিত ঘোষের থেকে কম নম্বর পেতে চলেছ!"

"কিছু আসে যায় না তাতে। তোমার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন এম-বি-এ ব্যাচেলরকে জামাই করবার জন্যে অনেক বাড়িতে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। কিন্তু তুমি জিনিসটাকে অন্যভাবে নিলে। তুমি জীবনের কোনো প্রতিযোগিতায় হার মানতে রাজি নও। অজিত ঘোষ বলে কোথাকার কে একটা লোক তোমাকে হারিয়ে দেবে তা ভাবা যায় না। অতএব তুমি আচমকা প্রস্তাবের ক্যাচ তুলেছ এবং সজাগ শকুন্তলাও সে ক্যাচ সঙ্গে-সঙ্গে লুফে নিয়েছে। অজিত ঘোষ কোনো আঘাত হানবার আগেই তড়িৎগতিতে ডিসিশন নিয়ে ফেলেছ হরিহর।"

এর জন্য অবশ্য শকুন্তলাকে মূল্যও দিতে হয়েছে। চাকরিটা! অফিসে কারও সঙ্গে প্রণয় ভালো চোখে দেখা হয় না। তাই জলঘোলা হবার আগেই শকুন্তলা চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, এবং আরও কয়েকমাস পরে বিয়ের কার্ড ছাপার পর ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে। অফিসের মেজকর্তা যথাসময়ে হরিহরকে ডেকে বলেছেন, "তুমি ব্যাপারটা মর্যাদার সঙ্গে

ভালোভাবেই ম্যানেজ করেছ—আমার কোনো সমস্যা বাড়াওনি।"

দেখা হলো ; মন নিয়ে একটু পিংপং খেলা হলো ; বিয়ে হয়ে গেল—চমৎকার মিষ্টি একটা গল্প। কিন্তু বিয়েতেই স্টোরিটা শেষ করতে চায় না দিগন্ত সিন্‌হা। বিয়ের তিন মাস পরেই—নিজের স্বামীকে শকুন্তলা নমিনেট করল 'হাজবেন্ড অফ দ্য ইয়ার' প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতায় সব সাবজেক্টে নম্বর বসায় স্ত্রীরা। বিপুলবিক্রমে প্রথম হবার বিরল সম্মান লাভ করল হরিহর। হরিহরের মাথায় মুকুট পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং শকুন্তলা তা সগর্বে দেখছে এইখানেই ফেড আউট করবে দিগন্ত সিন্‌হা। হাজার হোক আধুনিকা মেয়ের গল্প তো।

এইখানেই গল্প শেষ হতে পারত। যদিও হরিহরের দিদিমার ইচ্ছা আরও একটা পর্ব যোগ হোক। নাতবউয়ের কোলে একটি শিশুকে উপস্থাপিত না দেখে তিনি এই মরদেহ ত্যাগে উৎসাহী নন। কিন্তু এই 'ওষুধপালার' যুগে কে তাঁর মতো বৃদ্ধার ইচ্ছাপূরণ করবার জন্য উদ্যমী হবে?

দিগন্ত সিন্‌হা তার চলচ্চিত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে যাই বলুক, আমাদের এই ছোটগল্প হরিহর-শকুন্তলার জীবনপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে।

হরিহর এখনও অফিসের কেষ্টবিষ্টু হয়নি। গাড়ি কেনার কথাই ওঠে না। স্কুটার কেনার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু বিবাহের তৃতীয় রাত্রিতেই শকুন্তলা সে-প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিল। সে এখন স্বামীর দৈহিক নিরাপত্তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়। অজিত ঘোষের স্কুটারে পিলিয়ন রাইডার শকুন্তলার দৃশ্যটি হরিহর বিস্মৃত হয়নি, কিন্তু মধুযামিনীর রাত্রে এইসব বিষয় অবশ্যই আলোচনাযোগ্য নয়। তাছাড়া রত্না দত্ত সংক্রান্ত বিষয়ে প্রত্যাঘাত আসতে কতক্ষণ? একটি মাত্র সুখবর, অফিসে জোর গুজব রত্না দত্ত ওই অজিত ঘোষকেই বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভালো ডিসিশন, হরিহর মনেপ্রাণে সমর্থন জানাচ্ছে। অজিত ঘোষ স্কুটারে চড়ে যতখুশি রত্না দত্তর বেসুরো গানের ক্যাসেট শুনুক, যা আনন্দের, শকুন্তলা এখন তার নিজস্ব। হরিহরের আশা, অফিসে যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে শকুন্তলা তার মনোহরণ করেছিল, সেই একই নৈপুণ্যে হরিহরের ছোট্ট ফ্ল্যাট বিকশিত হয়ে উঠবে।

না, শকুন্তলার আর চাকরিতে মন নেই। মন দিয়ে ঘর-সংসার করার সুযোগ পেলে মেয়েরা এক কথায় মহামূল্য কেরিয়ারকে গঙ্গায় বিসর্জন দেয়।

তবে হরিহর বলে, অফিসের ফিলজফিগুলো বাড়িতে নিয়ে আসব আমরা। দু'জনেই আমরা মনে রাখব, আমাদের এই জীবন একের পর এক ডিসিশনের মালা ছাড়া কিছুই নয়। ম্যানেজমেন্টের নীতিগুলো মানলে, সংসারের এফিসিয়েন্সি বাড়বে, উৎপাদকতা বাড়বে, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটনার আগেই আমাদের আপতকালীন প্ল্যান তৈরি থাকবে। সেক্রেটারি হিসেবে যে-মেয়ে সব কথা মন দিয়ে শুনত, এবং নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলত সে ক্রমশই সেকেলে হয়ে যাচ্ছে। সে মুচকি-মুচকি হাসে, কিন্তু পতিদেবতার কথার গুরুত্ব দেয় না। নির্দেশ না-মানলে অফিসে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়, কিন্তু বউ তো ওয়ার্কম্যান নয়—চার্জশিট ওখানে অচল।

হরিহরের বক্তব্য : প্রত্যেক ফ্যামিলির একটা বাৎসরিক পরিকল্পনা থাকা চাই। এই বছরে আমরা কীভাবে কোথায় পৌঁছতে চাই? লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে আমাদের রণকৌশল কী? এবং যেসব সমস্যা আসবে তার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হবে দ্রুত।

কোনো কথায় কান দেয় না শকুন্তলা। "ঈশ্বর যেমন চাইবেন তেমন হবে"—দিদিমা কখন যে মেয়েটার মগজ ধোলাই করল।

হরিহর বলে, "ডিসিশন নেবার ব্যর্থতার জন্যেই যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে গেল। কে কোন কাজের জন্যে রেসপনসিবল তা কেউ জানে না, ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং ব্যর্থতার জন্যে তিরস্কার নেই। সামান্য একটু ম্যানেজমেন্ট রি-অরগানাইজেশনের অভাবে অমন চমৎকার একটা সামাজিক ব্যবস্থা দেশ থেকে দূর হয়ে গেল।"

শকুন্তলা বলেছে, "যারা সংসার চালায় তারা অফিস-চালকদের থেকে বোকা একথা ভেব না। প্রত্যেক সংসারেই একটা পলিসি আছে। সেটা হল নিরাপত্তা। এবং সামর্থ্যের মধ্যে যতটা সম্ভব সুখে থাকা।"

"চমৎকার!" শকুন্তলার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে খুব খুশি হয়েছে হরিহর। "কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর রণকৌশল কী?"

"সংসারটা অফিসের মতো যুদ্ধক্ষেত্র নয়। সুতরাং রণকৌশল নয়, এখানে কলাকৌশল। আগে লক্ষ্য সম্বন্ধে ডিসিশন দাও, তারপর কৌশল ঠিক করা যাবে।"

ব্যাপারটা ঠিক না বুঝে, নতুন বউয়ের মোহিনীমায়ায় মুগ্ধ হয়ে হরিহর তার সবুজ সংকেত দিয়েছে। তারপরেই এসেছে বিপদ। সেই সংকট এমনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে শকুন্তলার নতুন রূপ দেখেছে হরিহর। এই শকুন্তলা একগুঁয়ে, রাগী এবং কোনোরকম আলাপ-আলোচনায় অনাগ্রহী।

সমস্যাটা শুরু হয়েছিল ব্যয় সংকোচ সম্পর্কে আলোচনা থেকে। শকুন্তলা একদিন বলেছে ব্যয় সংকোচ এবং নিরাপত্তা দুই একই সঙ্গে পাওয়া সম্ভব।

শকুন্তলা কোথায় কোন ম্যাগাজিনে কী পড়েছে কে জানে? সে আবদার করে বলেছে, "তুমি আমার একটা কথা রাখবে বলো?"

"সম্ভব হলে অবশ্যই রাখব," এছাড়া আর কী উত্তর হতে পারে?

"আমার গা ছুঁয়ে বলো!"

"এ আবার কী ধরনের কথা! তুমি তো অফিসে ছিলে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিই, কিন্তু কখনও কারও গা ছুঁই না।"

শকুন্তলা এমনভাবে তাকাল যে হরিহর অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। প্রেমের শেষ পর্বে, শকুন্তলা ছুটিতে যাবার আগের দিনে সে শকুন্তলার হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়েছিল—শকুন্তলা তখনও একজন এমপ্লয়ি, রেজিগনেশন দেয়নি।

এক মুহূর্তের জন্যে গভীর দুঃখ হল হরিহরের। কেন সে অফিসের সহকর্মীর সঙ্গে প্রেম করতে গেল, বাইরে তো কত বান্ধবী সন্ধানের সুযোগ ছিল।

যে-শরীর সম্বন্ধে এত আগ্রহ ছিল তা এখন স্পর্শ করতে ভয়! দিদিমা প্রায়ই বলতেন, শরীর ছুঁয়ে কোনো প্রতিজ্ঞা করার পরে তা না মানলে সে-শরীর নষ্ট হয়ে যায়।

শকুন্তলার মাথায় সর্বনাশা মতলব ঢুকিয়েছে এক জীবনবিমার দালাল। ইনসিওর বাড়াও এই প্রস্তাবে শকুন্তলা বলেছিল তাদের যত্র আয় তত্র ব্যয়,

এখন নতুন বিমা করার উপায় নেই। সেই শুনে ইনসিওর মামা বলেছেন, সম্পূর্ণ ভুল। যে টাকা সিগারেটে খরচ হয় তা দিয়েই মোটা টাকার বিমা হয়ে যায়।"

কথাটা শকুন্তলা সিরিয়াসলি নিয়েছে।

"সিগারেটে তোমার শরীর স্বাস্থ্যর ক্ষতি হচ্ছে। রাত্রে এক-একদিন তুমি কাশো।"

"সামান্য টনসিলের ধাত আছে।"

"ও মা! অফিসে তুমিই তো আমার টনসিল সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলে! নিজেরটা তো একবারও বলনি।"

"তুমি তো জিজ্ঞেস করোনি। করলে নিশ্চয় চেপে রাখতাম না। তোমারটা জিজ্ঞেস করেছিলাম এই জন্যে যে বাবা-মায়ের দু'জনের টনসিল থাকলে ছেলেমেয়েদের টনসিল অবধারিত।"

"ও মা! তখন তো আমি সবে ঢুকেছি! কোথায় তখন জানাশোনা? মেয়ে দেখলেই কি ছেলেদের মাথায় বিয়ের মতলব জাগে?"

অপমানটা হজম করতে গিয়ে মেজাজটা আরও গরম হয়ে উঠেছে হরিহরের। নতুন ইনসিওর সে করবে, কিন্তু সামনের বছরে, মাইনে বাড়ার পর। নট অ্যাট দ্য কস্ট অফ সিগারেট। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হয়েছে। বউয়ের চাপে পড়ে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে রাজি নয় হরিহর। দিগন্ত সিন্‌হা বলেছে, "ছেলেদের ব্যক্তিত্ব দুমড়ে ফেলবার জন্যে বিয়ের প্রথম পর্বে এরকম চাপ আসে। ফাঁদে পা দিয়েছ তো মরেছ। আমার বউও সিগারেট ছাড়ার জন্যে চাপ দিয়েছিল, মান-অভিমানও করেছিল—এখন মেনে নিয়েছে। নিজেই মাসকাবারী সিগারেটের ঠোঙা কিনে আনে।"

হরিহর এই হাঙ্গামা এড়াবার জন্যে নতুন সমাধানের সন্ধান করেছে। তার সামনে তিনটি পথ :

১। কারও কথায় কান না দিয়ে ধূমপান চালিয়ে যাওয়া।

২। স্ত্রীর প্রতি কিছুটা সম্মান দেখানোর জন্যে স্মোকিং-এর মাত্রা কমিয়ে দেওয়া।

৩। স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করে, সিগারেট বন্ধ করা।

মধ্যপন্থা সম্পর্কে শকুন্তলার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। "আমার বাবা

বলতেন, সিগারেট ছাড়া যায়, কিন্তু কমানো যায় না! হয় এসপার না-হয় ওসপার।"

ব্যাপারটা যে সত্যি তা হরিহর নিজেও জানে। কিন্তু চাপে পড়ে সে সিগারেট ছাড়বে না। ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা উচিত শকুন্তলার। পুরুষমানুষের ব্যক্তিত্বে ছায়া পড়লে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মেজাজ সপ্তমে উঠেছে। শকুন্তলা চাপ দিয়েছে, "তোমার মুখের কথায় আমি অমন চাকরি ছেড়ে গৃহবন্দী গৃহবধূ হলাম, আর তুমি সামান্য সিগারেট ছাড়তে পারছ না?"

এবার ত্রিপাক্ষিক আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে শকুন্তলা – ওর জীবনবিমা মামার সামনেই তর্ক হোক, উনি সব শুনে যা সিদ্ধান্ত দেবেন...আগুনের মতো জ্বলে উঠেছিল হরিহর, অফিসে যাবার আগে বলেছিল, "এ-বাড়ির যা-কিছু ডিসিশন তা আমি নেব, নট এনি তৃতীয় পক্ষ।"

আরও কিছু অপ্রিয় কথা শুনিয়েছিল হরিহর। তারপর অফিসে এসে ব্যাপারটা পর্যালোচনা করেছে হরিহর। সিগারেট নিয়ে বউয়ের সঙ্গে এই টানাপোড়েন, অথচ দিদিমার ধারণা ছিল, "অফিসের মেয়েরা সবাই সিগারেট খায়। হ্যাঁরে, বউ তোর সামনে ভঁস ভঁস করে ধোঁয়া ছাড়বে, তা তুই দেখতে পারবি?"

এরপরে বিকেলে দুঃসংবাদ এসেছে।

সেক্রেটারি বলল, "মিসেস সান্যাল-হালদার ফোন করেছিলেন।"

ওহো ওই ব্যাপারটা বলা হয়নি। কুমারী বয়সের টাইটেলটা সম্পূর্ণ বিসর্জন না-দিতে হরিহরই উৎসাহ দিয়েছিল শকুন্তলাকে। "তোমার আত্মীয়স্বজনরা কিছু ভাববে না তো?" এই প্রশ্নের উত্তরে তাদের সামলাবার দায়িত্ব হরিহর নিজেই নিয়েছিল।

নতুন সেক্রেটারি মিসেস বিশ্বাস একজন ডাইভোর্সি। বেশ ফলাও করে বললেন, "মিসেস সান্যাল-হালদার মেসেজ দিয়েছেন তিনি দুপুরেই বংশবাটীতে বাপের বাড়ি যাচ্ছেন। নিজের ইচ্ছেতেই তিনি যাচ্ছেন।"

শরীরটা শির-শির করে উঠল হরিহরের। ঝগড়াটা একটু বেশি পরিমাণেই হয়েছিল।

কিন্তু তাই বলে এইভাবে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া! হরিহর জানে

আমেরিকান উপন্যাসে, অফিস কর্মীদের এই আড়াইটে থেকে তিনটে সময়টা খুবই বিপজ্জনক। এই সময়েই সুন্দরী বউদের কাছ থেকে অফিসে টেলিফোন আসে—"জন, আমি বোরড ফিল করছি, আমি একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠতে পারছি না। আমি চললাম। তোমার ঘরের চাবি পাশের ফ্ল্যাটে রইল।" দেখে-দেখে বারবেলাটা মেয়েরা কেন ঘর ভাঙবার জন্যে নির্বাচন করে তা কেউ জানে না।

"আর কিছু? কবে ফিরছেন?"

না তেমন কিছু ইঙ্গিত মিসেস বিশ্বাসের কাছে নেই। মিসেস বিশ্বাসের মুখে যেন স্যাটিসফ্যাকশনের ছায়া দেখা যাচ্ছে।

ফ্ল্যাটের একটা চাবি হরিহরের কাছে থাকে। কিন্তু যা ভয় পেয়েছে তাই। দ্বিতীয় চাবিটা শকুন্তলা পাশের ফ্ল্যাটেই রেখে গিয়েছে।

যে-রিপোর্টে আরও রাগ হল—ওই হারামজাদা ইনসিওর মামাটাই দুপুরবেলায় এসে ট্যাক্সিতে শকুন্তলার ব্যাগ তুলেছে।

না, ফোঁস আছে শকুন্তলার। জামাকাপড় নিলেও, গহনাগাঁটি কিছুই নেয়নি সঙ্গে। কোনো চিঠিপত্রও নেই টেবিলে। আমেরিকান মেয়েরা এই সময় একটা লম্বা ডেজারসন লেটার লেখে—কেন সে ছেড়ে চলে যাচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ থাকে। কাকে ভালোবাসছে তারও একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সন্ধেবেলায় দিগন্ত সিন্‌হা বিনা নোটিসে বাড়িতে উপস্থিত। তাকে ব্লাফ দিতে হল। "ও একটু বাপের বাড়ি গিয়েছে।"

দেহের ভাষা বুঝতে পারে বোধ হয় দিগন্ত। "এখনও তো চব্বিশ ঘণ্টা হয়নি। এরই মধ্যে বিরহবেদনার কালো ছায়া পড়ছে মুখে!" দিগন্ত বলেছে, "প্রধান-প্রধান সিদ্ধান্তগুলো কে নেবে এইটাই পৃথিবীর সমস্ত সংঘাতের মূলে রয়েছে। সংসারেও তাই। আমি এখন সহজ পথ বের করেছি—সমস্ত সিদ্ধান্তশক্তি আমার গৃহিণীকে দিয়েছি, আমি হুকুমের চাকরমাত্র। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকরী হতে দিই না, শেষ মুহূর্তে স্যাবোটেজ করি। যেমন ধরো গৃহিণীর সিদ্ধান্ত : সিগারেট বন্ধ করো। আমি প্রথমে মেনে নিলাম, তা ওকে একটু-আধটু সিগারেটের সুখ নিতে উৎসাহ দিলাম। এখন অসুবিধে নেই। রাত্রে শোবার আগে আমরা দু'জনে দুটো শ্বেত-কাঠিকা

উপভোগ করি।" না, এসব কল্পনাও করতে পারবে না, হরিহর ভেবেছিল। নিজের স্ত্রীও সিগারেট ধরবে, মদ ধরবে ভাবা যায় না। দিদিমা, মা, কাকিমা, দিদি, মাসিমা অনেকগুলো পবিত্র মুখ দেখতে পেল হরিহর।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়। পরের দিন অফিসে এসে একটা মাঝারি সাইজের চিঠি হাতে লিখে ডাকে ফেলেছে হরিহর। যেন দু'জনের মধ্যে কিছুই হয়নি।

দু'দিন কোনো সংবাদ নেই। মিসেস বিশ্বাসকে জিজ্ঞেস করেছে, "আমার জন্যে কোনো মেসেজ?"

"কোনো মেসেজ আমি ফেলে রাখি না, মিস্টার হালদার। হাউ ক্যান আই?"

দুপুরে অনেক কথা ভেবেছে হরিহর।

কাছাকাছি বাপের বাড়ি এমন মেয়ে বিয়ে করা খুব বোকামি। আরও ভুল হয়েছে, ওয়ার্কিং গার্ল বিয়ে করা। চাকরি ছাড়লেও ওদের ফোঁস যায় না। কিন্তু এই অবস্থায় কী কী হতে পারে?

হরিহর নিজের কায়দায় শকুন্তলার সিদ্ধান্ত তালিকার কার্ডটা মানসচক্ষে দেখতে লাগল :

১। স্বামীর কাছে চুপি-চুপি ফিরে যাওয়া। স্বামী তো একটা চিঠি লিখেইছে।

২। কোথাও আবার চাকরি জোগাড় করা।

৩। কোনো পুরনো পুরুষবন্ধুকে খুঁজে বের করা। দুপুরে তো অঢেল সময়।

৪। আত্মহত্যার চেষ্টা করা, যাবার আগে লিখে যাওয়া স্বামীর নির্দয় ব্যবহারেই...

না, আর ভাবতে পারছে না হরিহর। তিন এবং চার নম্বর সম্ভাবনা তাকে ভীষণ উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। কী করে ডিসিশন নিতে হয় তা তো স্বামীর কাছ থেকে ভালোভাবেই শিখে নিয়েছে শকুন্তলা। আমেরিকান মেয়েরা চার নম্বরের কথা ভাববেই না—তারা স্বামীকে কলা দেখিয়ে তিন নম্বরটাই উপভোগ করবে। এ-দেশের মেয়েরাও এই সব ট্রিক শিখছে, কিন্তু খবরের কাগজের পাবলিসিটির দয়ায় ওই চতুর্থ সিদ্ধান্তটাই মেয়েদের মাথায় এসে

যায়। কিন্তু হরিহরেরও আত্মসম্মান আছে। সে তো বলেছে, বছরখানেকের মধ্যেই নতুন বিমা করার মতো টাকা সে পাবে।

মিসেস বিশ্বাস, খবর এনেছেন। আঃ কী অপয়া এই বিচ্ছিন্ন-মহিলা! শকুন্তলা যখনই ফোন করেছিল তখনই হরিহর ঘরে থাকে না। পাল্টা ফোন করারও উপায় নেই, ওদের বাড়িতে ফোন নেই। পোস্টাপিসে এসে ওরা যাকে খুশি ফোন করতে পারে, কিন্তু অন্যপক্ষের সে সুবিধে নেই।

না, মিসেস সান্যাল-হালদার আর ফোন করবেন না, কিন্তু তিনি তাঁর মেসেজ দিয়েছেন। মেসেজটা দেখে মাথাটা ঘুরে উঠল হরিহরের। দু'তিনবার মেসেজটা পড়ল সে, এবং মাথাটা আরও ঘুরতে লাগল।

এমন তাজ্জব রিকোয়েস্ট আগে কখনও স্ত্রীর কাছ থেকে পায়নি হরিহর। "আমার জন্যে অবশ্যই এক প্যাকেট সুরসুন্দরী মার্কা বিড়ি যতীনবাবুর হাতে পাঠাবে।" যতীনবাবু এই অফিসেই কাজ করেন-- বংশবাটী থেকে নিত্যযাত্রী।

শাড়ি না, ব্লাউজ না, গয়না না, স্নো-সাবান-পাউডার নয়—স্রেফ বিড়ি। তাও স্ত্রী চেয়ে পাঠাচ্ছেন, এর থেকে লজ্জার কী থাকতে পারে?

সমস্ত ব্যাপারটা না বলে দিগন্ত সিনহার সঙ্গে ফোনে পরামর্শ করল হরিহর। "কোন অবস্থায় একটি মেয়ে স্বামীর কাছে বিড়ি চাইতে পারে?"

"হয়তো স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে। তুমি সিগারেট ছাড়লে না, আমি বিড়ি ধরছি। স্বামীর উচিত ছিল স্ত্রীকেও সিগারেট ধরতে উৎসাহ দেওয়া।"

সিকিউরিটি অফিসার, রিটায়ার্ড এ-সি মিস্টার চোংদারকে ফোন করল হরিহর। তিনি বললেন, "হয়তো দীর্ঘদিন ধরে লুকিয়ে বিড়ি খাওয়ার অভ্যাস আছে মহিলার।"

"কিন্তু তাহলে স্বামীর কাছে চেয়ে পাঠাবেন কেন? বিড়ি তো সর্বত্রই পাওয়া যায়।"

"হয়তো পার্টিকুলার ব্র্যান্ড অফ বিড়ি, যা সর্বত্র পাওয়া যায় না।"

সন্তুষ্ট হতে পারল না হরিহর। অফিস আর্কিটেক্ট দেবনাথকে জিজ্ঞেস করল।

"মেয়েরা আজকাল সিগারেট ছেড়ে বিড়ি খাচ্ছে, মিস্টার হালদার।

অ্যাজ এ প্রোটেস্ট। যা পুরুষরা পছন্দ করে না তাই মেয়েরা করবে—তবেই না প্রতিবাদ।"

ল' অফিসার মিস্টার সাহাকে জিজ্ঞেস করল হরিহর।

"ইন্টারেস্টিং লিগ্যাল পয়েন্ট, মিস্টার হালদার। স্বামী যদি ননস্মোকার হন এবং স্ত্রী যদি রেগুলার বিড়ি খান তাহলে বোধহয় নিষ্ঠুরতার অভিযোগে ডাইভোর্স মামলা আনা যেতে পারে। ভোপাল হাইকোর্টের একটা ডিসিশন ওই ধরনের বোধ হয় আছে।"

"যদি স্বামী সিগারেট স্মোকার হন?"

"তাহলে একটু অরডিগনামের মিস্টার ডি কে বাসুকে পরামর্শ করে দেখতে হয়।"

না, আর ভাবতে পারছে না হরিহর। এদিকে সময় এগিয়ে যাচ্ছে। নিজেই বিড়ি কিনতে বেরুল হরিহর। "সুরসুন্দরী মার্কা বিড়ি পাঁচ ছ' প্যাকেট কিনে নিন", পরামর্শ দিল বিড়িওয়ালা। "পরে আফসোস করবেন। সাপ্লাই পাবেন না।" লোকটি পরামর্শ দিল। কিন্তু ওসব কথা কানে তুলল না হরিহর। লোকটা কি হরিহরের জামাকাপড় দেখে বুঝতে পারছে না, সে রেগুলার বিড়ির খরিদ্দার নয়? নেহাত বউয়ের হুকুম তাই এই পথে নামতে হচ্ছে হরিহরকে, সমস্ত জীবনের সে কখনও বিড়ি কেনেনি। হা ঈশ্বর, কেন এই অফিসের ওয়ার্কিং গার্ল বিয়ে করার দুর্মতি হল?

লজ্জা এড়াবার জন্যে বিড়িটা স্পেশ্যালভাবে প্যাক করেছে হরিহর। চিঠি লেখেনি, কিন্তু একখানা ছাপানো স্লিপ জড়িয়ে দিয়েছে—উইথ দ্য কমপ্লিমেন্টস্ অফ হরিহর হালদার। বংশবাটী ডেলিপ্যাসেঞ্জার যতীনবাবু যথাসময়ে প্যাকেট সংগ্রহ করে বিদায় নিয়েছেন।

সমস্ত রাত সুরসুন্দরী বিড়ির স্বপ্ন দেখেছে হরিহর। হিন্দী সিনেমার কু-রমণীর মতো দেখতে হয়ে গিয়েছে শকুন্তলা। বিছানায় বসে একের পর এক বিড়ি খেয়ে চলেছে সে।

ভোরবেলার দৃশ্যটা আরও ভয়াবহ। হরিহর সিগারেটের ধোঁয়া ছুড়ে দিচ্ছে শকুন্তলার দিকে, আর বিড়ির ধোঁয়া স্প্রে করে প্রতিশোধ নিচ্ছে শকুন্তলা।

সমস্ত রাতের ক্লান্তি সঙ্গে নিয়ে হরিহর আবার অফিস গিয়েছে।

ডেসপ্যাচ সেকশনের কান্তিবাবু ধার্মিক লোক। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছে হরিহর যদিও ব্যাপারটা যে তারই, জানিয়ে। কান্তিবাবু বললেন, "দেখুন হয়তো পিতৃভক্ত কন্যা, বাবা হয়তো বিড়ি খেতে ভালোবাসেন।"

সে চান্স নেই, শ্বশুর আগেই গত হয়েছেন। শাশুড়ি বিড়ি ধরেছেন, ভাবতেই পারা যায় না। মার্কেটিং-এর মজুমদারের সঙ্গে কথা বলেছে হরিহর। "আমিও শুনছি বটে, বিড়িটা মেয়েমহলে প্রিয় হয়ে উঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে আমেরিকান মার্কেটটা আমাদের ক্যাপচার করতে হবে—যেসব ইন্ডিয়ান মহিলা বিড়ি ধরেছেন প্রমোশনের কাজে তাঁরা লেগে যাবেন।"

বিকেলবেলায় আবার মেসেজ সংগ্রহ করেছেন মিসেস বিশ্বাস ফ্রম মিসেস সান্যাল-হালদার। হরিহরের সন্দেহ হচ্ছে শকুন্তলা ইচ্ছে করেই স্বামীর সঙ্গে কথা বলে না, শুধু মেসেজ রেখে দেয়।

মেসেজটা মোটেই সুবিধের নয়। আজ দু'প্যাকেট সুরসুন্দরী বিড়ি আর্জেন্টলি পাঠাতেই হবে।

সমস্ত শরীরটা জ্বলছে হরিহরের। একটা প্যাকেটে অন্তত গোটা চল্লিশেক বিড়ি থাকে—কয়েক ঘণ্টায় তা উড়িয়ে দেওয়া! কিন্তু তর্কের সময় কোথায়? আবার বিড়ি কিনে আনল হরিহর নিজেই। আজও লোকটা বলল, পরে আফসোস করবেন, আরও কয়েকটা প্যাকেট নিয়ে যান। লোকটাকে দোষ দেওয়া যায় না, পরপর দু'দিন হরিহবকে বিড়ি কিনতে দেখা গিয়েছে।

পার্টটাইম মেডিক্যাল অফিসার ডঃ গাঙ্গুলির সঙ্গে কথা বলেছে হরিহর। "একজন মানুষের পক্ষে প্রতিদিন ক'টা বিড়ি খাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত?"

"মেয়েদের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক—বিশেষ করে প্রেগন্যান্সির সময় তো..."

ফোন নামিয়ে রাখল হরিহর। আবার প্যাক করল বিড়ি, সঙ্গে কমপ্লিমেন্ট স্লিপ। একবার ভাবল লেখে, দয়া করে নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে এনো না।

কিন্তু মনে পড়ে গেল সাহিত্যিক নগেন পালের বিখ্যাত কথা—"মেয়েরা যখন প্রতিশোধ নিতে চায় তখন তাদের আটকাবার চেষ্টা বৃথা। মেয়েরাই

একমাত্র জীব, যারা নিজেদের ভালো-মন্দ বোঝে না।"

তৃতীয় দিনে আর বিড়ির অর্ডার আনবে না, মনের মধ্যে এমন একটা ক্ষীণ আশা ছিল। মা কালীর কাছেও ছোট্ট একটা প্রস্তাব রেখেছে হরিহর। আর যদি বিড়ির অর্ডার না আসে তাহলে একমাসের সিগারেট খরচটাই ক্যাশে জমা দেবে ঠনঠনে কালীতলায়।

কিন্তু মায়ের প্রভাব ক্রমশই আধুনিকা মহিলাদের ওপর ক্ষীণ হচ্ছে। আবার মেসেজ এসেছে দু'প্যাকেট সুরসুন্দরী বিড়ির জন্য।

দাঁতে দাঁত ঘষছে হরিহর। পার্সোনেল বিভাগের বিহেভিয়রাল সায়েনটিস্ট ডঃ দে-বিশ্বাসের সঙ্গেও পরামর্শ করেছে সে। "অফিসে, কারখানায় বিড়ির সঙ্গে যা চলেছে তা চিন্তার কারণ। বিড়িটা একটা নির্দোষ আস্তরণ, যার আড়ালে থাকতে পারে এনিথিং—গাঁজা, সিদ্ধি, চরস, আফিম, কোকেন, এটসেটরা। এর থেকে মদ অনেক ভালো।"

ডঃ দে-বিশ্বাস বলছেন, "কর্মীরা আত্মঘাতী হবার জন্যে কর্তাদের প্রতি ঘৃণায় বিড়ি ধরতে পারে।" খুব লজ্জা লাগছিল, কিন্তু আজও নিজেই বিড়ি কিনে আনল হরিহর। লোকটা আজও মাল ফুরিয়ে যেতে পারে, দাম বাড়তে পারে এইসব ইঙ্গিত দিয়ে কয়েকটা বাড়তি প্যাকেট নেবার পরামর্শ দিল। কিন্তু লোকটা জানে না, আজই হরিহরের শেষ বিড়ি কেনা। হোয়াটেভার হ্যাপন্‌স, এই অধমকে আর কোনোদিন বিড়ি কিনতে দেখবে না।

বিড়িটা আজ প্যাক করল না হরিহর।

যতীনবাবু যথারীতি দেখা করতে এলেন।

তাকে ফিরিয়ে দিল হরিহর। সিদ্ধান্ত না নিয়ে পিছিয়ে যাওয়াটা অপদার্থ কাপুরুষদের ধর্ম। জীবনটা একাধিক সিদ্ধান্তের মালা ছাড়া আর কিছুই নয়।

একটুকরো কাগজ কাছে টেনে নিল হরিহর। বেপরোয়া বেহায়া হয়ে উঠছে শকুন্তলা সান্যাল-হালদার। স্বামী হিসেবে প্রশ্রয়ের একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম হতে চলেছে। এবার যেসব পথ সামনে রয়েছে তার তালিকা করে ফেলল হরিহর।

১। কোনোক্রমে শকুন্তলাকে সর্বনাশের পথ থেকে সরিয়ে আনা। (লাল কালিতে মন্তব্য)—কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? যে মহিলা প্রতিদিন নিজের

সর্বনাশ করছেন?

২। কিছু না বলে, শকুন্তলাকে ডাইভোর্সের প্রস্তাব দেওয়া। (লাল কালিতে মন্তব্য)—আদালত কী বিড়ির সর্বনাশা অবক্ষয়ের দিকটা বুঝবে? না আরও কারণ সংগ্রহ করতে হবে?

৩। শকুন্তলার ঠোঁটের বিড়ি হঠাৎ কেড়ে নিয়ে মুখে অনেকগুলো জ্বলন্ত ছ্যাঁকা দেওয়া।

৪। ওকে খুন করা, বিড়ির মধ্যেই কোনো বিষ পুরে দিয়ে।

৫। কিছু না করা, প্রতিদিন যত খুশি চায় তত বিড়ি পাঠিয়ে দেওয়া, যাতে ওর লজ্জা হয়।

সিদ্ধান্ত নেবার আগে পাঁচনম্বর পথটা ঘ্যাঁচ করে কেটে দিল হরিহর। চার নম্বরটাও কাটল হরিহর। চেইন রি-অ্যাকশনে চাকরিটাও যাবে।

তারপর দিগন্ত সিন্‌হাকে ফোন করল হরিহর। "আজ একটা বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাকে। আমি বংশবাটী যাচ্ছি আজ।"

"খুবই আনন্দের কথা। গিন্নীর সঙ্গে মিটমাট করে সোজা আমাদের বাড়িতে চলে এসো ফর ডিনার।"

"না ব্রাদার, আজ ডিনার নয়। তবে ভীষণ একটা কিছু ঘটতে চলেছে যা তোমার পুরনো চিত্রনাট্যকে নষ্ট করে দেবে। তুমি বাড়িতে থেকো, আমি যেখান থেকেই হোক ফোন করব।"

খুব ভয়ে-ভয়ে ছিল দিগন্ত সিন্‌হা। নিজে এবং গৃহিণী একই সঙ্গে সিগারেট টানছেন অথচ উত্তেজনা কমছে না। কিছু না একটা করে বসে হরিহর। পুলিশ, আদালত এসবের হাঙ্গামা কে পোয়াবে?

সন্ধ্যা আটটায় হরিহরের টেলিফোন। "ব্রাদার, আমরা দু'জনেই তোমার ওখানে ডিনারে আসছি, ভালো-মন্দ খাইয়ো। ও আমার সঙ্গে ফিরে এসেছে, এখন স্নান ঘরে ঢুকেছে সেইসময়ে তোমায় ফোন করছি। আমি ভাই কথা দিয়েছি ওকে এবং ইতিমধ্যেই সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি। ট্রেনে একটাও খাইনি।"

"আর ওই সুরসুন্দরী বিড়ির ভয়াবহ ব্যাপারটা?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল দিগন্ত।

"সুরসুন্দরী বিড়ির কথা বলছ তো। ওমা, বউয়ের মুখে বিড়ির ছ্যাঁকা

দেবার প্ল্যান করে গিয়ে দেখি, বিড়িগুলো টেবিলে রেখে বউ একমনে ফর্ম বোঝাই করছে। প্রতিটি সুরসুন্দরী বিড়ির লেবেল ফেরত পাঠালে প্রথম পুরস্কার এক লক্ষ টাকা। লেবেলের সঙ্গে পাঁচটা শব্দে লিখতে হবে 'আমি সুরসুন্দরী বিড়ি পছন্দ করি, কারণ...'

গিন্নি বলল, "দেখো না, এখানের বাজার থেকে সব সুরসুন্দরী উধাও, তাই তোমাকে রিকোয়েস্ট করতে হলো। যদি লাখ টাকা পুরস্কার পাই তাহলে সারাদিন ধরে যত ইচ্ছে সিগারেট তুমি খেতে পারবে সুদের টাকায়।"

"তারপর?"

"তারপর আমি দেখলাম, প্রতিটি বিড়ি অক্ষত। শুধু লেবেলগুলো নেই। আমার চোখে জল।"

"তখন তুই কী করলি?"

"আমি কাঁদতে-কাঁদতে শকুন্তলাকে প্রমিস করলাম আমি আর কখনও স্মোক করব না। তুমি এখনই বাড়ি চলো।"

"বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত" এই বলে দিগন্ত সিন্‌হা সানন্দে টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

নমিতাকে কোনো গল্প বা উপন্যাসের চরিত্র করার কথা কখনও ভাবেননি নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রবন্ধকার, কথাসাহিত্যিক এবং ভ্রমণবিদ নিখিলেশ এযাবৎ পঞ্চাশের বেশি গ্রন্থের জন্ম দিয়েছেন। কত বিচিত্র চরিত্র তাঁর উপন্যাস ও গল্পে প্রাণবন্ত হয়ে পাঠকের বিস্ময়ের এবং আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন ধরুন, তাঁর সফল উপন্যাস মনমর্মর-এর নায়িকা বিদিশা। কুলীন ব্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণ করে বিদিশা কেমন করে বিদ্রোহিণী হলো এবং শেষপর্যন্ত আয়েশায় রূপান্তরিত হলো তা আজ পুনরাবত্তির অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য আইন ও শৃঙ্খলার কথা চিন্তা করে সাহিত্যিক নিখিলেশ তাঁর বিদ্রোহিণী বিদিশাকে সুদুর বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এবং সেখানেই বিদিশা স্বেচ্ছায় আয়েশা নাম গ্রহণ করেছিল প্রতিবাদ জানানোর জন্যে. প্রচলিত ধ্যানধারণা ভেঙে চুরমার করে ফেলার জন্যে। এই উপন্যাসকে নাট্যায়িত করে যে-নাটক থিয়েটার পাড়ায় মঞ্চস্থ হয়েছিল তার বিপুল সাফল্যের কথাও কারও অজানা নয়! এই কাহিনির প্রধান ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য চিত্রতারকা কুমকুম সেন এতোই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি নিজে নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যাযেব বাড়িতে এসেছিলেন নাট্যস্বত্ব নিশ্চিত করতে।

কুমকুম ওরফে কুমু একসময় অনুরোধ করেছিলেন, শেষপর্বে বিদিশা আয়েশা না হয়ে বরং আত্মহত্যা করুক দর্শকে চোখের সামনে। শরীরে কেরোসিন ঢেলে নাটকের সবচেয়ে নাটকীয় পর্বে বিদিশা উপস্থিত হোক মঞ্চে, তারপর দর্শকের সামনেই আগুন জ্বলে উঠুক—বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকুক। এই দৃশ্য মঞ্চে উপস্থাপিত করার জন্য যে ঝুঁকি তা আনন্দে গ্রহণ করবেন কুমু ওরফে কুমকুম সেন। নিখিলেশ সব শুনেছেন, কিন্তু প্রস্তাবে রাজি হননি। বিদিশাকে হত্যা করার জন্যে তিনি

সৃষ্টি করেননি—বড় ভালোবাসার মানুষ এই বিদিশা। তিলতিল করে সামান্য একটা আইডিয়া থেকে সে রক্তমাংসের মানবী হয়ে উঠেছে নিখিলেশের মানসলোকে—বিদিশা মরবে না। বিদিশারা প্রতিবাদ করবে, বিদ্রোহিণী হবে।

মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন কুমু, ফলে সেযাত্রায় বিদিশা বেঁচে গিয়েছিল। অসাধারণ অভিনয়গুণে কুমু সেন এই চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন, বিদিশা হয়ে উঠেছিল অগ্নিকন্যা। এই বিদিশাকে সম্পূর্ণ শূন্য থেকে সৃষ্টি করেননি নিখিলেশ। জীবনের চলার পথে যেসব অবিস্মরণীয় চরিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে বিদিশা তাদেরই একজন। নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায় দেখেছেন, সযত্নে নিজের দিনলিপিতে অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন, একান্তে আলোচনা চালিয়েছেন বিদিশার সঙ্গে, তারপর যথাসময়ে উপন্যাস লিখেছেন বিদিশাকে নিয়ে। বিদিশাকে বিদেশেই আবিষ্কার করেছিলেন নিখিলেশ। হয়তো মনমর্মর-এর বিপুল সাফল্য বিদিশাকে বিদেশেও বিব্রত করেছে, কিন্তু উপায় ছিল না। বিদিশাকে বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি। নিখিলেশ নিজেই একবার তাঁর উপন্যাসের এক চরিত্রের মাধ্যমে বলেছিলেন, ঘাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো গোরুর পক্ষে সম্ভব নয়, তা হলে অনাহারে মরতে হবে তাকে।

শুধু বিদিশা নয়, শত চরিত্রের বিচিত্র শোভাযাত্রায় তাঁর সাহিত্যজীবনকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। 'ন' উপন্যাসের নলিনী বারবার করুণ অনুরোধ করছে লেখক ও নায়ক নিখিলেশকে তার কথা নলিনীর জীবিতকালে না লিখতে। লেখক সে অনুরোধ রাখতে পারলেন না। এই উপন্যাসে নিখিলেশ অবশ্যই নিজেকে একজন স্বার্থপর গল্প ব্যবসায়ীতে রূপান্তরিত হতে দেননি। পাঠকের কাছে লেখকসমাজের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে অভিনব এক পরিস্থিতির উপস্থাপনা করেছিলেন। অসাধারণ রচনাশৈলীর সহায়তায় নিখিলেশ তাঁর 'ন' উপন্যাসে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করলেন যেখানে গল্পের নায়ক অর্থাৎ লেখকের পক্ষে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। যদিও প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছেন লেখক—নলিনী তাঁকে না-লিখতে কাতর অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু সিচুয়েশনের দুর্বার স্রোতে নলিনীর কথা জনগণকে নিবেদন করতে

হলো লেখককে, এবং এই নিবেদনের ফলেই অন্নের জন্য জীবন রক্ষা পেল নলিনীর। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে অবধারিত আত্মহননের হাত থেকে নায়িকা নলিনীকে রক্ষা করে 'ন' উপন্যাসের নায়ক পাঠক সমাজের প্রীতি অর্জন করল। বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছিলেন নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায়।

নলিনীকে সত্যিই রক্তমাংসে দেখেছেন নিখিলেশ। নলিনী বারবার তাঁকে অনুরোধও করেছিল না-লিখতে, কিন্তু উপায় ছিল না নিখিলেশের। একজন ব্যস্ত লেখকের সঞ্চয়ে কত চরিত্র থাকতে পারে যে তিনি না-লেখার বিলাসিতায় ডুব দেবেন? নিখিলেশ এবার গোরু ও ঘাসের উপমার বদলে প্রশ্ন তুলেছিলেন কাঠ ও কাঠুরের চিরকালীন সম্পর্ক সম্বন্ধে। নিখিলেশের এই মন্তব্যটি সজল চক্রবর্তীর সদ্যপ্রকাশিত 'বিন্দুসিন্ধু' নামক বুক অফ কোটেশনে স্থান পেয়েছে।

কৌতূহলী পাঠক জানেন, নিখিলেশের তিনটি সত্তা। তিনটি অস্তিত্বও বলা চলতে পারে। নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায় হিসেবে তিনি সমকালের ইতিবৃত্তকার—বিদ্রোহের সমর্থক। বঙ্গচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নামে নিখিলেশ রম্যরচনাকার। আর ভুবন মাঝি নামে নিখিলেশ দেশবিদেশের ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করেন। ভুবন মাঝি বাংলা সাহিত্যের একটি অতিপ্রিয় নাম। নিখিলেশের সাম্প্রতিক প্রয়াস 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে' বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। এই সাফল্যের অন্তর্নিহিত কারণ সুদূর বিদেশে উপস্থিত হয়েও ভুবন মাঝি যা শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করল 'ঘরে ঘরে মোর দেশ আছে'। ভুবন মাঝি বিদেশেও স্বদেশকে খুঁজে বেড়ান পাগলের মতন, প্রবাসের ভারতীয়রা তাঁর রচনার নতুন আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে পাঠকের হৃদয় হরণ করেন।

বলাবাহুল্য ত্রয়ী ভূমিকায় সক্রিয় থাকার জন্যে প্রয়োজন হয় নানা চরিত্রের। যে-চরিত্র সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠবে না তার পিছনে অকারণে ছোটার সময় থাকে না ব্যস্ত লেখকের—উৎসুক পাঠকসমাজের প্রত্যাশার কথা স্মরণ রেখে নিখিলেশের হয়ে উঠতে হয় চরিত্রসন্ধানী, অনেকটা শিকারী কুকুরের মতন, আকাশের পাখি, বনের হরিণ হননই যার স্বধর্ম এবং কর্ম।

কখনও টান পড়ে চরিত্রর। চরিত্রগুলো তো গাছের মতন—রোপণ

করবার পর বড় হয়ে উঠতে অনেক সময় লাগে। একটা চরিত্র সম্বন্ধে লেখা মানেই একটা গাছ কেটে ফেলা। কাঠুরিয়া যখন দিবারাত্র তার কর্মে রত তখন গাছের অভাব হওয়া স্বাভাবিক। নিখিলেশও মাঝে-মাঝে এই অবস্থায় পড়ে গভীর চিন্তায় ডুব দিয়েছেন স্মৃতির অতল থেকে কিছু তুলে আনতে। তখনই মাঝে-মাঝে মনে হয়ে যায় নমিতার কথা।

কিন্তু নমিতা এমনিই একটি মেয়ে যাকে প্রচারের প্রখর আলোর তলায় আনতে ইচ্ছে করে না নিখিলেশের। অনেক হয়েছে। হে ঈশ্বর (যদি ওই নামে কেউ কোথাও আকারে অথবা নিরাকারে থাকেন) বড্ড খেয়ালি হয়েছ তুমি একটি নিষ্পাপ নিরীহ শ্যামাশ্রী বালিকার বেলায় যার নাম দিয়েছ নমিতা, যার নাম হতে পারত সীতা। কিংবা ধীরা। কিংবা স্বাহা। কিন্তু ওই নামটায় ভীষণ ভয় নিখিলেশের। ওঁ স্বাহা বলে কেমন অনায়াসে এবং নিশ্চিন্তে সব কিছু অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করা যায়। আগুনে পোড়ানো হচ্ছে কিন্তু নিজেকে ঠকাবার জন্যে বলা হচ্ছে অগ্নিকে নিবেদন করা হচ্ছে।

নামের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন নিখিলেশ মাঝে-মাঝে। এদেশের নামের সঙ্গে সায়েবদের নামের বিপুল পার্থক্য। ডেভিড, জন, এডওয়ার্ড, এডিথ, অ্যান, কেবল নামই—কোনো বুৎপত্তিগত অর্থের ইঙ্গিত নেই। নিতান্তই একটা ইঙ্গিতহীন পরিচয়কে নিজের কর্মের মাহাত্ম্যে অর্থবহ করে তোলার দায়িত্ব সায়েবদের। এদেশে প্রায়ই নামের মধ্যেই নানা অর্থ লুকিয়ে আছে। তাই যার নাম ধীরা তার কাছে ধৈর্যের অগ্রিম প্রত্যাশা লিখিতভাবেই নিবেদন করা আছে। ধীরা যদি প্রাপ্তবয়সে অধীরা হয়ে ওঠে বড় মুশকিল হয় সবার। নিখিলেশকে তাই খুব সাবধান হতে হয় চরিত্রদের নাম নির্বাচনে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় নিখিলেশ দেখেছেন, এদেশে চরিত্রের নামই গল্পটা অর্ধেক বলে দেয়। এদেশের চলচ্চিত্রেও তাই। গব্বর সিং বললেই উপস্থাপনার আগেই একটা ছবি দর্শকের মনের মধে আঁকা হয়ে যায়। ধরুন গড়বড় সিং। এই লোকটা যে আমুদে এবং সব কাজেই গড়বড় করে বসবে এমন একটি আগাম নোটিশ দর্শকের কাছে অলিখিত অবস্থায় এবং নিঃশব্দে পৌঁছে যায়। এই কাণ্ড সত্যজিৎ রায়ও করেছেন তাঁর রচনায়। ধরুন লালমোহন গাঙ্গুলীর চরিত্রটি। এঁর নাম যদি অর্জুন গাঙ্গুলী অথবা দীপঙ্কর গাঙ্গুলী হতো তা হলে সত্যজিৎ রায় হিমশিম

খেয়ে যেতেন ওঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে, নামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছেন লালমোহনবাবু।

একই পথ অনুসরণ করেছেন বিমল মিত্র, ভারতীয় নামমাহাত্ম্যের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন কৃতকর্মা এই লেখক। সাহেব বিবি গোলাম উপন্যাসের নাম ভূতনাথ না হয়ে যদি নিখিলেশ হতো, তা হলে ভরাডুবি অনিবার্য ছিল। ভূতনাথ নামের মধ্যেই ভূতনাথ চরিত্রটা অবস্থান করছে। ধরুন সাহেব বিবি গোলামের জবার কথা। ওর নাম যদি লোলো হতো তা হলে কী বিপর্যয় ঘটত! বিপর্যয় থেকেও রসহানি বা ছন্দপতন কথাগুলোই বোধহয় ভালো।

নমিতা নামটা সেইদিক থেকে ভীষণ লোভনীয়। নামটার মধ্যেই চরিত্রটা, গল্পটা বলা রয়েছে। পাঠক নামটা পেলেই বুঝে নেবে কী হতে চলেছে। কী বলবার জন্য লেখক চাইছেন পাঠকের অগ্রিম প্রস্তুতি। নিখিলেশ মাঝে-মাঝে বিশ্লেষণ করেছেন নমিতা নামটি। নমিতার মধ্যে যুগযুগান্ত ধরে কি নম্রতা লুকিয়ে রয়েছে? সুমিতা ও নমিতা—প্রায় একই নাম, কিন্তু কি বিশাল পার্থক্য। যদি মিষ্টি কোনো প্রেমের ছোট উপন্যাস লিখতে হয় তা হলে নিখিলেশ ওই সুমিতাকেই নির্বাচন করবেন, ওর মধ্যে মিতাভাব প্রবল যা নমিতার মধ্যে বিন্দুমাত্র নেই।

সুমিতাকে নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন নিখিলেশ। সুমিতা নিজে এসেই নিখিলেশকে ঘটনাটা দিয়েছে। বলেছে নায়িকার নাম পাল্টাতে হবে না, শুধু প্রতিষ্ঠানের নামটা পাল্টালে চলবে। সুমিতা প্রেমে পড়েছে সহকর্মীর। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় দু'জনে। কিন্তু বাদ সাধছে প্রতিষ্ঠান। বস্তাপচা—নিয়মের শাসন রয়েছে সাত দশক ধরে—প্রজাপতির নির্বন্ধ আসন্ন হলে একজনকে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে হবে। সহকর্মীর শুভপরিণয় কর্মপথে নানা বিপত্তি ডেকে আনতে পারে বলে প্রতিষ্ঠানের আশঙ্কা। এই ভুল ভাঙাবার জন্যেই গল্পে লেখাতে চেয়েছে সুমিতা—নিখিলেশের মাধ্যমে সুমিতা যোগাযোগ চাইছে প্রতিষ্ঠানের অবুঝ কর্মকর্তার সঙ্গে। এই সুমিতা ছুটির পরে সখার মোটরবাইকে আরোহিণী হয়, আলতো বাহুডোরে অভিজিৎকে বেঁধে ফেলে চলমান হওয়ার আগেই। সুমিতা নাম বলেই এটা সম্ভব হয়েছে, সীতা অথবা সাবিত্রী নাম হলে কিছুতেই এই

দৃশ্যকে আনতে পারতেন না নিখিলেশ। পাঠকের কাছে যা গ্রহণীয় হবে না তা উপস্থাপিত করলে উপন্যাসের সর্বনাশ হতে পারে এ-কথা বিমল মিত্র পর্যন্ত অকপটে স্বীকার করেছেন নিখিলেশের কাছে।

নমিতা নামের মধ্যে নম্রতা ছাড়াও কী আরও কিছু লুকিয়ে রয়েছে। এমন কিছু যা আনত হবার জন্যেই পৃথিবীতে এসেছে? নিখিলেশ অভিধান দেখেননি, কিন্তু সন্দেহ হয় দমিত শব্দটার ছাপ পড়েছে নমিতার ওপর। অর্থাৎ শুধু পদে-পদে পরাজয় নয়, পরাজয়কে বারবার মেনে নেবার জন্যই তার জন্ম। যেমন সীতা, সাফল্যের সঙ্গে কোনো সুদূরপরাহত সম্পর্কও নেই। যে-মেয়ে ঈশ্বরের জয়তিলক নিয়ে বিশ্বসংসারে আসছে তাকে সীতা বলে কোনো লাভ নেই। বরং তাকে জয়ন্তী বলো, আরও উল্লসিত হতে হলে ঐ মেয়ের নাম রাখো জয়জয়ন্তী। কেউ অতিমাত্রায় কৌতূহলী হয়ে উঠলে, বলো বিশেষ এক রাগিণীর নামে নাম। কিন্তু যে-বুঝবার সে ঠিক বুঝবে বিজয়িনী হবার তীব্র বাসনা লুকিয়ে রয়েছে এর হৃদয়ে। নমিতা অবশ্যই তেমন সম্ভাবনার কথা তুলবে না।

নিখিলেশ ভেবেছেন, পরাজয়ের ছায়ার মধ্যেই যার পৃথিবীতে আসা তার নামের মধ্যেই সে ইঙ্গিত থাকা মন্দ কী? নমিতা থাকলেই পাঠক অগ্রিম প্রস্তুত থাকবে প্রণমিতা এক বঙ্গরমণীর জন্যে, মিথ্যা প্রত্যাশায় দিকভ্রান্তি ঘটবে না কারও। কিন্তু নিখিলেশ যতই নমিতার জীবনযাত্রার ধারাবাহিকতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তত করুণার্দ্র হয়ে উঠেছেন।

নমিতাকে তিনি প্রকাশ্যে উপস্থাপিত করবেন না কিছুতেই—ও অনেক কষ্ট পেয়েছে, কষ্ট পেয়েও সে তার অস্তিত্ব এখনও বজায় রেখেছে। নমিতার একমাত্র নাম হতে পারত শিউলি—বড় নরম, নিজের অপূর্ব আঘ্রাণও বিজয়িনীর মতো বিশ্বের হাটে বিপণন করতে পারে না। গোলাপের মতন গরিমা নিয়ে স্বমহিমায় একটি বৃন্তে একাকিনী প্রতিষ্ঠিত থাকতেও পারে না। চয়নের আগেই মাটিতে ঝরে পড়ে শিউলি, দলিত হবার জন্যেই যেন অপেক্ষা করে।

বাংলায় নরম মাটিতে নমিতা নামটা বড্ড স্বাভাবিক, বড্ড প্রত্যাশিত, নিখিলেশ অনুভব করেন। বাঙালিরা নমিতাকে সহজে বুঝে নেবে, কাউকে নিন্দা করার, কাউকে ধিক্কার দেবার, সমালোচনা করার প্রশ্নই উঠবে না।

বাঙলার প্রকৃতিতেই যেমন শ্রবণের কান্না আছে. তেমন আছে নমিতাদের দুঃখ, যা অবশ্যই যন্ত্রণা দেয়, কিন্তু রোদনের অস্বস্তি সৃষ্টি করে না।

কাউকে কোনোরকমে বিব্রত বা বিরক্ত না করে নীরবে সমস্ত দুঃখকে অন্তরে প্রবাহিত করতে বাঙালি মেয়েদের যে তুলনা নেই তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় বাঙালির গানে। বাংলার কথাসাহিত্যে এর তেমন প্রকাশ নেই। আগে তবু কিছুটা প্রচেষ্টা ছিল, এখন বাঙালিরা দুঃখকে জয় করতে না পেরে দুঃখ থেকে সাময়িক ছুটি চায় পেইন-কিলারের মাধ্যমে। এই যে হিন্দি ছবির প্রেম, হিন্দি ছবির রূপকথা বাঙালিকে জয় করল তা স্যারিডন, অ্যানাসিন এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পেথিডিন ইঞ্জেকশন ছাড়া কিছু নয়। বেদনার কাছে পরাজিত হয়ে সাময়িক যুদ্ধবিরতি, কিছুটা সময় ভিক্ষা করে নেওয়া, যদি অঘটন কিছু ঘটে, নিষ্ঠুর যদি নিতান্ত খেয়ালের বশেই স্বভাব পরিবর্তন করে পরাভূতদের, দুঃখিনীদের কণ্ঠে জয়মালা পরিয়ে দেন। দিল্লির কাছে কুরুপাণ্ডবের রণক্ষেত্রে অর্জুনসারথি কৃষ্ণ তো মুহূর্তের জন্য দম্ভ করেছিলেন, পৃথিবীকে অধর্মমুক্ত রাখার দায়িত্ব তাঁরই। প্রায়ই তিনি ফিরে আসবেন এই বিশ্বসংসারকে অন্যায়ের গ্লানিমুক্ত রাখার জন্যে। উত্তর ভূখণ্ডে এই প্রতিশ্রুতিকে কেউ তেমন নির্ভরযোগ্য মনে করেনি, তারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করেছে, কিন্তু বাংলায় এখনও ভক্তির অভাব নেই, অবিশ্বাসের রেওয়াজ এখানে নেই। অধর্ম সংহারক ঈশ্বরের প্রত্যাশায় বসে আছে, কত অসহায় মানুষ ভাগ্য নিন্দিত ও বিড়ম্বিত এই জনপদে।

নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায় এখন সাফল্যের শিখরে। কয়েকজন প্রতিভাধর স্রষ্টার সাম্প্রতিক প্রয়াণের পর পাঠকের প্রত্যাশার সন্ধানী আলো তাঁর ওপরেই নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বিচিত্র জীবনের বিচিত্র মানুষদের পদধ্বনির প্রতীক্ষায় পাঠককুল উদগ্রীব। এই অবস্থায় সামান্য অপ্রাপ্তির গুঞ্জনও রয়েছে—যে-নিখিলেশ দারিদ্র্য বঞ্চনার মধ্যে কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত করে বাংলা সাহিত্যে সাধারণের জয়ধ্বনি করেছিলেন সেই নিখিলেশকে এখন কম পাওয়া যাচ্ছে। নিখিলেশ এখন উঁচুতলার ফ্ল্যাটের অধিবাসী। সচ্ছল ও সফল লোকেরা নিখিলেশের উপন্যাসে বেশি স্থান পাচ্ছে। যদিও নিখিলেশ বলেন, শুধু অর্থের দারিদ্র্য নয়, মনের দারিদ্র্য, স্বপ্নের দারিদ্র্য

যে একালের বাঙালিকে কলুষিত করছে তার ইতিবৃত্ত রচনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

এই মানসিক দারিদ্র্যের ছায়া কি সমগ্র ভূমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে? ভোগবাদী সভ্যতা কি চিত্তসমৃদ্ধির ক্ষেত্রে শোচনীয়ভাবে অনগ্রসর হয়ে মানবজাতির জন্য নানা নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে, যার ইঙ্গিত বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসন্ধানে বেরিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন। ভুবন মাঝিও তাঁর বিদেশ ভ্রমণ কাহিনিতে এই চিন্তার অবতারণা করছেন। তবুও পাঠকের বিশ্বাস পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। এই সময়ে নমিতার দুঃখের কাহিনিটা অবশ্যই লেখক নিখিলেশের প্রতি মঙ্গলদায়ক হতো।

কিন্তু নিখিলেশ যখনই ওই শীর্ণ নাতিবিশাল শ্যামলীর কথা স্মরণে আনেন তখন শতদুঃখের মধ্যেও এক কমললোচনাকে দেখতে পান। আবার কখনও দুর্গার কথা মনে পড়ে যায়। দুর্গতিনাশিনী দশপ্রহরণধারিণী মহিষাসুরমর্দিনী সালঙ্কারা গিরিরাজতনয়া দুর্গা নয় ; নিখিলেশের প্রেরণার উৎস লেখক বিভূতিভূষণের সৃষ্টি নিশ্চিন্দিপুরের কিশোরী দুর্গা। সেই কবে দরিদ্র হরিহরের পৈতৃক আবাস থেকে নির্গত হয়ে, আমবাগান, কাশবন পেরিয়ে, মৃত্যুর শাসন অবজ্ঞা করে যে বিশ্বভুবনের হৃদয়েশ্বরী হলো। ধন্য বিভূতিভূষণ। গোপালনগরের গ্রাম থেকে শতসহস্র বছরের মানসমূর্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন, সৃষ্টি করলেন বাঙালি দুর্গাকে, যাকে নিখিলেশ নিজে দেখেছেন পথের পাঁচালি উপন্যাসের পাতায়, সত্যজিৎ রায়ের আলোছায়ায়, আর একবার নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে মিনতির মাধ্যমে কলকাতার উপকণ্ঠে 'সোনার তরী' আশ্রমে। না, আশ্রম কথাটা ভুল হয়ে গেল। মিসেস ব্যানার্জি ভুলেও ওই আশ্রম শব্দটা ব্যবহার করতেন না, স্রেফ 'সোনার তরী'। তিনি তো বলতেন, "এটা তো স্থায়ী আশ্রয় নয়, লেখকমশাই—তরীর মধ্যে তীরে বসবাস। তবে এ আমার সোনার তরী। কবিগুরু থাকলে তাঁকে এনে দেখাতাম, তিনি আশীর্বাদ করতেন। হয়তো আর একটা কবিতাই লিখে দিতেন নতুন সোনার তরী : এখানকার লেখকদের মতন হাতগুটিয়ে বসে থাকতেন না।"

মিসেস ব্যানার্জির ওই কথাগুলোর মধ্যে জ্বালা ছিল, জ্বালা দিতে ভালোবাসতেন তিনি, যার জন্যে মিসেস ব্যানার্জি সকলের প্রিয় হয়ে

উঠতে পারলেন না। মিসেস ব্যানার্জি দমবার মেয়ে নন, বলতেন, "আমার মা ছিলেন কবিগুরুর স্নেহধন্যা, আর আমি ছিলাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয়। আর কারও ভালোবাসার ভিখিরি হয়ে বসে নেই আমি, লেখকমশাই।"

নিখিলেশ অনেক কথাই স্মৃতির ঝাঁপিতে সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছেন ; কিন্তু ওই নমিতাকে নিয়ে কিছু লেখার লোভ সংবরণ করেছেন। নমিতার জন্য একধরনের দায়িত্ব বোধ করেন নিখিলেশ। অনেক কষ্ট পেয়েছে নমিতা, তাকে আরও কষ্ট দেবেন না নিখিলেশ। না-হয় একটা বই কম লেখা হলো। কত কম বইয়ের লেখক হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এবং বিভূতিভূষণ, এমনকি শরদিন্দু কালের আসরে স্থায়ী আসন লাভ করলেন ; আবার কত শতশত বইয়ের জনক হয়েও সময় কোনো স্বীকৃতি দিল না, নিষ্ঠুরভাবে মুছে ফেলল সমস্ত সৃষ্টিকে। খেয়ালি সময়, তুমি যে কার কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করো, কার ডালি থেকে কী গ্রহণ এবং কী বর্জন করতে চাও তা যদি লেখকরা জীবিতকালে হৃদয়ঙ্গম করতেন তা হলে স্রষ্টাদের জীবন কত শান্তিময় হতো!

নিখিলেশ দেশান্তরে বসেও আজকাল সময়ের প্রহরীকে দূর থেকে দেখবার চেষ্টা চালিয়ে যান। চিরকালের কাননে কীসের জোরে প্রবেশপত্র পাওয়া যায় তা ঠিক বুঝতে পারেন না। নিখিলেশ শুধু এইটুকু আন্দাজ করেন, কেউ একটি ফুলের স্তবক উপহার দিয়েও সময়ের প্রবেশপত্র লাভ করে। আবার কেউ গাড়িবোঝাই ভেট এনেও অনাহূতের মতো ফিরে যায়। নিখিলেশ কল্পনা করেন, সংখ্যার কোনো মূল্য নেই। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠী মূল্য দেয় শ্রেষ্ঠত্বকে। যার আর এক নাম বোধহয় পূর্ণতা। কিন্তু কালের প্রহরী, আপনি বঙ্গীয় লেখকের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অনবহিত নন। তাকে সংখ্যার মধ্যেই বেঁচে থাকতে হয় প্রতিদিন, লেখো, লেখো আরও লেখো। নতুন লেখা না এলেই বিস্মৃত হবার ভয়, মুছে যাবার আশঙ্কা।

দেশান্তরেই নিখিলেশের আবার মিনতির কথা মনে পড়ে গেল। এতো দূর যখন আসা গিয়েছে, তখন একবার মিনতির খোঁজ করা মন্দ নয়। মিনতি নিশ্চয় খুশি হবে নিখিলেশকে দেখলে।

এবার বিদেশে এসে নিখিলেশ বহু প্রবাসী বাঙালির গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। একসময় বিদেশে এলেই নিখিলেশ হোটেলে আশ্রয় নিতে ভালোবাসতেন। হোটেলের সপক্ষে অনেকেই বলে থাকেন। প্রথম হোটেলে পাওয়া যায় যথেচ্ছ স্বাধীনতা—যখন যেখানে খুশি যাও, যখন খুশি ফেরো, তোমার ঘরে আসতে বলো। সেই সঙ্গে উপভোগ করো একাকীত্ব--নিজের সঙ্গে মোকাবিলা সংসারে আপনজন পরিবৃত হয়ে অনেক সময় শক্ত হয়ে ওঠে। নিজেকে জানবার জন্যেই, নিজের মুখোমুখি হবার জন্যেই আগেকার ঋষিরা নির্জন তপস্যায় বসতেন। এখন ওই ধরনের তপস্যা সম্ভব নয়, কিন্তু প্রায় একই ফল হোটেলের রুদ্ধদ্বার একাকীত্বে, সব কিছু আছে, অথচ কিছুই নেই। শরীরের শাসন নেই, অথচ মনের শাসন চলতে পারে নিরন্তর। নিখিলেশ অনেক গল্পের সূত্র খুঁজে পেয়েছেন হোটেলঘরে।

হোটেলের পক্ষে আরও যুক্তি আছে। বিদেশে হোটেলগুলো থাকে শহরের কেন্দ্রস্থলে, আজকাল মার্কিনী স্টাইলে পৃথিবীর সর্বত্র যাকে ডাউনটাউন এলাকা বলা হয়। যত্রতত্র ঘুরে যথাসময়ে নীড়ে ফিরে আসা ভ্রাম্যমাণ বিহঙ্গের পক্ষে সহজ। প্রতিষ্ঠিত ভারতীয়রা, যাঁদের পক্ষে অতিথি আপ্যায়ন সহজসাধ্য, তাঁরা থাকেন মূল শহর থেকে দূরে শহরতলিতে। মফস্বলটাই আজকের দুনিয়ায় বসবাসের শ্রেষ্ঠ স্থান, কিন্তু দু'দিনের অতিথিকে মূল শহরের সঙ্গে সংযুক্ত রাখতে হিমশিম খান গৃহস্বামী।

হোটেলে আর আছে যাকে খুশি আহ্বানের স্বাধীনতা যা উদার গৃহস্বামী অতিথিকে দিতে চাইলেও সবসময় অতিথির পক্ষে নেওয়া শোভন মনে হয় না।

এইসব যুক্তির জোরেই প্রথম দিকে নিখিলেশ কয়েকবার হোটেলবাসী হয়েছেন। কিন্তু এখন তাঁর মত পরিবর্তিত হয়েছে আমূল। নিখিলেশ লক্ষ্য করেছেন, পরিবার মানেই অভিজ্ঞতার স্বর্ণখনি। দুই দশক ধরে গৃহস্বামী যেসব ঘটনা তিলেতিলে লক্ষ্য করেছেন, সঞ্চয় করেছেন তা দু'দিনে ভ্রাম্যমাণ লেখকের নিজস্ব হয়ে যায়। নতুন দৃষ্টিকোণ খুঁজে পান নিখিলেশ, সেই সঙ্গে একটি পরিবারকে, ক'টি মানুষকে সবসময় কাছ থেকে দেখার

দুর্লভ সুযোগ যা হঠাৎ কল্পনার দ্বার মুক্ত করে দেয়, নতুন লেখা সহজ হয়ে যায় অনেক। এইভাবেই নিখিলেশ লিখেছেন তাঁর শেষ ভ্রমন্যাস 'ভুবন মাঝির দিনলিপি'। তার আগে লিখেছিলেন : 'ভুবন মাঝি মাঝদরিয়ায়'। ভূমধ্যসাগরকে মাঝদরিয়ায় রূপান্তরিত করেছিলেন নিখিলেশ।

আবার বিদেশে আসবার সুযোগ পেয়েছেন নিখিলেশ। রাহাখরচের ব্যবস্থা একটা হয়ে যায়, পথের কড়িটুকু পকেটে রেখে কোনোরকমে ভ্রাম্যমাণ থাকা। ঘুরে বেড়ানোর এই তাগিদ ঠিক বিলাসিতা নয়। নিখিলেশ লক্ষ্য করেছেন যাঁরা সংসারে এবং সুখে মোটেই আসক্ত নন তাঁরাও ভ্রমণে ব্যাকুল। তিন জনের কথা মনে পড়ে—একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, একজন আশ্রমবাসী রবীন্দ্রনাথ, আর একজন আমাদের যুগের সত্যজিৎ রায়। আরও ছোট উদাহরণ আছে—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ো। সমরেশ বসু—পায়ের তলায় সরষে নিয়ে যেন ওঁর জন্ম। এমনকি বিমল মিত্রকেও ঘরকুনো অপবাদ দেওয়া যায় না, সুযোগ পেলেই দূর তাঁকে হাতছানি দেয়, ভারতবর্ষের পথঘাট মানুষকে এইভাবেই তো আবিষ্কার করা। আসলে, ভ্রমণটা লেখকের বিলাসিতা নয়, বিনোদন নয়, নিতান্তই শেষ হয়ে আসায় ব্যাটারিতে চার্জ দেওয়া। যেদিন নিখিলেশ এই ঘোরার শক্তি হারিয়ে ফেলে গৃহবন্দী অথবা নগরবন্দী হবেন সেদিন দুঃখের শেষ থাকবে না, পৃথিবী সত্যিই তখন তার দ্বার বন্ধ করে দিচ্ছে বুঝতে হবে।

যার গৃহে আশ্রয় মিলেছে তার নাম রাজকমল মজুমদার। গৃহলক্ষ্মীটিও সর্বগুণান্বিতা—নাম মধুলেখা। আগে মিত্র ছিল। মধুলেখা রূপসী, সপ্রতিভ ও সুরসিকা। রসবতী শব্দটা আজকাল ব্যবহৃত হয় না, কিছুটা অন্য অর্থ হয়ে গিয়েছে। মধুলেখা বলে, রাজকমলের সঙ্গে বিয়ে হবার পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি মজুমদার টাইটেলটা। অনেক ভেবে দাদু নাম দিয়েছিলেন মধুলেখা মিত্র। রায়, ঘোষ, দত্ত ইত্যাদি হলে বিপর্যয় ঘটে যেত মধুলেখা নামটার।

"তা হলে কোনো মুখার্জিকে দেখা উচিত ছিল তোমার", রসিকতা করে রাজকমল।

"মুখুজ্যে হচ্ছে বাউন, আর আমরা হলাম কায়েত।"

"মোদক?"

"মধুলেখার সঙ্গে মোটেই 'রাইম' করে না, মশাই। জিজ্ঞেস করো লেখককে।"

নিখিলেশ বললেন, 'ঈশ্বর যা করেন তা ভালোর জন্যেই করেন। মধুলেখা মোদক হয়ে অন্য কোথাও ঘরসংসার করলে আমি আজকের এই আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হতাম।"

এদের দু'জনের বয়সই নিখিলেশের থেকে অনেক কম—প্রায় এক প্রজন্মের দূরত্ব। কিন্তু এই প্রজন্মকে বেশ ভালো লাগে, এদের দাম্পত্যজীবনে সখ্যভাব প্রবল, সবটাই ধর্মীয় দায়িত্ব অথবা ভবিতব্যের বন্ধন বলে মেনে নেওয়া নয়।

বিদেশে বসবাস করলেও রাজকমল ও মধুলেখা স্বদেশের সাহিত্যের সঙ্গে কিছুটা যোগাযোগ রেখেছে। বাংলার গান, বাংলার কবিতা, বাংলার কথাসাহিত্য যে প্রবাসের প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কত মানুষকে বাঙালিত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করছে তা ভাবলে নিখিলেশ অবাক হয়ে যান।

তবু স্বদেশের দুঃখ দূর থেকে এদের মন উদ্বেল করে তোলে। বাড়ির বিশাল লনে মধুলেখা দুটো হাল্কা চেয়ার পেতে দিয়েছে। মিউজিয়ম থেকে ফিরে ক্লান্ত নিখিলেশ ওইখানে বিশ্রাম নিচ্ছেন। একটু আগে মধুলেখা নিজের হাতে কফি পরিবেশন করেছে। বলে গিয়েছে, আরও যা দরকার তা এই তারহীন কলিংবেল টিপে ইঙ্গিত দিতে। বেতার যন্ত্র আছে এই ছোট্ট বেলের মধ্যেও যা মধুলেখাকে ডেকে পাঠাবে। বড় স্নেহময়ী মেয়েটি। স্বদেশে পিতৃগৃহে অতিমাত্রায় আদরে অভ্যস্ত ছিল। পরিবেশের চাপে সে-ই আজ সুগৃহিণী—দশভুজা। মধুলেখা ঘর পরিষ্কার করে, রাঁধে, বাজার করে, গাড়ি চালায়, অতিথি আপ্যায়ন করে। সামান্য সমৃদ্ধির সার পড়লে বাঙালি মেয়েরা কেমন শতদলে বিকশিত হয়ে ওঠে তা দেখবার জন্যেও সাগরপারে আসা প্রয়োজন।

রাজকমল একটা মানচিত্র রেখে গিয়েছে। আগে নিখিলেশ নতুন জায়গায় গিয়ে দিক্‌হারা বোধ করতেন। তারপর একজন পরামর্শ দিলেন, মানচিত্রের শরণাপন্ন হও। সেই থেকেই নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

নিখিলেশ স্থানীয় মানচিত্র সংগ্রহ করেন, যেসব জায়গায় পদার্পণ হলো তা রঙিন কালিতে দাগ দেন।

স্মৃতি আজকাল প্রায়ই ঠকায়, মানচিত্র থাকলে নামের ভুল হয় না, স্থানগুলি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। শহরের মানচিত্রের বাইরেও স্থানীয় রাজ্যের মানচিত্র থাকে। উদ্ধত পশ্চিম শুধু প্রকৃতিকে জয় করেনি, দূরত্বকে পরাভূত করেছে। একশ মাইল দেড়শ মাইল কোনো দূরত্বই না।

আর সেই যে সুরসিক প্রবাসী ভদ্রলোক, যিনি নিখিলেশকে বলেছিলেন, গাড়ি দেখে এখানে কাউকে বিত্তবান মনে করবেন না। কলকাতায় যেমন সবার রবারের চটি থাকে, এদেশের গাড়িও তাই। এই গাড়ি আপনাকে নিয়ে যেতে পারে ভুবনডাঙার শেষ প্রান্তে। ভুবন মাঝি ছদ্মনাম বোধহয় নতুন যুগে অচল। যদিও ওর মধ্যে কাব্য আছে, স্থিরতা আছে, কিছুটা নদীমাতৃক বাংলার স্মৃতি আছে। কিন্তু মাঝি এখন কোথায় নিয়ে যায়? এখন তো ভুবন ড্রাইভারের যুগ। যদি ড্রাইভার কথাটা নিতান্তই অস্বস্তির সূচনা করে তাহলে ভুবনসারথি। কিন্তু 'সারথি' শব্দটার মধ্যে একটু রাজকীয়তা প্রচ্ছন্ন রয়েছে যা ড্রাইভারে নেই। নতুন যুগের ছেলেমেয়েরা বোধ হয় ভুবন ড্রাইভারকেই মেনে নেবে।

নিখিলেশ দেখলেন এই যে মাঝারি শহরে বসবাস করছেন তার থেকে কিছু দূরে আর একটি পরিচিত জনপদের নাম জ্বলজ্বল করছে। না, এই জনপদে নিখিলেশ কখনও যাননি, কিন্তু একটি মেয়ের মুখ আবার ভেসে উঠেছে। তার নাম নমিতা। এই মেয়েটিই একদিন নিখিলেশের দিকে বড়-বড় চোখ করে জিজ্ঞেস করেছিল, জায়গাটা কোথায়? নরেন্দ্রপুর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে চব্বিশ পরগনার মেয়ে পৃথিবীর মানচিত্রের খোঁজ করছে।

জায়গাটা জানা ছিল না নিখিলেশের। ম্যাপ দেখে খুঁজে বের করলেন তিনি। তারপর দেখালেন নমিতাকে। সেইসময় মিসেস ব্যানার্জি বললেন, "আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর আপনি এখানে!" মিসেস ব্যানার্জি এরপর শুধু বললেন, "নমিতা। তুমি। একবার!" মিসেস ব্যানার্জি এরপর শুধু বললেন, "নমিতা। তুমি। একবার!" আর বলতে হলো না, নমিতা শান্তভাবে ওখান থেকে উঠে গেল। একবার নিখিলেশের মনে হয়েছিল,

নমিতা ওইভাবে উঠে গেল কেন? তারপর ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলেন নিখিলেশ। মঙ্গলদায়িনী মিসেস ব্যানার্জি। ঘর থেকে বিতাড়িত ব্যানার্জি আপত্তি করলেন না, অপ্রস্তুত হলেন না। ব্যাপারটা তাঁর গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। যখন প্রণাম করছে তখন ওদিকে নজর না দিয়ে মিসেস ব্যানার্জি কথা বলতে শুরু করেছেন নিখিলেশের সঙ্গে।

মিসেস ব্যানার্জি বোধহয় কারও কাছে 'থট রিডিং' শিখেছিলেন। মুখ দেখে উনি প্রায়ই আন্দাজ করে নেন মানুষটার ভিতরে কী চিন্তা কাজ করছে। তিনি বললেন, "ওরা সবাই প্রণাম করতে চায়, আমি বাধা দিই না। আমি ভেবে দেখেছি, যদি কেউ ভক্তি করতে চায় তাকে বাধা দেবার আমি কে?"

নিখিলেশ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন ওর কথা। মিসেস ব্যানার্জি বললেন, "এই যে প্রাচীন যুগে প্রণামের ব্যবস্থা ছিল তার একটা মানসিক যুক্তি আছে। কত রকমের প্রণাম যেন? আমি ওদের বলতে গিয়ে ভুলে গেলাম।"

"সাষ্টাঙ্গ প্রণাম", নিখিলেশ ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

"হ্যাঁ। এতোগুলো অঙ্গর কথা ওয়ার্লডের কেউ ভাবতে পারেনি, এই ইন্ডিয়া ছাড়া। যেসব ফরেন ভিজিটর আমার এখানে আসে তাদের সামনে ডিমনেস্ট্রশন করাব ভাবছি—একটু কিছু শিখে যাক। কী বলেন লেখকমশাই?"

"ভারতবর্ষের যা কিছু ভালো তা দেখুক। কিন্তু তা বলে...ওই নিচু হওয়া...আনত হতে ইন্ডিয়ার যে তুলনা নেই তা দুনিয়ার কারুর জানতে বাকি নেই, ইতিহাসের বই খুললেই খবরগুলো বেরিয়ে পড়েছে।"

"যদি কিছু মনে না করেন", মিসেস ব্যানার্জি বলেছিলেন, "এটা হলো নেগেটিভ মনোবৃত্তি। স্বেচ্ছায় নত হওয়া আর বন্দী অবস্থায় বিজয়ী শত্রুর সামনে নত হওয়া তো এক জিনিস নয়, লেখকমশাই। ওই যে কবিগুরু লিখে গিয়েছেন—যে গানটা আমি মেয়েদের শিখতে বলি, কিন্তু ওদের গলায় সুর নেই—আমার মাথা নত করে দাও হে প্রভু তব চরণধুলায়..."

মিসেস ব্যানার্জির মাথায় ব্যাপারটা ঢুকে গিয়েছে। "জানেন, মায়ের কাছে শুনেছি, আশ্রমে কবিগুরুর চরণস্পর্শ করত সবাই। সেটা পছন্দ হলো

না সায়েবদের। দেশে গিয়ে দু'একজন বিরূপ মন্তব্য লিখে ফেললেন ওঁর মতন মানুষের বিরুদ্ধে। উনি ওইসব পড়েছিলেন, কোনো মন্তব্য করেননি, কিন্তু পদধূলি নেওয়া বন্ধ করেননি।"

নিখিলেশের মনে আছে, মিসেস ব্যানার্জি বলেছিলেন, "জানো ওইটাই আমার মা শিখে এসেছিলেন কবিগুরুর কাছ থেকে—চাপে পড়ে কিছু ত্যাগ কোরো না, বরং আঁকড়ে ধরো। মায়ের কাছ থেকে ব্যাপারটা আমার মধ্যেও এসে গিয়েছে, লেখকমশাই।"

মিসেস ব্যানার্জি ব্যাপারটা ছাড়তে চাইছেন না। বললেন, "সাষ্টাঙ্গ ব্যাপারটায় আমার হিসেব গুলিয়ে যায়। নিখিলেশের মনে ছিল। পছন্দ না করলেও অনেক জিনিস মনে রাখতে হয় লেখককে। নিখিলেশ বলেছিলেন, "জানু, পদ, পাণি, বক্ষ, বুদ্ধি, শির, বাক্য ও দৃষ্টি এই অষ্টঅবয়ব দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা। সায়েবরা এই ধরনের প্রণামের কথা শুনে খুব কৌতূহলী হয়ে ওঠে।"

"হবেই তো। হ্যান্ডশেক ছাড়া বেচারারা তো কিছুই শিখতে পায়নি", মন্তব্য করেছিলেন মিসেস ব্যানার্জি।

এতো বাইরের কথা হচ্ছে, কিন্তু যে জন্যে নমিতাকে ঘরের বাইরে বের করে দেওয়া সে সম্বন্ধে আলোচনা নেই। শেষে বলেছিলেন, "ভীষণ গোপন। এখানে কেউ জানবে না কিন্তু..."

সেসব গোপনীয়তা ভঙ্গের কোনো প্রয়োজন নেই নিখিলেশ যখন নমিতাকে নিয়ে গল্প লিখবেন না। গল্প লেখা তো সহজ ব্যাপার। কিন্তু সে তুলনায়...মিসেস ব্যানার্জি নিজেই গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, "একটা মেয়েকে তিলে-তিলে গড়ে তোলা, সে যে কি কঠিন কাজ, লেখকমশাই। এদেশে কেউ কিন্তু বুঝতে চায় না।"

মিসেস ব্যানার্জি চেয়েছিলেন, দেশের লোকরা ব্যাপারটা বুঝুক।...কিন্তু সেসব তো অন্য কথা।

এখন বিদেশে বসে, একটা ম্যাপের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া একটা নামকে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া। আবিষ্কার করা, তার খুব কাছেই নিখিলেশ চলে এসেছেন অজান্তে। এই নামটার মধ্যেই শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গিয়েছে নমিতা

নামের একটি মেয়ে, যে নিখিলেশের বুকের মধ্যে পথের পাঁচালির দুর্গার মতন বসে আছে।

হরিহর, সর্বজয়া, দুর্গা, অপু। দুর্গার মা সর্বজয়াই বটে। সব কিছুতে হেরে গিয়েই এদেশের মেয়েরা সর্বজয়া হয়। কারণ দুঃখ এদের পরিবৃত করেও জয় করতে পারে না। বরং শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ করে সর্বজয়াদের কাছে। কিংবা পৃথিবীর মানুষ শেষপর্যন্ত সর্বজয়ার পক্ষেই রায় দেয়, কারণ সমস্ত দুঃখের মধ্যেও সুগম্ভীর মর্যাদা খুঁজে পেয়ে মানুষ বিস্ময়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে।

অণিমার গল্পটা আরও কঠিন। একমাত্র পথের পাঁচালির লেখকই হয়তো ওই গল্প লেখার দায়িত্ব নিয়ে পারতেন। কিন্তু তিনি তো নেই। বরং পথের পাঁচালির গল্পটা যদি এমন হতো দুর্গা আছে, অপু আছে, কিন্তু হাতের গোড়ায় পরিবারের কর্তা হরিহরকে পাওয়া যাচ্ছে না। হরিহর আছে না নেই? নিখিলেশ নিজেই মুহূর্তের জন্যে চিন্তার ইঞ্জিন বন্ধ করে পাথরের মতন বসে রইলেন। নতুন গল্পটা যদি বিভূতিভূষণের হাতে পড়ত এবং তিনি যদি জানতে চাইতেন হরিহর আছে না নেই? তাহলে কী উত্তর দিত নিখিলেশ? ঠিক জানি না—এমন উত্তর তো হয় না। বিভূতিভূষণ নিশ্চয়ই বিরক্ত বোধ করতেন, গল্পের মূল চরিত্রগুলো সম্বন্ধে এত অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে কোনো লেখক অবশ্যই সাহিত্য যশপ্রার্থী হতে পারে না। আর সর্বজয়া?

নিখিলেশ যেন শতসহস্র পথের পাঁচালি, পাঠক পরিবৃত্ত হয়ে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তেপান্তরের মাঠে, যার একটি পথ পাক খেয়ে-খেয়ে চলে গিয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের দেশে। নিখিলেশ সেই পড়ন্ত বেলায় সমবেত মানুষদের বলছেন, 'ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রোমহোদয়াবৃন্দ, আপনারা স্বীকার করবেন, এই উপন্যাসে সর্বজয়াই সব। তাঁর উপস্থিতিই সর্বাত্মক। হরিহর কখনও আছেন, কখনও নেই। অপু-দুর্গার মধ্যে দুর্গা যে বিসর্জনের জন্যেই তৈরি তা তো আপনাদের অজানা নয়। অপু একটি বালকমাত্র। সে নিষ্পাপ, কিন্তু অসহায়। তার কিছু করবার নেই। কিন্তু সর্বজয়া? তাঁকে বাদ দিয়ে পথের পাঁচালি কল্পনা করতে পারেন আপনারা? ভদ্রমহোদয়গণ, এই অবস্থায় যদি সৃষ্টিকর্তা

বিধাতা সর্বজয়াকে আমাদের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নেন, তা হলে কী হয়?'

"মেসোমশাই, আপনার জন্যে চা এনেছি।" মধুলেখা ডাকছে নিখিলেশকে। মধুলেখা বুঝতে পারে নিখিলেশ কোনো গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে রয়েছেন। মধুলেখা আন্দাজ করতে পারে, চিন্তার অতলান্ত সমুদ্রে ডুব দিয়ে গল্পের প্রাণভ্রমরাকে উদ্ধার করে আনতে হয় নিখিলেশকে। এমনি করে বিশ্বসংসারে থেকেও না-থাকার মতন অবস্থা না হলে সৃষ্টির দেবী তাঁর মানসপুত্রকে আশীর্বাদ করবেন কেন?

রাজকমল কাজ থেকে ফিরে এসেছে। ওরা দু'জনেই দুটো হাল্কা ফোল্ডিং চেয়ার নিয়ে এসে নিখিলেশের সামনে বসল। নিখিলেশকে ওরা আপন করে নিয়েছে। প্রবাসের বাঙালি পরিবারের অসীম ক্ষমতা থাকে ভালোবাসা দেবার। শুধু স্বদেশেই মানুষ সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। উপায় থাকে না, বোধহয়। পাকেচক্রে মানুষ ক্ষুদ্র হয়। কিন্তু বাঙালিরা যে মহৎ তা দেখতে হলে চলে যাও বিদেশে। বাঙালি যখন বিকশিত হয় তখন সে শতদল পদ্মের মতন, তার কোনো তুলনা থাকে না। আগে একটা পদ্মের কথা ভাবতেন নিখিলেশ। কিন্তু রাজকমল ও মধুলেখাকে দেখে এখন সবসময় নিখিলেশের একই বৃন্তে দুটি ফুলের কথা মনে পড়ে—একজন উজ্জ্বল, সফল, সার্থকনামা পুরুষের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসে না যতক্ষণ না তার পাশে একটি উজ্জ্বল আনন্দময়ীকে দেখা যায়। বাঙালির ঘরে-ঘরে যত হরিহর সর্বজয়া আছে তারা রাতারাতি কারও আশীর্বাদে রাজকমল ও মধুলেখায় রূপান্তরিত হোক, নিখিলেশ প্রার্থনা করলেন।

দুটি ফুলের সঙ্গে একটি কুঁড়ি? না দুটি কুঁড়ি? নিখিলেশ ভাবলেন, হরিহর সর্বজয়ার সংসারে শুধু অপু অথবা দুর্গা থাকলে গল্পটা নষ্ট হয়ে যেত। অপুর জন্ম হয়নি, অথচ দুর্গার বিসর্জন হলো—এমন গল্প বীভৎস রসের সৃষ্টি করত। সেই শূন্যতায় সর্বজয়া অবশ্যই আর বিজয়িনী থাকত না, নিখিলেশ নিশ্চিত। সাধে কি আর নমিতার জন্যে মমতায় ভরে ওঠে নিখিলেশের মতন একজন নিষ্ঠুর গল্পসন্ধানীর মন, সাধে কি নিখিলেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নমিতা চিরদিন তার মনের মধ্যে বসবাস করবে। সে সুখী

হোক—এছাড়া কোনো কামনা নেই নিখিলেশের।

কিন্তু ওই যে চেনা নামের জায়গাটা, যেটা আজকের এই অল্প সন্ধ্যায় নিখিলেশ মানচিত্রের মধ্যে আবিষ্কার করলেন। না, ঠিক আবিষ্কার নয়—হারিয়ে গিয়েছিল, আবার খুঁজে পেলেন নিখিলেশ প্রবাসের এই শান্তসন্ধ্যায় যা নিখিলেশের নিজের রেশেই বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে।

বিষণ্ণ হবার কোনো প্রয়োজন নেই। রাজকমল বলেছে, এখানে কার্নিভ্যাল আছে—আনন্দ ও আলোর উচ্ছ্বাস সেখানে। এখানে উত্তাল সমুদ্রতীরে সোনার বালুচর আছে যার নাম গোল্ডেন বীচ—সেখানে আনন্দ আছে। নিখিলেশ ইচ্ছে করলে নাইট ক্লাবেও উপস্থিত হতে পারেন রাজকমলের সঙ্গে। সেখানে নৃত্য আছে, সঙ্গীত আছে। আসলে পশ্চিমের সভ্যতা সারাক্ষণ উত্তাল আনন্দকে সন্ধান করছে, তাকে উপভোগ করছে।

এসব নিখিলেশ কয়েকবার দেখেছেন। অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করছেন। তরুণ পাঠকদের প্রশংসাও কুড়িয়েছেন। কিন্তু এবার ওসবের দিকে নজর নেই। এবার নিজের কাছেই বন্দী হয়ে পড়ছেন নিখিলেশ—নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠছে মনটা। এক-এক সময় ভয় হচ্ছে—যে বিপুল সাফল্য এসেছে তার মধ্যে কোথাও ফাঁকি আছে। সময়ের প্রহরীর কাছে শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ে যাবেন নিখিলেশ। তখন প্রবেশপত্র কেড়ে নেওয়া হবে নিখিলেশের কাছ থেকে। কালের আসরে কেমনে দেখাবে মুখ, নিখিলেশ?

রাজকমল বলছে, প্রয়োজনে কয়েকদিন ছুটি নেবে সে। ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সব দেখাবে নিখিলেশকে। বিব্রত বোধ করার প্রয়োজন নেই নিখিলেশের, কারণ সে উপভোগ করবে নিখিলেশের সান্নিধ্য। প্রবাসে অনেক সুখ আছে, সমৃদ্ধি আছে, কিন্তু কোথাও নির্বাসিতের দুঃখও লুকিয়ে রয়েছে। চেনা কেউ দূর থেকে হাজির হলে নির্বাসনের সেই বেদনা কয়েকদিনের জন্যে ভুলে যাওয়া যায়। রাজকমল তার অতিথিদের সঙ্গে ভারতবর্ষে ফিরে যায় টিকিট না কেটেই। এখন আবার দেশে ফিরতে হলে ভিসা করাতে হয়, স্বদেশের পাসপোর্টটা রাখা হয়নি কর্মজীবনের তাগিদে। জন্মভূমিতে ফেরার জন্যে যখন ভিসা দেখাতে হয় তখন কষ্ট লাগে, নিজেকে সফল মনে হয় না। মধুলেখা ভাগ্যবতী—তার পাসপোর্ট ইন্ডিয়ান। দেশে চলে

যেতে পারে গটগটিয়ে বুক ফুলিয়ে—কেউ ভিসা দেখাতে বলবে না।

ম্যাপের যে-জায়গাটা হঠাৎ জোনাকির মতন জ্বলে উঠে হাতছানি দিল নিখিলেশ তার প্রসঙ্গ তুললেন। শুধু নামটা। তার পিছনে কী আছে সেসব কথা সযত্নে আড়ালে রইল। রাজকমল বলল, "মাত্র কয়েকশ মাইলের দূরত্ব। এমন কিছু নয়—গাড়িতে ডালভাত বলা যেতে পারে।" ওখানে বসবাসের ব্যবস্থাও হতে পারে। রাজকমলের বন্ধু সুবিনয় দত্ত ওর কাছাকাছি আছে।

বিজনেস করে সুবিনয়। আগে চাকরি করত। তারপর খেয়াল হলো এই বিদেশে ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালিরাই সবচেয়ে পিছিয়ে আছে বিজনেস করে না বলে। গুজরাতির চাকরির মোহ নেই—বিজনেস তার স্বভাবে। তাই বিত্তের মুখ দেখেছে গুজরাতি, বাঙালি শুধু চাকরি করে আর ছেলে পড়িয়ে মরছে। কলকাতায় নাম ডাক হচ্ছে, কিন্তু এখানে কিছু নয়—একটা কালীবাড়ি গডবার মুরোদ নেই। অথচ ব্যবসায়ী ভারতীয়রা পাথরের মন্দির গড়ছে যা দেশের সেরা মন্দিরের সঙ্গে পাল্লা দেবে। ইন ফ্যাক্ট, নিখিলেশ হয়তো জানেন না, পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের বাইরে এত মন্দির এবং এতো গুরুদ্বার কখনও তৈরি হয়নি।

প্রচণ্ড উৎসাহিত বোধ করছেন নিখিলেশ। আগামিকাল রাজকমল বেরুচ্ছে নিখিলেশের সারথি হয়ে। নিখিলেশ যেখানে যেতে চাইবেন সেখানে পৌঁছে দেবে রাজকমল। ইচ্ছে করলে নিখিলেশ ফিরে আসতে পারেন রাজকমলের সঙ্গে। ইচ্ছে না করলে, থাকতে পারেন তাঁর অভিপ্রেত স্থানে। সুবিনয় দত্ত রয়েছে, খুব খুশি হয়ে আপ্যায়ন করবে। ওর বউ শোভনা এখনও বাংলা গল্পের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। যদিও সুবিনয় বই পড়ে না, বই পড়বার সময় নেই সুবিনয়ের। তাছাড়া হয়তো পড়ে আনন্দ পায় না। নিখিলেশ দেখেছেন প্রবাসের পরিবেশে বাংলা গল্প-উপন্যাসের পরিবেশ, বিষয়বস্তু অনেক সময় অর্থহীন হয়ে পড়ে। ইংরিজিতে যাকে বলে রেলেভেন্স—প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পায় না অনাবাসীরা। সুসঙ্গতি না থাকলে প্রবাসে শিক্ষিত মন কিছু গ্রহণ করতে পারে না। দোষ দেওয়া যায় না। অন্তত নিখিলেশ রাগ করেন না যখন বিদেশে শোনেন

তাঁর বই কেউ পড়েনি, বা পড়তে নিয়ে আগ্রহ রক্ষা হয়নি। রাগ না করে বরং ভাবতে বসেন নিখিলেশ, বহু সাফল্যের পর এই ব্যর্থতা আর একবার মনে করিয়ে দেয় কবির আক্ষেপ—যাঁর কবিতাগুলি হলেও বিচিত্রগামী হয়নি সর্বত্রগামী।

"উঠুন। নিজের কোমরে নিজে দড়ি বাঁধুন", গাড়িতে ওঠার সময় রসিকতা করল রাজকমল মজুমদার।

ছেলেটি এক-একসময় চমৎকার কথাবার্তা বলে। বাংলা সাহিত্যের লেখক হলে কাজে লাগত। কিন্তু কে এখন বাংলায় লেখক হতে চাইবে বেকার অথবা মফস্বলের মাস্টার ছাড়া? নিখিলেশের দুঃখ বঙ্গসরস্বতী আর ভালো পূজারি পাচ্ছেন না—দেশের সেরা মানুষরা একসময় বাংলায় কিছু লিখে ধন্য হতে চাইতেন, এখন তাঁরা অন্যত্র ব্যস্ত। বাঙালিদের আর্থিক দারিদ্র্য বঙ্গসরস্বতীকেও এবার ছেঁড়াকাপড় পরতে বাধ্য করবে। একমাত্র সান্ত্বনা, নিখিলেশকে তা নিজের চোখে দেখে যেতে হবে না। তাঁরও তো বয়স হচ্ছে। নিখিলেশের একবার লোভ হলো বলেন, অনাবাসীদের কাছে বঙ্গসরস্বতী কিছুই পাননি। রাজকমল, তোমরা দূর থেকে দু'একটা ফুল ছুড়ে দাও না সরস্বতীর চরণকমলে। হোক না একটু কষ্ট, মাতৃভাষার প্রতি তোমাদেরও তো কিছু দায়িত্ব আছে।

কোমর বাঁধা ঠিক হলো কি না নিশ্চিত করে নিচ্ছে। "গাড়ির গতি যত দ্রুত ছিটকে পড়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করার ভয় তত বেশি", বলছে রাজকমল।

"গতি যত বাড়ে থামা তত শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, ভুবন মাঝি", বলছে রাজকমল। ভুবনবাবু বলল না রাজকমল।

নিখিলেশ ভাবছেন, রাজকমল আজ সকালে বোধহয় দেবী সরস্বতীর চরণামৃত পান করেছে। ওর প্রতিটি কথা বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠছে।

গাড়ি চলমান হয়েছে, কিন্তু গতি এখনও তেমন নয়। নিখিলেশ ভাবলেন, সত্যিই তো বিশ্বসংসারে কত লোকই নিজের কোমরে দড়ি পরাতে বাধ্য হয়। কেউ-কেউ তো গুটি পোকার মতো নিজের লালায় নিজেকে বন্দী করে রাখে, পালাবার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। মিসেস ব্যানার্জিও সদম্ভে একই কথা বলতেন, "এই সোনার তরীতে এসে আমি নিজেকে

বেঁধে ফেলেছি মোটা কাছিতে, লেখকমশাই। আমি আগে ছিলাম মাছ ধরার ছিপ, যেখানে-সেখানে যখন খুশি ঘুরে বেড়াতাম। আমার এই স্বেচ্ছাবন্দী হওয়ার দুঃখ যদি কেউ বোঝে সে আপনি।"

তারপর যখন খ্যাতি এলো, যখন এই বিদেশ থেকে সায়েবরা গেল—ওই যে ওই চেনাজানা নামটা—তখন মিসেস ব্যানার্জির মধ্যে স্বভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন নিখিলেশ। তিনি কানে নিলেন না কথাটা। মিসেস ব্যানার্জির তখন এগিয়ে যাবার নেশা। বললেন, "আমার মাকেও কবিগুরু বলেছিলেন—প্রয়োজনে একলা চলতে হবে। হিংসেতে বাঙালিরা বোঝাই হয়ে যাচ্ছে। হিংসেটা পুঁজের মতন—যতক্ষণ জমে থাকে ততক্ষণ টনটন করে, জায়গাটা তপ্ত হয়ে থাকে, কিছুতেই স্বস্তি থাকে না।"

হিংসুটে বাঙালি সম্বন্ধে মিসেস ব্যানার্জির মন্তব্য অসত্য নাও হতে পারে। ইচ্ছাপূরণের মতো শক্তি যাদের নেই, যাদের অধিকাংশ আকাঙ্ক্ষা নিজেদের দোষেই অচরিতার্থ রয়ে গিয়েছে তারা অবশ্যই হিংসুটে হয়। প্রকৃতির নিয়ম এই, বাঙালিদের দোষ নয়। কিন্তু...এইমাত্র নিজের অজান্তে সারথি রাজকমল বড় মূল্যবান কথা বলল, এগোবার নেশায় গতিবেগ ভীষণ বাড়িয়ে দেয় তাদের পক্ষে গাড়ি থামানো শক্ত কাজ—ভীষণ শক্ত কাজ। ব্রেক কষার সময়েই বেশি অ্যাক্সিডেন্ট হয় বিদেশের হাইওয়েতে, যেমন বেশিরভাগ বিমান দুর্ঘটনা ঘটে অবতরণের সময়, কোথায় যেন এই বিদেশেই পড়লেন নিখিলেশ। সঙ্গে-সঙ্গে লিখে নিয়েছেন নিত্যসাথী নোটবুকে। আজকাল মাথা খাটিয়ে দামি প্রবচন সৃষ্টি করতে হয় না, পথ চলতে-চলতে কত মণিমুক্তা সংগ্রহ করে নেন নোটবইতে, তারপর প্রয়োজনে ব্যবহার করেন নিখিলেশ। সাহিত্য থেকেও জীবন যে অনেক বড় তার মস্ত প্রমাণ নিখিলেশের এই নোটবই। সৃষ্টিকর্তা নিজেই ওখানে সব লিখে দিচ্ছেন অপরের মাধ্যমে। নিখিলেশের ভূমিকা কেবল সংগ্রাহকের, যদিও স্রষ্টার বরমাল্য লাভ করেছেন নিখিলেশ।

একটা পেট্রোল পাম্পে ঢুকে পড়ল রাজকমল। অদ্ভুত এই পশ্চিম—পাম্প আছে, পেট্রোল আছে, কিন্তু দোকানি নেই। কোনো কর্মচারীও নেই। গাড়ি থেকে নেমে নিখেলেশ এই ভূতুড়ে দোকানের কাণ্ডকারখানা

দেখতে লাগলেন। একটা যন্ত্রে কার্ড ঢুকিয়ে দিল রাজকমল, তারপর ফিরে এলো পেট্রোলের নল হাতে। নিজের গাড়িকে নিজেই তেল খাওয়াল রাজকমল। নিখিলেশ বললেন, "মানুষকে এরা ভীষণ বিশ্বাস করে।"

মধুলেখা হাসল। "মানুষের ওপর নজর রাখার জন্যে মানুষ রাখতে হলে ভীষণ খরচ এখানে, সবসময় পড়তায় পোষায় না'। তবে ভাববেন না ওরা বিশ্বাস করে। সস্তায় চাকর বলতে আগে ছিল ইলেকট্রিক, এখন যোগ হয়েছে ইলেকট্রনিক।"

রাজকমল হেসে বলল, "যদি দাম না দিয়ে বা ক্রেডিটকার্ড না ঢুকিয়ে কেউ তেল নিয়ে চলে যেতে চায় তার কপালে অনেক দুঃখ রয়েছে। অটোম্যাটিক ক্যামেরায় গাড়ির নাম্বার প্লেটের ছবি উঠে যায়, খবর চলে যাবে থানায়, একটু এগোবার পরেই বামাল পাকড়াও করবে পুলিস।"

তা হলে প্রাচুর্যের প্রশান্ত প্রলেপেও মানুষ সৎ হয়নি?

রাজকমল বলল, "অবশ্যই হয়নি। তবে খুব কম চুরিতে এখানে চোরদের পড়তায় পোষায় না। চোর ডাকাত সবারই কস্টিং আছে, হিসেবনিকেশ আছে, তারা অযথা পরিশ্রম করে নিচু রোজগারে যাবে না।"

নিখিলেশ হিসেব করতে বসলেন। "ইন্ডিয়া হলে সামান্য কয়েকটা টাকা দিয়ে দুটো লোক বসানো যেত যারা সারারাত জেগে গাড়িতে পেট্রোল দিত। এইরকম কিছু লোক আনালেই এদের সমস্যা মিটে যায়।"

"আগে এরা এইরকম ভাবত। এখন দেখেছে সস্তা লেবার আমদানির হাজার হাঙ্গামা—সামাজিক প্রতিক্রিয়া বড় বেশি হয়। তার থেকে আপনা হাত জগন্নাথ।"

"এরা কখন যে কী ভাবে বোঝা দায়", মধুলেখা বলল। "আমাদের দেশের দুটো গরিব বেঁচে যেত, অথচ কারও কোনো অসুবিধে হতো না।"

রাজকমল এদেশ সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞ। সে বলল, "চমৎকার এক বই বেরিয়েছে। ফরাসি লেখক। আগে এরা কলোনি থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ, কাঁচামাল আহরণ করে এনে নিজেদের কলকারখানা চালু রাখত। তারপর ওরা নিজেদের সুখ বাড়াবার জন্যে, আজেবাজে কাজের জন্যে সস্তার শ্রমিক আনিয়ে তাদের প্রায় ক্রীতদাসের মতন রাখত। এখন নিজের দেশে মানুষ আসতে দেয় না, গরিবের দেশে বসিয়েই মানুষকে সস্তায়

খাটিয়ে ভোগের পণ্য তৈরি করিয়ে আনে। কোনো মাথাব্যথা নেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই জন্যে যে সায়েবরা গতর না খাটালেও ওখানে টাকা খাটাচ্ছেন। বিদেশের ব্যবসায় লাভটুকু ওঁদের কাছেই চলে আসবে।"

অর্থনীতি বোঝেন না নিখিলেশ। কিন্তু তারিফ করলেন রাজকমলের চিন্তার—খুব সহজ করে ইতিহাসটা সে ব্যাখ্যা করছে।

"টাকার জোর এত!" নিখিলেশ বিস্ময় প্রকাশ করেন।

রাজকমল হাসল। "টাকার সঙ্গে আগে ছিল বন্দুক—তবে লুণ্ঠন হানড্রেড পার্সেন্টি সফল হতো। এখন টাকা প্লাস মাথা। বিদ্যাও বলতে পারেন। কোন জিনিস কী ভাবে তৈরি করা যায় তার বিদ্যা এরা গুপ্তধনের মতন আগলে রাখে। এই বিদ্যে বেচবার দোকান খুলে বসে আছে—সেলামি না দিলেই গরিব দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি বলে নতুন একটা শব্দ চালু করে দিয়েছে—আগে ছিল মাত্র স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি। নতুন এই সম্পত্তি চোখে দেখা যায় না, হাতে স্পর্শ করা যায় না, কিন্তু রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি করে দুনিয়ার সমস্ত গরীবের ওপর ছড়ি ঘোরানো যায়।"

গাড়ি আবার চলমান হয়েছে। মধুলেখা বলেছিল, "আপনি সামনের সিটে রাজের পাশে বসুন।" রাজও সায় দিয়েছিল, "আমাদের দেশের মেয়েরা পিছনের সিট থেকে গাড়ি চালায়, এর ইংরিজি নাম ব্যাকসিট ড্রাইভিং। আপনি পাশে এসে বসুন।"

নিখিলেশ রাজি হননি। কম বয়সের প্রাণবন্ত দম্পতিকে গাড়ির সামনে বসে চলমান দেখতে ভীষণ ভালো লাগে। বাঙালি হলে তো কথাই নেই। ভরসা হয় বাঙালিরা এখনও পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যায়নি, দারিদ্র্য এখনও সকলের সর্বনাশ করেনি। নিখিলেশ তাদের সামনে রেখে নতুন দেশকে দেখলে আরও বেশি আনন্দ পাবেন। ওরা যে আমাদেরই লোক এটা বারবার অনুভব করতে চান নিখিলেশ, ওদের প্রাণোচ্ছল হাসি, পরস্পরের মধ্যে মধুর সম্পর্ক, কখনও রাগ, কখনও অনুরাগ, নিজের চোখে অনেকক্ষণ ধরে অনুভব করতে চান নিখিলেশ।

মধুলেখা টফি এগিয়ে দিল নিখিলেশের দিকে, "লম্বা ড্রাইভে আমার গলা শুকিয়ে যায়, মেসোমশাই।"

এই নামটাই ভালো। লেখকমশাইয়ের মধ্যে যেন একটু বেশি সম্ভ্রম একটু বাড়তি দূরত্ব থেকে যায়।

নিখিলেশ একবার মানসচক্ষে নমিতাকে দেখে নিলেন।.একটা অতি সাধারণ ধনেখালি শাড়ি পরে একাদশীর চাঁদের মতন যে জেগে রয়েছে। সোনার তরী যেন ক্রমশ ঘন কুয়াশার অন্ধকারে নিজের অস্তিত্ব বিসর্জন দিচ্ছে। নিখিলেশ কল্পনা করতে চেষ্টা করেছেন, এসব অনেকদিন আগেকার কথা। নমিতার জীবনে দুঃখের ঝড় যেমন রয়েছে তেমন সময় নিজের খেয়ালে সব ফিরিয়ে দিয়েছে। সময় কখনও নিজের জন্যে লুণ্ঠন করে না। একের সম্পদ লুঠ করে আর একজনের হাতে তুলে দেয়। ধনীকে নিঃস্ব করে হয়তো কোনো নিঃস্বকে ধনী করে তোলে খেয়ালি সময়। যদিও নিখিলেশ নিজেই যৌবনের তপ্ত সময়ে সময়কে অবমাননা করার দুঃসাহস দেখাবার জন্যে লিখেছিলেন, নিয়মের ও নীতির ধার ধারে না নিষ্ঠুর সময়, তার খেয়ালিপনায় ধনীর রত্নভাণ্ডার উপচে পড়ে তবু দরিদ্রের ধারাবাহিক লুণ্ঠন শেষ হতে চায় না। যে চায় শুধু চেয়েই যায়, যে দেবার সর্বস্বহারা হয়েও তার লুণ্ঠন শেষ হয় না।

নিখিলেশ এই পরিণত বয়সে সারাক্ষণ অভিযোগের আগুনে জ্বলেপুড়ে মরতে চান না। নিখিলেশ বিশ্বাস করতে ভালোবাসেন, দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ—চক্রবৎ পরিবর্তিত হচ্ছে এই বিশ্বনিখিল। অতএব নমিতাকে একটা গাড়িতে চড়িয়ে দেখতে পাওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। নমিতাকে ঝলমলে একটা শাড়ি পরিয়ে দেখার ইচ্ছে হলো নিখিলেশের। কিন্তু নমিতা কি এখন শাড়ি পরে?

নিখিলেশ শুনেছেন বিদেশের প্রয়োজনের চাপে আজকাল অনেক দেশি মেয়ে শাড়ি ছেড়ে স্কার্ট ধরছে। শাড়ি পরে বিদেশের বড় শহরের গতির সঙ্গে তাল রাখা যায় না—ওখানে পুরুষের সঙ্গে সব মেয়েরাই যে দৌড়চ্ছে সময়ের সঙ্গে সমতা রক্ষা করার জন্য। এবং শাড়ির অন্ধ অনুরাগীকেও স্বীকাব করতে হবে দৌড়নোর পক্ষে ঐ বস্ত্রখণ্ডটা উপযোগী নয়। তা ছাড়া এই মধুলেখার কাছেই নিখিলেশ শুনলেন, শাড়ি পরা মেয়ে দেখলেই সবাই সহজে বুঝে নেয় ভারতীয় মহাদেশ থেকে এসেছে। অনেক দেশের অনেক শহরে বকাটে ছেলেরা খেপে উঠেছে। তারা সিঁদুরপরা মেয়েদের

সর্বনাশ করতে উদগ্রীব। এদের একটা নাম 'ডট্ বারস্টার'। স্কার্ট পরলে নজরে পড়তে হয় না, সহজেই মিশে যাওয়া যায় সাধারণের স্রোতে।

অতএব নমিতাকে একবার স্কার্ট ব্লাউজে দেখে নিলেন নিখিলেশ। মন্দ লাগল না। মনের আয়নায় নমিতাকে প্রতিফলিত করে তার চুলগুলোকে ঘাড় পর্যন্ত ছোট করে দিলেন। পরিয়ে দিলেন একটা আকাশী রঙের স্কার্ট ও ব্লাউজ। গলায় একছড়া মুক্তোর মালা না দিলে স্বস্তি পাচ্ছেন না নিখিলেশ, যদিও শেষ যখন নমিতাকে দেখেছিলেন তখন ওর গলায় সামান্য একটা পুঁতির মালা ছিল, যা নিখিলেশই উপহার দিয়েছিলেন।

নমিতাকে ড্রাইভারের সিটে বসাবেন নাকি, নিখিলেশ? তা হলে ওর পাশে বসাবেন কাকে? যে-লোকটি নমিতার ভাগ্যে বিপুল পরিবর্তন নিয়ে এলো, যার ফলে এতদিন পরে প্রবাসে নমিতার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন নিখিলেশ।

নিখিলেশ একবার তাঁর ঠিকানা-বইটার দিকে তাকালেন। অনেকদিন ধরে মরক্কো লেদারে বাঁধানো এই ঠিকানা-বইটা ব্যবহার করছেন নিখিলেশ—পথে প্রবাসে তাঁর সারাক্ষণের সঙ্গী। এইখানেই রয়েছে ডমিনিকের নিজের হাতের লেখা ঠিকানা। নিখিলেশ অনেক সময় নতুন পরিচিতদের অনুরোধ করেন ঠিকানাটা নিজের হাতে লিখে দিতে। ঠিকানা-বইটা ক্রমশ বিভিন্ন হাতের স্পর্শে অটোগ্রাফ বইয়ের মতন হয়ে ওঠে।

মধুলেখা একবার আড়চোখে দেখল নিখিলেশ শান্ত হয়ে বসে রয়েছেন। হয় কিছু ভাবছেন না-হয় একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। মোটেই অবাক হবার নয়, রাজকমল দু'দিন পর-পর অনেক রাত্রি পর্যন্ত ওঁকে ঘুরিয়েছে শহরের পথে-পথে। রাজকমল ওইসব ভালোবাসে, সারাদিন অফিসের কাজের পরেও অফুরন্ত এনার্জি নিয়ে সে টগবগ করে। কিন্তু তার মনে রাখা উচিত, নিখিলেশ কলকাতা থেকে এসেছেন, ওখানে মানুষ এইভাবে জীবন চালাতে অভ্যস্ত নয়। কলকাতার জল হাওয়া এমনই যে একটু বেশি ঘুম প্রয়োজন হয়। যাঁরা শারীরিক পরিশ্রম করেন না কলকাতার ভিজে হাওয়া তাঁদেরও মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে বাধ্য করে।

নিখিলেশ ক্রমশ যেন কোনো অদৃশ্য বিমানে সাগরপারের এই দেশ থেকে স্বদেশে ফিরে যাচ্ছেন। শুধু নিখিলেশ আকাশ থেকে এবার কলকাতাকে দেখতে পাচ্ছেন—এই শহরের মোহিনীমায়াই তাঁকে বেঁধে রেখেছে সারাজীবন। নিখিলেশ দিল্লি, বোম্বাই যাবার সুযোগ পেয়েও গ্রহণ করতে পারেননি। কলকাতার টান ড্রাগের নেশার মতন, ধরা পড়লে মুক্তি পাওয়া বড় কঠিন। যখন দূরে থাকবে তখনও তোমার বুক জুড়ে থাকবে, মোহিনীমায়া আরও প্রবল হয়ে জড়িয়ে ধরবে তোমাকে।

নিখিলেশ সত্যিই যেন কলকাতায় ফিরে এসেছেন। পথঘাট, নিজের বাড়ি, পরিচিতজন সব স্পর্শ করবার মতন কাছে এসে গিয়েছে। মিসেস ব্যানার্জি, সোনার তরী, নরেন্দ্রপুর পেরিয়ে সেই আধাগ্রাম-আধা শহর কলোনিটা—সব চোখের সামনে এসে গিয়েছে। সময়ঘড়ির কাঁটাটাও পিছনে ঘুরোতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না নিখিলেশের। পিছতে-পিছতে 'এখন' থেকে 'তখন' উপস্থিত হচ্ছেন সাহিত্যিক নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায়।

নিখিলেশের মনে পড়ছে, খুড়তুতো দিদি ফুলেশ্বরীর কথা। ফুলিদির সঙ্গে বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল নিখিলেশের। সেই সঙ্গে মৃগেনদা, যাঁকে সেই বিয়ের পরের দিন থেকেই নিখিলেশ রসিকতা করে মূর্ছাদা বলে ডাকত। ফুলিদি কপট রাগ দেখিয়ে বলত, আমার বরের অমন সুন্দর নামটা তুই নষ্ট করে দিচ্ছিস কেন? নিখিলেশের একটা যুক্তি আছে। নিখিলেশ দু'জনকে পাশে বসিয়ে ওঁদের পয়সায় চিকেন কাটলেট খেতে-খেতে বলেছিল, মানছি মৃগেন নামটার মানে খুব ভালো—স্বয়ং পশুরাজ সিংহ। কিন্তু যদি একটু বিকৃত হয়ে শ্বশুরবাড়িতে 'মৃগেল' বা 'মৃগী' হয়ে যায় তা হলে কী কেলেংকারিয়াস কাণ্ড হবে ভাবত! তাছাড়া ফুলেশ্বরীর ঘায়ে ঘন-ঘন যাঁকে অজ্ঞান হতেই হবে তাঁকে মূর্ছাদা বলার মধ্যে অন্যায় কী?

ফুলেশ্বরীর ঝাপটায় স্বয়ং সিংহ মূর্ছা যাচ্ছেন আইডিয়াটা ফুলিদির খুব মনে ধরেছিল। সুখী বিবাহিত জীবনে কখনও-কখনও স্বামীর ওপর খুব বিরক্ত হলে নিখিলেশের কাছে এসে বলতেন, "সামলা তোর ওই মূর্ছাদাকে—মূর্ছা তো দূরের কথা বউকে হালুম করে খেয়ে ফেলবার তালে রয়েছে।" এসব ক্ষেত্রে একমাত্র শ্যালক হিসেবে (ফুলিদির নিজের ভাই নেই) নিখিলেশ বীরদর্পে ভগ্নীপতির সঙ্গে মোকাবিলার জন্যেই ওঁদের

বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে। ভগ্নীপতিকে সামনে আনা এবং সেই সুযোগে ফুলিদির রান্না তারিয়ে-তারিয়ে খাবার এমন সুবর্ণ সুযোগ কে ছাড়ে?

জামাইবাবুকে ফুলিদির সামনেই নিখিলেশ বলেছে, "আমার দিদিটিকে সাবড়ে দেবার ইচ্ছে শ্বশুরবাড়ির মহলে কোনোরকমেই প্রশ্রয় পাবে না। তবে ফুলিদি, তোমারও চিন্তা নেই, ভগবানের দয়ায় বিয়ের সিলভার জুবিলি ইয়ারে যেভাবে তোমার ওয়েট বেড়েছে তাতে আলিপুরের কোনো মৃগেনই তোমাকে পুরো শেষ করতে পারবে না।"

ভীষণ চটে উঠেছিলেন ফুলিদি। "বাবা বেঁচে থাকলে আমি বাপের বাড়ি চলে যেতাম, আর ফিরতাম না।"

নিখিলেশ বলেছেন, "আমার বাড়ি তো খোলা রয়েছে তোমার জন্যে। অ্যাজ গুড অ্যাজ বাপের বাড়ি। মূর্ছাদাকে টাইট দেওয়ার পক্ষে আটচল্লিশ ঘণ্টাই যথেষ্ট হবে। হাতে না মেরে ভাতে মারা অনেক সহজ, ফুলিদি।"

"তুই নিজের দিদির কথা না শুনে অপরের কথা বিশ্বাস করছিস। ও নিশ্চয় তোকে বুঝিয়েছে। মনে সুখ না থাকলে কারুর ওজন বাড়ে না।"

ফুলিদির আড়ালে জামাইবাবুর সঙ্গে আলোচনা করেছেন নিখিলেশ। ঘর ছেড়ে যাবেন না ফুলিদি, এখানে থেকেই বীরবিক্রমে লড়াই চালিয়ে যাবেন।

নিখিলেশ নিজেই তখন পরামর্শ দিয়েছিলেন, "ব্যস্ত রাখুন ফুলিদিকে। মেয়েরা মানুষ হয়ে গিয়েছে। ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর চাপে নাতি-নাতনি সুখও তারা দিচ্ছে না ফুলিদিকে। ফলে হাতে সময় এত বেশি যে দাম্পত্য কলহই সময় কাটানোর একমাত্র পথ। সামাজিক কাজে ঠেলে দিন ফুলিদিকে", পরামর্শ দিয়েছিলেন নিখিলেশ।

কিন্তু তার ফল ভালো হয়নি। মূর্ছাদা কীভাবে ফুলিদির পরিচয় করিয়ে দিলেন মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে।

ওঁদের অফিসের মিস্টার সদাশিব ব্যানার্জি অফিস সুপার ছিলেন। সরকারি অফিসের আইনকানুন সব নখাগ্রে। একেবারে নির্বিবাদ মানুষ। তবু তেমন প্রমোশন হয়নি—ছেলে ছোকরা অনেকেই কেরিয়ারে ওভারটেক করে এগিয়ে গিয়েছে। ভাগ্য খারাপ সদাশিববাবুর—একের পর এক অফিসাররা কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টে ব্যক্তিত্বর অভাব বলে লিখে

গিয়েছে। অফিসার হতে গেলে নাকি ব্যক্তিত্ব লাগে। শেষে মৃগেনদা এই অফিসে নাম্বার টু হয়ে বদলি হয়ে এসেছেন। মৃগেনদার নজরে পড়েছেন সদাশিব।

অফিসের ভাগ্য যতই খারাপ হোক সদাশিবের স্ত্রীভাগ্য প্রবল। সংস্কৃতি ও সেবার জগতে সর্বজয়া ব্যানার্জি একজন ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা। তাঁর সোনার তরীর কিছু কাগজপত্র মিসেস ব্যানার্জি পাঠিয়েছিলেন, মৃগেনদা এই অফিসে এসেছেন জেনে। স্বভাবতই এই অফিস সম্বন্ধে দুঃখ আছে তাঁর। স্বামী এখানে উচ্চতর পদে যেতে পারছেন না কেন তা মিসেস ব্যানার্জি বুঝে উঠতে পারেন না।

শোনা যায়, সদাশিব ব্যানার্জি লজ্জা পেয়েছিলেন, কর্মজীবনের ব্যাপারে স্ত্রীকে আগ্রহ দেখাতে এবং মৃগেনবাবুর কাছে দুঃখ প্রকাশ করার জন্যে। মিসেস ব্যানার্জি বলেছেন, "এত নিরীহ গোবেচারা হয়ে থাকলে অফিসে চলে, বলুন?"

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মৃগেনদা ঘুটি নড়িয়েছেন, অন্তত গেজেটেড অফিসার হয়েছেন সদাশিব ব্যানার্জি।

মৃগেনদারই পরিকল্পনা, ফুলিদিকে মিসেস ব্যানার্জির সামাজিক সেবায় জুড়ে দেওয়া। যাতে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার সময় একটু কম হাতে থাকে।

ফল ভালোই হয়েছে। ফুলিদি তো মিসেস ব্যানার্জির ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ। সোনার তরীতে গিয়েছেন তিনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছেন।

কিছুদিন পরেই ডাক পড়েছে নিখিলেশের। মৃগেনদা বলেছেন, "শালাবাবু, উল্টো ফল না হয়ে যায়। তোমার দিদির মন তো সারাক্ষণই মিসেস ব্যানার্জির আশ্রমে পড়ে রয়েছে। শেষপর্যন্ত আমাকে ত্যাগ করে আশ্রমবাসিনী না হয়ে যান।" দাম্পত্যকলহ কিন্তু ভীষণ কমে গিয়েছে, ওইসব ছোটখাট ব্যাপারে জড়িয়ে থাকবার মতন সময় এখন ফুলিদির নেই। মিসেস ব্যানার্জির সোনার তরীর জন্যে যে চ্যারিটি শো হচ্ছে তার তদারকিতে প্রচণ্ড ব্যস্ত রয়েছেন ফুলিদি। স্বামীর হাতে পাঁচখানা বিজ্ঞাপন সংগ্রহের ফর্ম ধরিয়ে দিয়েছেন ফুলিদি, বলেছেন, "যেখান থেকে পারো

জোগাড় করো, না-হলে আমার মুখ থাকবে না।"

নিখিলেশকে পাকড়াও করেছেন মৃগেনদা। নিখিলেশ তখনও প্রচার বিভাগে কাজ করতেন, সারাক্ষণের লেখক হননি। নিখিলেশ একটা বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সোনার তরীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে।

এই বিজ্ঞাপনই কাল হলো। নিখিলেশ যে ফুলিদির অলমোস্ট মায়ের পেটের ভাই তা জানাজানি হয়ে গেল মিসেস সর্বজয়া ব্যানার্জির কাছে।

অবশেষে একদিন ফুলিদি ভাইকে নেমন্তন্ন করে পাঠালেন। লিখলেন, "তোর কলাই ডাল, বড়ি ভাজা, পোস্ত চচ্চড়ি এবং ট্যাংরা মাছের 'ঝাল-দে' রেডি থাকবে, আসিস, না-হলে জামাইবাবুর কাছে মুখ থাকবে না।"

"ফুলিদির নির্দেশ, না এসে পারি?" বললেন নিখিলেশ।

ফুলিদি খুব খুশি। "কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি, ট্যাংরা মাছের ডিম নেই। দোষটা তোর জামাইবাবুর, যার কোনো দোষ আমার বাপের বাড়ির লোকরা দেখতে পায় না।"

জামাইবাবু মৃদু প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, "দোষটা আমার নয়, সম্পূর্ণ দোষ ট্যাংরা মাছের, কারণ এই সময় ওরা ডিম ধরে না।"

ফুলিদি বিশ্বাসই করলেন না। "হাতের গোড়ায় ঘুঘুডাঙার বাজার ছাড়া কিছু পেলে না। পাঁচটা নয়, দশটা নয়, আমার একটা ভাই, তারজন্যে একটু কষ্ট করে গড়িয়াহাটে যেতে পারলে না? ওখানে বাঘের দুধ কিনছে লোকে, আর ডিমভরা ট্যাংরা পাওয়া যেত না তা কি হয়?"

প্রথম পর্ব ভোজন শেষ হওয়ার পরে একদফা হাতমুখ ধোওয়া হলো। এরপর সোফায় এসে বসলেন নিখিলেশ, যখন ফুলিদির তৈরি রসগোল্লার পায়েস তিনি স্বহস্তে পরিবেশন করলেন। নিখিলেশ বললেন, "মূর্ছাদা, আর কাউকে বিয়ে করলে হোললাইফ আপনি এই সুখ থেকে বঞ্চিত হতেন। ওয়ার্লডে কেউ এই পায়েস করতে পারবে না। এই মিষ্টি হাত নিয়ে ফুলিদি যদি কথাসাহিত্যে মন দিতেন তা হলে জেন অস্টেন থেকে শুরু করে আশাপূর্ণা দেবী পর্যন্ত কী অবস্থায় পড়তেন।"

মৃগেনদা খুব খুশি হচ্ছেন। নিজের বউয়ের প্রশংসা ডাইভোর্স হওয়ার পরেও শুনতে ভালোবাসে স্বামীরা।

পায়েসের বাটি নিঃশেষ। কিন্তু ফুলিদি দমবার পাত্র নন। ফ্রিজ খুলে

'দ্বিতীয় সাহায্য' অথবা সেকেন্ড হেলপিং-এর জন্যে এগিয়ে এসে আসল কথাটা পাড়লেন। "মিসেস ব্যানার্জি স্বয়ং তোকে চিঠি দিয়েছেন।"

মস্ত অনার এই নিজের হাতে লেখা চিঠি। মিসেস ব্যানার্জি সুন্দর অক্ষরে লিখেছেন, "'বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি বিজ্ঞাপন চাই না। অর্থ চাই না। আপনাকে চাই। ইতি সর্বজয়া ব্যানার্জি।"

মৃগেনদা রসিকতা করতে গেলেন, কিন্তু ফুলিদি ঝামটা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিলেন—'আপনাকে চাই'-এর মধ্যে প্রেম নেই, প্রয়োজন আছে।

ফুলিদি বললেন, "মিসেস ব্যানার্জি আমার কাছে তোর সম্বন্ধে সব শুনেছেন। তোর বই পড়েছেন অনেক। খবরের কাগজে মাঝে-মাঝে যেসব লিখিস তাও পড়েছেন।"

এসব তো ভালো কথা। কিন্তু ফুলিদি বললেন, "এত বড় একজন মানুষ, আমাদের মধ্যে রয়েছেন, এত কাজ করে যাচ্ছেন, অথচ সমাজ ঠিক মতন তাকে জানল না। এটা ঠিক নয়, নিখিলেশ।"

মৃগেনবাবু বলতে গেলেন, "সবাইকে ঠিকমতন জানানোর দায়িত্ব বেচারা নিখিলেশের নয়। ও মাঝে-মাঝে নিজের পছন্দমতন দু'-একজনের কথা খবরের কাগজে লেখার সুযোগ পায়, এই পর্যন্ত।"

ফুলিদি বললেন, "তুমি থামো। তুমি এখনও মিসেস ব্যানার্জির গ্রেটনেস সম্বন্ধে আইডিয়া করতে পারোনি। তোমার ধারণা, সদাশিব ব্যানার্জির ওয়াইফ আর কত বড় হতে পারে!" ফুলিদির দুঃখ, এদেশে স্বামীর পবিচয়েই স্ত্রীর পরিচয়—স্বামী বড় না হলে স্ত্রীর পক্ষে বড় হওয়া আদৌ সম্ভব নয়।"

প্রতিবাদ জানাতে গেলেন মৃগেনবাবু, কিন্তু ফল হলো না। ফুলিদি বললেন, "ওই সদাশিব ব্যানার্জি যদি জবুথবু মার্কা না হয়ে তোমাদের আপিসের বড় সায়েব হতো তা হলে মিসেস ব্যানার্জিকে নিয়ে তোমাদের আপিসের জনসংযোগ অফিসার মাতামাতি করত, দু' দিন অন্তর কাগজে ছবি বেরত কিছু না করেই।"

বোঝা যাচ্ছে, ফুলিদির মাথায় অনেক খবর ঢুকেছে বা ঢোকানো হয়েছে। ফুলিদি দুঃখ করলেন, "সদাশিব ব্যানার্জি বিজনেস টাইকুন হলেও মিসেস ব্যানার্জি অখ্যাত থাকতেন না। একটা পয়সা খরচ না করেও কত

বড়লোকের বউ 'দানশীলা' এই খেতাব পাচ্ছেন কাগজ থেকে। বড়লোকের বউ হলেই সবাই ধরে নেয় 'সমাজসেবিকা, 'দানশীলা' এবং 'শিল্প অনুরাগিনী।"

"একটু বাড়াবাড়ি করছ, ফুলু", জামাইবাবু চেষ্টা করলেন গৃহিণীকে আয়ত্তে আনতে।

ফল খারাপ হলো। ফুলিদি বললেন, "জিজ্ঞেস করো আমার ভাইকে অণু মল্লিক সম্বন্ধে। বড়লোকের সুন্দরী বউ, ডালপুতুল সেজে, বুড়ী বয়সে খুকী হয়ে আর্ট কালচারের নামে আর্টিস্টদের কাছ থেকে তোলা তুলছেন, কিন্তু প্যাট্রনেস অফ আর্ট বলে সরাসরি খেতাব পাচ্ছেন, রাজভবনে খানা খাচ্ছেন। অথচ মিসেস সর্বজয়া ব্যানার্জির নাম কেউ জানে না যেহেতু তাঁর হাজবেন্ড সদাশিব ব্যানার্জি। শতচেষ্টা করলেও এ-দেশের মেয়েরা স্বামীর থেকে বড় হতে পারবে না।"

ফুলিদির কথা অমান্য করতে পারেননি নিখিলেশ। হাজির হয়েছেন নরেন্দ্রপুরের কাছে সোনার তরীতে। তার আগে ফুলিদি নিজেই অনেক কথা বলেছেন। "লাজুক মানুষ, নিজে কিছু বলবেন না, তুই আমার কথাগুলো শুনে রাখ, নিখিল। মস্ত মানুষ যে বলেছি এটা অন্যায় নয়। ওঁর মা ছিলেন কবিগুরুর স্নেহধন্যা। কত চিঠি যে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। অনেকগুলো তুই পাবি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে। কিন্তু দু'খানা পাবি না। মিসেস ব্যানার্জি চুপিচুপি আমাকে বলেছেন, কিন্তু কাউকে বলা বারণ, ঐ দুটো চিঠি এসেছিল আর্জেন্টিনা থেকে যেখানে ওই যে ভিক্টোরিয়া না বিজয়া কোন একটি মেয়ের আশ্রমে ছিলেন কবিগুরু। কবির ওই দুটো চিঠি মরে গেলেও মা কাউকে পড়তে দেননি। কী ছিল সে চিঠিতে তা ভগবান জানেন।"

"ওই দুটো চিঠি কোথায়?" জানতে চান নিখিলেশ। ইদানীং ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা কথা বেরুচ্ছে। ফুলিদি বললেন, "মিসেস ব্যানার্জির যা পার্সোনালিটি! উনি না বললে জিজ্ঞেস করা যায় না।"

বিয়ের পরে মিসেস ব্যানার্জির মা স্বামীর কর্মসূত্রে সমস্ত বাংলাদেশ

ঘুরেছেন সরকারি কাজে। এক সময়ে বনগাঁয় ছিলেন। সেইসময় আলাপ হয়েছিল পথের পাঁচালীর লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। উনিই তো মিসেস ব্যানার্জির নাম করেছিলেন। এরা আগে নাম নিয়ে একটু মতবিরোধ ছিল। বাবা চাইছিলেন—সঞ্চয়িতা। মায়ের আপত্তি—লোকে স্বল্পসঞ্চয় পরিকল্পনার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবে। মায়ের ইচ্ছে : শ্রেয়সী। সব ব্যাপারে সেরা হবে এই মেয়ে। শেষপর্যন্ত বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হওয়া। উনি নাম দিলেন—সর্বজয়া। শ্রেয়সীর সুরটা আছে, কিন্তু ঔদ্ধত্যটা নেই। ওঁরা দু'জনেই পথের পাঁচালীর ভক্ত, রাজি হয়ে গেলেন বাবা ও মা।

নিখিলেশ তারপর শুনেছেন, মিসেস ব্যানার্জির গুণের শেষ নেই। গান জানেন, ছবি আঁকতে জানেন, মূর্তি গড়তে পারেন, নাচও জানতেন। যদিও ইদানীং ভারী শরীরটা দেখলে তা মনে হয় না। মিসেস ব্যানার্জির খুব দুঃখ, কবিগুরু ডাক্তারদের অতিমাত্রায় উৎসাহে অকালে চলে গেলেন। আর দশটা বছর বেঁচে থাকলে, তিনিও ওঁর ডান্সড্রামায় নিশ্চয় সুযোগ পেতেন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য ভাবতে পারতেন না তাঁর সর্বজয়া স্টেজে নাচবে। তিনি বলতেন, "গ্রামে চলে যাও, প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাও।" তখন লোকে হাসত। বনগাঁর লোকদের ধারণা ছিল, প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকাটা চাষাদের কাজ, বাবুদের দায়িত্ব নয়। তখনও তো 'পলিউশন', 'পরিবেশ সংরক্ষণ', 'ইকোলজি', 'সবুজ সংরক্ষণ', 'বনমহোৎসব' ইত্যাদি কথা চালু হয়নি। লোকটা সত্যদ্রষ্টা, অনেক আগেই দেখতে পেয়েছে আগামী কালকে। নেহাত সাধারণ ইস্কুল মাস্টার ছিলেন, তাই লোকে পাত্তা দিল না। জীবিতকালে একজন গোবেচারা গল্পলেখক হিসেবেই পরিচিত থেকে গেলেন।

"তারপর", নিখিলেশ জিজ্ঞেস করেছিলেন ফুলিদিকে।

"সে মস্ত গল্প। সব যখন লিখবি তখন তোর একটা বড় বই হয়ে যাবে। স্রেফ বাঙালি ঘরের মেয়ে হয়ে জন্মাবার জন্যে একটা প্রতিভা কী ভাবে চাপা পড়ে যায়। তোর দারুণ ভালো লাগবে। সংসারের চাপে পড়ে অমন একজন গুণবতী স্রেফ হাউসওয়াইফ হয়ে গেলেন।

স্বামী কর্মসূত্রে থাকতেন সব অজ জায়গায়। সেই সঙ্গে দুই মেয়ে

পালনের তাগিদ। মিসেস ব্যানার্জির দুই মেয়ের নাম শুনলে তুই মজা পাবি—শ্রেয়সী ও সঞ্চয়িতা। ছেলে হয়নি তাই, না-হলে নাম রাখতেন অপু। এই দুই মেয়ে যতদিন ছোট ছিল ততদিন মিসেস ব্যানার্জি মুখ বুজে সংসারধর্ম করে গিয়েছেন। যদিও রান্নাটা ওঁর আসে না। তুই যখন লিখবি তখন ওই পয়েন্টে একটু আলোচনা করিস তো—বাঙালি মেয়ে হলেই তাকে কেন রাঁধুনি হতে হবে? কে এই দিব্যি দিয়ে দিয়েছে? তুই কিছু মনে করিস না, বাংলায় যারা লেখক হয় তাদের সবারই একটু নোলা থাকে। আমার কথা নয়, মিসেস ব্যানার্জি বলেন। ওঁর বাপের বাড়িতে, দাদামশায়ের বাড়িতে কত লেখক আসতেন, অতিথি হতেন, উনি সব খবর জানেন।"

ফুলিদি সগর্বে বললেন, "চব্বিশ বছর সংসারধর্ম করে কেউ যে আবার এমনভাবে প্রস্ফুটিত হতে পারে তা মিসেস ব্যানার্জিকে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কর্মসূত্রে কিছুদিন আগরতলায় ছিলেন, সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানের সর্বনাশ হলো—বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানীরা এতো বড়ো অন্যায় করল অথচ দুনিয়ার কোনো বড় লেখক কেউ কিছু লিখল না। মিসেস ব্যানার্জি খুব দুঃখ করেন। কবিগুরু বেঁচে থাকলে অন্তত একশ গান লিখতেন। মিসেস ব্যানার্জি বলেন, সায়েবরা হুণদের অত্যাচারের কথা এতো বছর পরেও বলে। কিন্তু টিক্কাখানের তুলনায় অ্যাটিলা হুণ এমন কী? যা সব কাণ্ড করছে। ভাবা যায় না। মিসেস ব্যানার্জি নিজে কত গল্প শুনেছেন, কত চোখের জল নিজের হাতে মুছিয়েছেন।"

ওইখানে, আগরতলায় যখন অসংখ্য মানুষ চলে আসছে, শিবিরে জীবনযাপন করছে, তখন মিসেস ব্যানার্জি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না, ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অসহায়দের আশ্রয় দেবার জন্যে দেবী দুর্গার মতন এগিয়ে এলেন। ওঁর সাময়িক আশ্রয় শিবিরের নাম দিলেন, "সোনার তরী।"

ফুলিদি বললেন, "তোকে স্বীকার করতেই হবে, নামের মধ্যেই অভিনবত্ব। যেসব ছেলেমেয়েরা সর্বস্ব হারিয়েছে, তারা যেখানে থাকে, তাকে 'অনাথ-আশ্রম' বা 'অরফ্যানেজ' বলার মধ্যেই কীরকম একটা নিষ্ঠুরতা রয়েছে। মিসেস ব্যানার্জি বলেছিলেন, মরে গেলেও আমি ওইসব

নাম দেব না। কবিগুরু বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলে কোনো চিন্তাই ছিল না, ওঁরা নতুন নাম দিয়ে দিতেন। মিসেস ব্যানার্জি যে রিলিফ ক্যাম্পে প্রথম ক'দিন সাহায্য করেছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন 'পথের পাকশালা'। চমৎকার নাম নয়? তুই বল?"

"পথের পাঁচালির ছায়া রয়েছে বলেই এতো সুন্দর।"

"অথচ লঙ্গরখানা মনে হচ্ছে না—মানুষের দয়ায় পেটে দুটি পড়ছে এমন মনে হচ্ছে না। অথচ কেউ-কেউ বলেছে, নামে কিছু এসে যায় না। ওই অবস্থায় নামের কথা ভাববার মন থাকে না মানুষের। তারা তখন খেতে চায়, ঘুমোতে চায়, বাঁচতে চায়", ফুলিদি বললেন।

নিখিলেশ এরপর শুনেছেন, তিলে-তিলে সোনার তরী তৈরির গল্প। অনেক সাধনা করেছেন মিসেস ব্যানার্জি, সেই সঙ্গে দুর্জয় সাহস। যেসব মেয়ে সর্বস্ব হারিয়েছে, যাদের অতীত মুছে গিয়েছে তাদের দুঃখ সাগরের ওপারে নিয়ে যাবার জন্যে এই সোনার তরী।

"নামটা দুর্দান্ত হয়নি?" ফুলিদি জিজ্ঞেস করেছেন। নিখিলেশ সায় দিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে রসিকতা করেছেন, "অনেক সময় ঐ তরীতে মালিকেরই স্থান হয় না—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে গিয়েছেন, ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী, আমারই সোনার ধানে গিয়েছে সে ভরি।"

উল্লসিত হয়ে উঠেছেন ফুলিদি। "চমৎকার বলেছিস তুই, মিসেস ব্যানার্জিকে বলতে হবে। ওঁরই জায়গা নেই সোনার তরীতে, কোনো প্রচার পান না।"

নিখিলেশ জানতে চাইলেন, "তা হঠাৎ এতোদিন পরে সেবার কাজে নামলেন কেন?"

ফুলি বললেন, "বাঃ। তোর লেখা থেকেই তো মিসেস ব্যানার্জি কোট করলেন—ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি মাঝে মাঝে জেগে উঠে প্রমাণ করে তার এখনও মৃত্যু হয়নি। মিসেস ব্যানার্জি বলেন, মৃত এবং ঘুমন্ত এক জিনিস নয়। বাঙালি মেয়েরা ঘুমন্ত, তাদের জাগানো দরকার।"

উৎসাহিত বোধ করলেন নিখিলেশ। বাঙালি পুরুষ ও রমণী দুইই ঘুমে আচ্ছন্ন রয়েছে। প্রথমে বাঙালি মেয়েদেরই বোধ হয় জাগতে হবে, না হলে...

"ঘুম থেকে উঠেই বাঙালিপুরুষ চা পাবে কী করে?" ফোড়ন দিলেন মৃগেনদা এবং তার জন্যে বকুনি খেলেন ফুলিদির। "আঃ আমরা এখন সিরিয়াস ব্যাপার আলোচনা করছি। স্ত্রীর স্বপ্নে কীভাবে সাহায্য করতে হয় দেখে এসো মিসেস ব্যানার্জির ওখানে। সদাশিববাবু সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে রয়েছেন, বউয়ের জন্যে কিছু করতে পারলে ধন্য হয়ে যান।"

ফুলিদি বললেন, "অগুনটা ভিতরেই ছিল মিসেস ব্যানার্জির—এত মহাপুরুষের আশীর্বাদ রয়েছে ওঁদের বংশের ওপর। দেখিয়ে দিলেন সেবা করতে হয় কী করে—এতদিন পরেও একজন সাধারণ গৃহবধূ নেতৃত্ব দিতে পারেন, কিছু করতে পারেন সমাজের জন্যে। তুই বলছিস দেশলাই কাঠিটা জ্বালাল কে?"

একটু ভাবলেন ফুলিদি। তারপর বললেন, "মিসেস ব্যানার্জি তো ওঁর দিনলিপিতে লিখেছেন, যখন হয় তখন এমনি করেই হয়। আগরতলায় মিসেস ব্যানার্জি স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর মায়ের সঙ্গে তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন। কবিগুরু হঠাৎ মৃদু তিরস্কার করছেন, মানুষের এই অবস্থা, তোর মেয়ে কী করছে। আমিই তো লিখেছিলাম, সর্ব খর্ব তারে দহে তব ক্রোধদাহ। ওই আগুন তো পুরুষ জ্বালবে—কিন্তু মেয়েরা সেবার প্রলেপ এঁকে দিক। যা পুড়েছে। তা-ই আবার সোনার হয়ে উঠুক।"

নিখিলেশ সরল মনেই জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু ফুলিদি সন্দেহ করে বসলেন। "সোহিনী দেবীর সঙ্গে নিশ্চয় তোর আলাপ হয়েছে, কিছু শুনে বসে আছিস তুই।"

সোহিনী দেবী সুগায়িকা, সমাজসেবিকা, সুলেখিকাও বটে। নানা সময়ে বিদেশ গিয়েছেন, বই লিখেছেন। এই সোহিনী দেবী যে মিসেস ব্যানার্জির দিদি, তা নিখিলেশের জানা ছিল না। স্বয়ং কবিগুরু ওই নাম রেখে গিয়েছেন, চিঠিতে বলেছেন, সোহিনীকে নিয়ে যে গল্প লিখেছি তাতে সোহিনী একটু অন্যরমের, কিন্তু চিরকালের সোহিনী মানুষের বিস্ময় উদ্রেক করে--ওই রাগিনী মানুষকে নাড়া দেবে চিরদিন।"

নিখিলেশ আন্দাজ করেছেন, মিসেস ব্যানার্জির অনুরাগিনীরা সোহিনীর অনুরাগিনী নন।

ফুলিদি বললেন, "সোহিনী বলে বেড়ান সর্বজয়া তাঁকে হিংসে করেন।

আগরতলায় সেবার গিয়ে সোহিনী দেবী নাকি রাজভবনে অতিথি হয়েছিলেন। কাগজে ছবি বেরিয়েছিল চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে। সোহিনী দেবী আগরতলা বেতারকেন্দ্র থেকে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন, অথচ সর্বজয়ার কথা কেউ জানে না। তখনই মিসেস ব্যানার্জি জেগে উঠলেন, কিছু একটা করতেই হবে।"

ফুলিদির বক্তব্য : "মিসেস ব্যানার্জির দুঃখ, বড় বাড়াবাড়ি করে দিদি সব ব্যাপারে। কবিগুরুর সঙ্গে তিনদিন ট্রেন জার্নি করে তিনখানা বই লিখেও দিদির মন ভরেনি। কাগজওয়ালারা আস্কারা দেয়, কারণ সোহিনীর স্বামী মস্ত কোম্পানির বিজ্ঞাপন ম্যানেজার। ওখান থেকে আয় হয় কাগজওয়ালাদের। সোহিনীর গানের আসরে টিকিট বিক্রি হয় না, কিন্তু কাগজে ছবি বেরোয়। সমালোচকরা ধন্য ধন্য করেন, কারণ সোহিনীর বাড়িতে তাঁদের নিত্য নিমন্ত্রণ।"

দুই বোনে রেষারেষি থেকে যদি ভালো কিছুর উৎপত্তি হয়ে থাকে তা হলে ভালোই তো, ভাবেন নিখিলেশ।

ফুলিদি বললেন, "তোকে আগে থেকে জানিয়ে রাখি, সোহিনীই হয়তো তোকে জানাবেন, মিসেস ব্যানার্জি আই-এ ফেল।"

তাতে কী এসে যায়? মহাত্মা গান্ধীর বি-এ ডিগ্রি তো কেউ দেখতে চায় না। রবীন্দ্রনাথের কথা কে না জানে?

শ্রাবণের এক অপরাহ্নে নিখিলেশ হাজির হয়েছিলেন নরেন্দ্রপুর পেরিয়ে মিসেস ব্যানার্জির আশ্রয় নিকেতনে। একেবারে স্নিগ্ধ গ্রাম্য পরিবেশ। প্রায় সবই ছিটেবেড়ার ঘরবাড়ি। শুধু অফিসবাড়িটা ও অধ্যক্ষা ভবনটুকুই পাকা হয়েছে। স্থাপত্যে শান্তিনিকেতনের ছাপ রয়েছে, অল্পে সন্তুষ্ট থেকে সৌন্দর্যশিল্পীকে সম্মান শিক্ষা বাঙালিরা কবিগুরু ও তাঁর ছেলের কাছে থেকেই পেয়েছে।

মিসেস ব্যানার্জি করজোড়ে স্বাগত জানিয়ে নিখিলেশকে বলেছিলেন, "আসলে বাঁশের ভেলা, জোর করে নাম দিয়েছি সোনার তরী।"

সোনার তরী শ্রাবণের জলসিঞ্চনে সবুজ হয়ে আছে। সব জায়গায় লাউ গাছ বসিয়েছেন মিসেস ব্যানার্জি। সেই সঙ্গে পেঁপে, সেই সঙ্গে সুপুরি এবং নারকোল। মিসেস ব্যানার্জি বলেছিলেন, "আমার মেয়েরা সুপুরিগাছ

দেখলে সাহস পায়—ওপার থেকে অনেকেই এসেছে, ওখানে তো সুপুরি গাছে ভরা।"

স্বামী সদাশিববাবু একবার উঁকি মারলেন। বললেন, "ও যা করেছে তার তুলনা পাবেন না। বেচারা কোনো স্বীকৃতি পায়নি, লিখুন না ওর কথা কাগজে।"

মিসেস ব্যানার্জি স্বামীকে ভর্ৎসনা করলেন, "তুমি যাও তো এখান থেকে।' সদাশিব সুড়সুড় করে চলে গেলেন। মিসেস ব্যানার্জি বললেন, "কোনো কম্মের নয়। আজকাল আবার লোকের সামনে স্ত্রীর প্রশস্তি শুরু করেছে, আপনার জামাইবাবু ওকে প্রমোশনটা দেবার পরে।"

মিসেস ব্যানার্জি বলেন, "শয়নে স্বপনে জাগরণে এই সোনার তরীটুকুই আমাকে ঘিরে রেখেছে, লেখকমশাই। আপনি সমস্ত বই ভুবন মাঝির নামেই লিখুন, আপনাকে সারাক্ষণ ভুবন মাঝি বলেই ডাকতে ইচ্ছে করে। কী সুন্দর ভাবুন তো—কবিগুরু, সোনার তরী, ভুবন মাঝি—আমি কেবল ছাউনির ওপরে চুপচাপ বসে আমার মেয়েগুলোকে আগলাচ্ছি।"

ছবিটা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আগরতলায় অনুপ্রেরণা মিলল কয়েকটা শিশু ও কিশোরীর দায়িত্ব মিলল শরণার্থী শিবিরে। তাদের নিয়ে কী করবেন? বিপদ কাটলে সুস্থ সবল মানুষেরা সীমান্তের ওপারে ফিরে যাবে, কিন্তু এরা কোথায় যাবে?" এই সময় স্বামী আবার বদলি হলেন কলকাতায়। আমি কী করি? কয়েকটা অসহায় শিশু ও বালিকা নিয়ে চলে এলাম কলকাতায়। নিজের গহনা বেচে তড়িঘড়ি কিছু জমি জোগাড় করেছি এই গ্রামে, শুরু করেছি সোনার তরী। তড়িঘড়ি ছিল আর একটা কারণে—তিন মেয়ে আমার তখন গর্ভিনী। সাহিত্যিক মানুষ, বুঝেছেন নিশ্চয়। নিরীহ নারীর ওপর খান সেনাদের অত্যাচার! একজন রাজি হলো সন্তান নষ্ট করতে। দু'জন বাংলায় মেয়ে, বলল পেটে যারা এসেছে তারা তো কোনো অপরাধ করেনি। অদ্ভুত সাইকোলজি--আপনি উপন্যাস লিখতে পারেন—প্রচণ্ড বিদ্বেষ এবং ঘৃণার মধ্য থেকে কেমন করে সত্যসুন্দর জন্মগ্রহণ করেছেন ভালোবাসার স্নিগ্ধ আলোয় নিজেকে পবিত্র করে।"

মিসেস ব্যানার্জি বললেন, "আমার আশ্রমে জাত খান সেনার

বংশধরকে মানুষ করছি। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ লিখুন আপনি নতুনভাবে। আমার সাধ, বড় হলে ইন্ডিয়ান আর্মিতে যোগ দিক ওরা।"

নিখিলেশ বুঝলেন, প্রতিশোধের কথা ভাবছেন মিসেস ব্যানার্জি। মিসেস ব্যানার্জি নিজেই বললেন, "আবার ভাবি, যথেষ্ট হয়েছে, যুদ্ধটুদ্ধর কথা ভেবে লাভ নেই। ওরা দু'জনে মস্ত ডাক্তার হোক; আর ইউনিসেফের কাজ নিয়ে চলে যাক পাকিস্তানে, সেখানে দেখা হোক দুই বুড়ো খান সোনার সঙ্গে। তারপরের ব্যাপারটা আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি—প্রতিশোধ, অথবা ক্ষমা দেখিয়ে ভুলে যাওয়া, অথবা ক্ষমা দেখিয়েও না ভুলে যাওয়া।"

তারপর দুঃখ করলেন মিসেস ব্যানার্জি। "আমি তো করতে চাই অনেক কিছু। কিন্তু পারি কই? দুটো পয়সা দিতে গভরমেন্ট যে কী কষ্ট দেয়! আমার তো প্রচার নেই। যদিও মন্ত্রীদের এনেছি, লাটসায়েবকে এনেছি, সেক্রেটারিদের এনেছি। সবাই আসে, বড়-বড় লেকচার দেয়, উপদেশ দেয়, চা সিঙাড়া সন্দেশ খায় গবগব করে, ভিজিটরস বুকে সই করে, তারপর বেরিয়ে গিয়ে সব ভুলে যায়।"

কাগজে কী করে খবর বের করা যায় জানতে আগ্রহিনী মিসেস ব্যানার্জি। "আমার সম্বন্ধে দু'লাইন বেরোয় না, কিন্তু দেখবেন সোহিনী দেবী সম্বন্ধে কত কি বেরুচ্ছে। ফুলেশ্বরী বলছিলেন, আপনি পারেন। একেবারে সোনা ফলাতে পারেন ইচ্ছে করলে।"

নিখিলেশ যদি পারতেন তা হলে নিজেকেই প্রচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতেন। সে-পথে যাবার সাহস হয়নি বলেই নিখিলেশ নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন, এখনও চাকরি করছেন গ্রাসাচ্ছদনের জন্যে। কিন্তু মিসেস ব্যানার্জি সেসব বিশ্বাস করবেন না।

মিসেস ব্যানার্জি বললেন, "যদি ওই দুই মেয়ে নিয়ে গল্প লিখতে চান, আলাপ করিয়ে দিই ওদের সঙ্গে। দু'রকম প্রতিক্রিয়া, লেখকমশাই। নবজাত সন্তানকে দেখে একজন রাগে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল। মনে হলো সেই বর্বর সৈন্যটাকেই দেখছে মেয়েটা। আর একজন মেনে নিল— সব ভুলে গিয়ে অসহায় সন্তানের জননীত্ব মেনে নিল সে। একজনের মানসিক অবস্থা এমন খারাপ হয়ে পড়ল যে, ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে মাকে আমি

অন্য হোমে সরিয়ে দিতে বাধ্য হলাম। না-হলে হয়তো কোনোদিন অঘটন ঘটত।"

মিসেস ব্যানার্জি গল্পের লোভ দেখাচ্ছেন বটে কিন্তু নিখিলেশ অস্বস্তি বোধ করলেন। এই দুই কন্যার ওপর যথেষ্ট অভিশাপ বর্ষণ করেছেন সৃষ্টিকর্তা, নিখিলেশ গল্প লিখে আর এদের দুঃখ বাড়াবেন না। বড় অসহায় এরা, এই সোনার তরীতে আশ্রয় নিয়ে যদি দু'দণ্ডের শান্তি পেয়ে থাকে তারা তবে নিখিলেশ কেন হিতে বিপরীত ঘটাবেন?

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যেই নমিতাকে প্রথম দেখেছিলেন নিখিলেশ। একটি কিশোরী ওই ঘরে ঢুকেছিল চা নিয়ে। পথের পাঁচালীর দুর্গা যেন মরণসাগরের ওপার থেকে আবার ফিরে এসেছে। বাংলার শ্যামল শোভা ছড়িয়ে আছে এই দুর্গার দেহে ও মুখে। বড় উজ্জ্বল মুখখানি, আর চোখ দুটি। বাঙালি মেয়েদের সববিষয়ে রিক্ত হবার জন্যে বিশ্বভুবনে পাঠাবার আগে বিধাতা সেরা চোখজোড়া উপহার দেন এঁদের। এই চোখ শুধু দেখে না, কথা বলে, সমস্ত ভুবনে বাণী পাঠায়।

মিসেস ব্যানার্জি নির্দেশ দিলেন, "প্রণাম করো।"

মেয়েটির প্রণাম গ্রহণ করতে গিয়ে বড় বিব্রত বোধ করলেন নিখিলেশ। মেয়েটি ততক্ষণে মিসেস ব্যানার্জির পদধূলি গ্রহণ করছে। এখানে শিষ্টাচার এইরকমই।

"প্রণম্য যাঁরা তাঁদের প্রণাম করতে হবে বৈকি!" মিসেস ব্যানার্জি রুটিনমাফিক আশীর্বাদ জানাতে-জানাতে বললেন, "কত ভাগ্যবতী তুমি, এমন একজন স্রষ্টার পদধূলি নিতে পারলে।"

"আমি কিছুই নই। গল্প লিখে, উপন্যাস লিখে জীবনখানা নির্বাহ করার কথা ভাবি, এই পর্যন্ত।" কিন্তু কে শোনে নিখিলেশের কথা? মিসেস ব্যানার্জি বললেন, "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এইরকম ছিলেন। সামনে বসে অনেকে বুঝতে পারত কত বড় মানুষের সাহচয পাচ্ছে। এখন তো কতলোকের দুঃখ, কেন লোকটাকে দেখলাম না ভালো করে। আমার দিদি মোহিনী তো ওঁকে লেখকই ভাবতেন না।"

"নাম বলো", নির্দেশ দিয়েছিলেন মিসেস ব্যানার্জি।

"নমিতা ব্যানার্জি।"

ফিসফিস করে বললেন সর্বজয়া, "এখানে সব ছেলেমেয়েকে আমি ব্যানার্জি টাইটেল দিয়ে দিয়েছি, এমন কি ওই খুদে দুই খান সেনাকে। এইটাই তো বড় প্রতিশোধ নেওয়া হলো, কী বলেন?"

সোনার তরীতে কে কোথা থেকে এসেছে, কী তার পরিচয় ছিল তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সর্বজয়া ব্যানার্জি চমৎকার কাজ করেছেন। সবাইকে তাঁর পরিচয় বহন করবার সুযোগ দিয়েছেন।

মাটির পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে নিখিলেশের দুর্গা অথবা নমিতা। মিসেস ব্যানার্জি বললেন, "এখানে নামের মধ্যেও একটা ছন্দ রাখছি আমি। প্রমিতা, নমিতা, অনিতা।"

"যখন এই ধরনের নাম ফুরিয়ে যাবে?"

"তখন আপনি আছেন। সোনার তরীর এই ঘরে বসে কবিগুরুর মতন আপনি নতুন নাম তৈরি করে দেবেন!"

মিসেস ব্যানার্জি বললেন, "এই সব মেয়েই আমার সব, লেখকমশাই। সোনার তরীকে এরাই চকচকে ঝকঝকে করে রেখেছে। লক্ষ্মী যদি কোনোদিন খেয়ালের বশে উঁকি মারেন তা হলে আর ফিরে যেতে পারবেন না। আমার লোকজন রাখার সামর্থ্য নেই। দারোয়ান তিনটে না থাকলে নয় তাই রাখা। যদিও প্রায়ই ভাবি, কাদের পাহারা দিচ্ছে ওরা, যখন রক্ষে করার দরকার ছিল তখন তো কেউ ছিল না। আমার এই সব মেয়েরা সকল কলা পারঙ্গমা। নমিতা রাঁধতে জানে, ঘর পরিষ্কার করতে জানে, ছবি আঁকতে জানে, সেলাই জানে, ইংরিজি জানে, বাংলা জানে, গান জানে, সংস্কৃত স্তোত্র জানে, ছোট ভাইবোনদের যত্ন করতে জানে। আমার তো শরীরটাই বিশাল, কিন্তু ভিতরে কিছু নেই—প্রায়ই অসুখ করে। তখন এরাই ভরসা। এইটুকু মেয়ের কী ধৈর্য জানেন, ঠায় তিন ঘণ্টা আমাকে পাখার হাওয়া করে গেল।"

দুর্গা কথা শুনেই যায়, কোনো মন্তব্য করে না। নতুন মা অর্থাৎ মিসেস ব্যানার্জির সামনে মুখ খোলার অভ্যাস নেই। মিসেস ব্যানার্জি বলেন, "একদিন এদের গান শোনাব আপনাকে। রবীন্দ্রসঙ্গীত—বিশেষ করে পূজার গানগুলো বড় প্রাণ খুলে গায়। সুচিত্রা মিত্র দয়া করে ক'দিন এসেছিলেন, আমার মেয়েরা গানগুলো খুব ভালো তুলে নিয়েছে।"

মিসেস ব্যানার্জি নির্দেশ দিলেন, "নমিতা এবার একটু যাও তো, মা। দশ মিনিট পরে এসো, চায়ের কাপ নিয়ে যেও।"

নমিতা নিঃশব্দে নির্দেশ মান্য করল। মিসেস ব্যানার্জি ফিসফিস করে বললেন, "একে নিয়েও একটা বই হয়ে যাবে আপনার। আমার দিদি যখন আজেবাজে বিষয় নিয়ে বই লিখে কী একটা পুরস্কার পেল তখন আমি ভেবেছিলাম একটা লিখি। নমিতার ইতিহাস নিয়ে অনেক নাস্তানাবুদ খেলাম, কিন্তু পারলাম না। শ্রদ্ধা বেড়ে গেল লেখকদের ওপর, গল্প লেখা যত সহজ মনে হয় মোটেই তত সহজ নয়।"

নিখিলেশ শুনলেন, বড় অভাগা মেয়ে। এক-সময় নিজের দেশে সুখে শান্তিতে ছিল। তারপর সর্বনাশের মেঘ ঘনাল। খান সেনারা এসে গ্রাম আক্রমণ করল রাতের অন্ধকারে। বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল একের পর এক। বাপকে টেনে নিয়ে গেল, ওদের কান্না বর্বর সৈন্যদের কানে পৌঁছল না। সেই রাতে দুটি মেয়ের হাত ধরে মা বেরিয়ে পড়লেন ঘর ছেড়ে। শুধু বেরিয়ে পড়া, কোথায় আশ্রয়, কোথায় নিরাপত্তা কিছুই জানা নেই। এইভাবে ক'দিন হাঁটা হয়েছিল তা কারও মনে নেই। অবশেষে বেনাপোল বর্ডার পেরিয়ে গোপালনগর ক্যাম্পে হাজির হয়েছিলেন মা। কিন্তু ওখানে তখন জায়গা নেই। কর্তৃপক্ষ বললেন, এগিয়ে যান, মাইল দুই দূরে আরেকটা শিবির খোলা হচ্ছে। সেখানে পৌঁছনো সম্ভব হলো না। পথের শ্রমে পথের ধারেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন মা। মায়ের মৃতদেহের পাশে বসে রইল বড় মেয়ে, আর ছোট মেয়ে বেরিয়ে গেল খাবারের সন্ধানে।

মিসেস ব্যানার্জি বললেন, "ছোট বোনটাকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। মায়েরও কোনো পরিচয় কেউ লিখে রাখেনি। থানার ও সি শেষ পর্যন্ত আমার শরণাপন্ন হলেন। আমি তখন সরকারের ভরসায় একটি ছোট্ট আশ্রয় শিবির খুলেছি বিপন্ন মেয়েদের জন্যে। মেয়েরা নিরাশ্রয় হলে কত বিপদ যে শত্রুপুরী এবং মিত্রপুরীতে ঘনিয়ে আসে সে খবর তো মানুষ রাখে না।"

"এই মেয়ের কিছু মনে নেই। শুধু ডাকনাম খুকী। আমি নিয়ে এসেছি। খুকী নামটাও ভুলে যাওয়া ভালো। তাই নাম দিয়েছি নমিতা। এখন তো

নমিতা ব্যানার্জি। এখন তো বড় হয়ে উঠছে। আমি ওকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছি বলতে পারেন। দেখুন না কী হয়, শেষ পর্যন্ত।"

নমিতাকে নিয়ে গল্প লেখার প্রস্তাব দিয়েছেন মিসেস ব্যানার্জি। বলেছেন, "ওর সঙ্গে নিজের মতন করে গল্প করুন। পথের শ্রান্তিতে মায়ের মৃত্যুর সব দৃশ্য ওর মনে আছে, ভুবন মাঝি। আমাকে বলে মাঝে-মাঝে। ওর খুব দুঃখ মায়ের একটা ছবি নেই। তাই ও ছবি আঁকা শিখল। শেখার পরে মায়ের একটা ছবি এঁকেছে নমিতা। আমি বলেছি, বাঁধিয়ে রেখে দাও।"

নমিতাকে ডেকে পাঠালেন মিসেস ব্যানার্জি। বললেন, "ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলো। দেখাও তোমাদের সোনার তরী। আমি একটু কাজ সেরে নিই।"

ঘর থেকে বেরিয়ে নীল আকাশের নীচে ধীরে-ধীরে হাঁটলেন নিখিলেশ। নিখিলেশ ভেবেছিলেন, কিছু কথা বলে গল্প তৈরি করবেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ ভীষণ লজ্জা হলো। সামান্য একটা গল্পের লোভে এই মেয়েটিকে অতীতের আগুনে ফেলে দেওয়ার কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না নিখিলেশ।

নিখিলেশ বরং জিজ্ঞেস করলেন, "কাকে তুমি সবচেয়ে ভালোবাস?" নমিতা মুহূর্তের দ্বিধা না করে বলল "নতুন মা-কে।" সর্বজয়া যে এঁদের সকলের নতুন মা তা বুঝতে দেরি হলো না।

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, "বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও, নমিতা?" নমিতা এর উত্তর দিতে পারল না। কেবল হাসল। তারপর বলল, "নতুন মা-কে জিজ্ঞেস করব।"

এরপর নিখিলেশ কয়েকবার এই সোনার তরীতে এসেছেন। নমিতার জন্যে শাড়ি এনেছেন সঙ্গে করে। কখনও সবার জন্যে মিষ্টি। নমিতার সঙ্গে গল্প করে, তার সঙ্গে এই আশ্রমের চারদিকে ঘুরে বেড়িয়ে নিখিলেশ নতুন ধরনের আনন্দ পান। নিশ্চিন্দিপুরের দুর্গা কি এমনই ছিল? দেশ বিভাগের দুর্গতির পারে দুর্গার জীবনেও কি এমন ভয়ঙ্কর পরিণাম হতে পারত? হরিহর নিখোঁজ, সর্বজয়া নেই, অপু কোথায় কেউ জানে না, কেবল দুর্গা

বেঁচে রয়েছে এমন পরিস্থিতিতে পথের পাঁচালির লেখক কী করতেন?

নিখিলেশ তাঁর দিদি ফুলেশ্বরীর ইচ্ছাপূরণ করেছিলেন। মিসেস ব্যানার্জি সম্বন্ধে রবিবারের সংবাদপত্রে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। লিখেছিলেন, দরদ দিয়ে সোনার তরীর নতুন মা সম্বন্ধে।

মিসেস ব্যানার্জি বলা বাহুল্য খুব খুশি হয়েছিলেন। কারণ সোহিনী এখনও এই ধরনের প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হতে পারেননি। এই কাগজের ক্লিপিং পাঠিয়ে মিসেস ব্যানার্জি সরকারি অনুদান বাড়াবার আবেদন জানিয়েছেন। বেড়েছে পরিমাণ, কিন্তু মিসেস ব্যানার্জি সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

আরও কিছুদিন পরে নিখিলেশের ভাগ্নী তমসা বিদেশ থেকে এক সাংবাদিক বন্ধুকে পাঠিয়েছিলেন। ডেভিড ম্যানসনকে নিজে কলকাতা দেখিয়েছিলেন নিখিলেশ। তামসার পড়শি, না-দেখিয়ে উপায় নেই। তারপর ম্যাসন জিজ্ঞেস করেছে, "একজন ভীষণ খারাপ লোক এবং একজন খুব ভালো লোকের খোঁজ কী করে পাব?"

খারাপ লোকদের তো জেলখানায় পাওয়া উচিত। এদের সম্বন্ধে নিখিলেশ খোঁজখবর রাখেন না। ভালো লোক অবশ্যই আছেন কলকাতায়—নিখিলেশ ওকে নিয়ে গিয়েছিলেন মিসেস ব্যানার্জির কাছে। সোনার তরী সম্বন্ধে আশ্চর্য এক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল বিদেশের কাগজে। সেখানে ছিল আশ্রম বালিকাদের কথা, নবজাত শিশুদের কথা এবং অবশ্যই মিসেস ব্যানার্জির সংগ্রামের কথা। ম্যাসন তাঁর প্রবন্ধে মিসেস ব্যানার্জির ঠিকানা ছাপিয়ে দিয়েছিলেন।

ফলে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন সর্বজয়া ব্যানার্জি। মিসেস ব্যানার্জি বললেন, "তফাতটা দেখুন দেশের লোকের সঙ্গে বিদেশের লোকের। দেশের লোকেরা পড়ল কিন্তু কিছু দেবার কথা ভাবল না। আর বিদেশের লোকেরা যৎসামান্য পাঠিয়ে দেয়। ভালোবাসা জানাবার এইটাই উপায় ওদের।"

মিসেস ব্যানার্জি এবার পাল্টাতে শুরু করলেন। অনেক সময় ট্যুরিস্ট দম্পতি হাজির হন সোনার তরীতে। তাঁরা ছবি তোলেন মিসেস ব্যানার্জির। কোন এক বিদেশি টেলিভিশন কোম্পানিও আসতে চায়।

মিসেস ব্যানার্জি যা চেয়েছিলেন তা পেতে চলেছেন। তাঁর চিন্তা বিদেশিদের কোথায় বসাবেন, কী দেখাবেন। কীভাবে আপ্যায়ন করবেন। কেউ-কেউ এই আশ্রমেই ক'দিন থাকতে চায়। তাদের নিয়ে কী করবেন মিসেস ব্যানার্জি!

কয়েকটি শিশুকে বিদেশে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মিসেস ব্যানার্জি। নিখিলেশকে বলেছেন, আগে ভাবতাম দেশের শিশু দেশেই থাক। এখন ভাবি দেশের বোঝা বাড়িয়ে লাভ কী? বিদেশে নতুন জীবন শুরু করুক। আপনার গল্পের পক্ষে খুব ভালো। মনে করুন এই শিশু বড় হয়ে মস্ত কিছু হয়ে এদেশে বেড়াতে এসো। তার চোখে আপনি এ-দেশকেও আবিষ্কার করতে পারবেন।

আসলে এ-দেশের মানুষ সম্বন্ধে বিশ্বাস কমছে মিসেস ব্যানার্জির। বিদেশে না গিয়েও বিদেশ সম্বন্ধে ভীষণ শ্রদ্ধা তাঁর। "এদেশের মানুষ বড্ড জ্বালায়", মিসেস ব্যানার্জি দুঃখ করেন। "সোনার তরীর মর্ম এরা বুঝেও বুঝতে চায় না। বিদেশিরা অনেক বেশি গুণগ্রাহী, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। সাধে কি ওরা বড় হয়েছে। আমার ছেলেমেয়েরা ওখানে বড় হলে ওদের দুঃখ ঘুচে যাবে।"

আরও কিছুদিন পরে নিখিলেশকে ফোন করেছিলেন মিসেস ব্যানার্জি। বিদেশে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন সর্বজয়া। সোহিনী নাকি বিদেশের সরকারি আমন্ত্রণে বিদেশ ঘুরে এল, অথচ এরা মিসেস ব্যানার্জিকে কেন নিমন্ত্রণ জানায় না? মিসেস ব্যানার্জি উঠেপড়ে লেগেছেন, বিদেশের রাষ্ট্রদূতদের নেমন্তন্ন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। নিখিলেশ এই ব্যাপারে খুব উৎসাহী নন। কিন্তু মিসেস ব্যানার্জির ভিন্নমত। "রামমোহন বলুন, বিবেকানন্দ বলুন, রবীন্দ্রনাথ বলুন, রবিশঙ্কর বলুন, ভক্তিবেদান্ত বলুন সব বিদেশে স্বীকৃতি আদায় করে এ-দেশে স্পেশাল সম্মান পেয়েছেন। ফরেনে সম্মান না-হলে এদেশে প্রেস্টিজ হয় না, লেখকমশাই!"

নিখিলেশ কোনো উপদেশ দেওয়ার স্পর্ধা দেখাননি, যদিও এই অতিমাত্রায় সায়েবপ্রীতি কিছুটা অস্বস্তির কারণ হয়েছে।

নিখিলেশকে আবার ফোন করেছেন মিসেস ব্যানার্জি। "নমিতাকে নিয়ে আপনি এখনও তো গল্প লিখলেন না, ও কষ্ট পাবে। আমি তো আপনাকে

পারমিশন দিয়েছি। এই তো লেখিকা স্বাগতা দেবী সেদিন এলেন, গল্পের প্লটের জন্যে হন্যে হয়ে আছেন। আমি বলিনি নমিতার জীবনের কথা। এটা আপনার জন্যে তোলা আছে। নমিতাকে আপনি দেখতে আসেন, ওকে উপহার পাঠান, বুঝতে পারি নমিতাকে আপনি নজরে রেখেছেন।"

নিখিলেশ কী বলবেন? নমিতার জন্যে আরও কিছু করবেন নিখিলেশ।

মিসেস ব্যানার্জি বললেন, "আমি বুঝতে পারি, ওর গল্পটার পরিণতি খুঁজে পাচ্ছেন না আপনি। আপনি একটা চমৎকার পরিণতির সন্ধান করছেন যা নমিতাকে আঘাত দেবে না। কারণ, আপনি লিখলেই ও বুঝে নেবে কাকে নিয়ে আপনি গল্প লিখেছেন।"

মিসেস ব্যানার্জি এবার জানালেন, "নমিতার একটা অবিশ্বাস্য পরিণতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আপনাকে দরকার হবে হয়তো।"

সোনার তরীতে উপস্থিত হয়েছেন নিখিলেশ। মিসেস ব্যানার্জি বললেন, "আমি জানি আপনার সমস্যা। একটা মেয়ে সর্বস্ব হারিয়ে একটা অনাথ আশ্রমে আশ্রয় পেল এটা আপনার কাছে ঠিক গল্প হলো না। আপনি আরও ড্রামা চান। কালিদাস অনেকদিন আগে কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলার জন্যে রাজা দুষ্মন্তকে আনিয়েছিলেন। গল্প জমে উঠেছিল দুর্দান্ত। শুনুন লেখকমশাই, আমি যদি আপনার নায়িকাকে বিদেশের রাজপুত্তুরের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দিই? ভীষণ গল্প হয় না আপনার পাঠকদের পক্ষে? আপনার আরও কৃতিত্ব আপনি বানিয়ে গল্প লিখেছেন না, যা সত্য তাকে অবলম্বন করে লিখছেন।"

ডমিনিক মুলেনের কথা এই সময়েই প্রথম শুনেছিলেন নিখিলেশ। মিসেস ব্যানার্জি ফিসফিস করে বলেছিলেন। "মস্ত বড়লোকের ছেলে। ইন্ডিয়ার এবং আমার এই সোনার তরীর প্রেমে পড়ে গিয়েছে। ইন্ডিয়ান মেয়ে বিয়ে করতে চায়। আমি নমিতার কথা ভাবছি।"

"ইন্ডিয়ান মেয়ে!"

"হ্যাঁ, নিজের দেশের মেয়ে সম্বন্ধে ওদের ঘেন্না ধরে যাচ্ছে! ওদের যা ভালো ওই মেয়েগুলো ছাড়া, আর ইন্ডিয়ান সব খারাপ মেয়েগুলো ছাড়া।"

কেমন করে যোগাযোগ হলো তাও শুনলেন নিখিলেশ। "আশ্রম

দেখতে এসেছিল। খুব ভালো লেগে গেল। তারপর নমিতা, প্রতিমা, শমিতা তিন জনের সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিলাম। মনে হলো নমিতাকে ভীষণ মনে ধরে গিয়েছে।"

এ তো বিশ্বাস হবার মতন খবর নয়। মিসেস ব্যানার্জি ফিসফিস করে বললেন, "কন্যাকুমারী আশ্রমের খবর রাখি আমি। ওখানকার তিনটে মেয়ের জন্য ওরা বিদেশি বর জোগাড় করেছে। এইসব মেয়ে নিয়ে ধন্যি ধন্যি পড়ে গিয়েছে। প্রথমে একটা বিয়ে হয়েছিল, তারপর টপাটপ খবর এসেছে। আপনাকে বলে রাখলাম, বাঙালি মেয়েদের খবর বিদেশে একবার রটলে হইহই পড়ে যাবে, তখন পণ চাওয়া তো দূরের কথা, বাঙালি পাত্রের মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে যাবে।"

মিসেস ব্যানার্জির কাছে খবর আছে ডমিনিক মুলেন কন্যাকুমারী আশ্রমে মিসেস পুনওয়ানির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু ওদের যে মেয়ে আছে তা মুলেনের মনে ধরেনি।

মুলেনের সঙ্গে নিখিলেশের দেখা হয়েছে সোনার তরীতে। নিখিলেশের ঠিকানাখাতায় ওইসময় স্বাক্ষর করেছিল ডমিনিক মুলেন। মুলেন তখন অপেক্ষা করছে নমিতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে। মিসেস ব্যানার্জি বাংলায় বললেন, "মেয়েটি ভীষণ ভীরু। আপনাকে খুব সম্মান করে। আপনিও একটু বলে দিন না, মনে বল পাবে। রূপকথার বিয়ে একটা হোক না এই সোনার তরীতে।"

সেদিন কথা হয়নি। নিখিলেশ ওদের দু'জনকে একসঙ্গে বাগানে হাঁটতে দেখেছেন। মিসেস ব্যানার্জির নির্দেশ মান্য করে নমিতা সঙ্গ দিচ্ছে ডমিনিক মুলেনকে।

এরপর নিখিলেশ এসেছেন। নমিতা এখনও দিশাহারা। এই দেশের মাটিতে থাকার আগ্রহ প্রবল। কী করবে সে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তার নেই। মিসেস ব্যানার্জি জানালেন, "আমি একটু অন্যায় করেছি। বলে দিয়েছি, তোমার লেখককাকুও খুব খুশি হয়েছেন খবরটা পেয়ে। এমন সম্বন্ধ অনেক ভাগ্য করলে পাওয়া যায়।"

এরপর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কাগজে বক্স করে খবরটা বেরিয়েছে— 'একালের রূপকথা' শিরোনামায়। অজস্র প্রশংসা বর্ষণ করা হয়েছে মিসেস

ব্যানার্জির ওপর।

এর কিছুদিন পরেই মিসেস ব্যানার্জি বেরিয়ে পড়েছেন তাঁর প্রথম বিশ্বপরিভ্রমণে। "রাউন্ড দ্য ওয়ার্লড যাচ্ছি। ভুবন মাঝি, আপনি সঙ্গে থাকলে সুন্দর একটা বই হতো", ছোট্ট চিরকুটে লিখেছিলেন মিসেস ব্যানার্জি।

তারপরেও অনেকদিন কেটেছে। প্রমিতা, শমিতার জন্যে মিসেস ব্যানার্জি কী ব্যবস্থা করেছেন তা জানা হয়নি নিখিলেশের। সর্বজয়া ব্যানার্জি এখন ব্যস্ত মানুষ। প্রচারের রহস্যটা নিজেই ভালো করে আয়ত্তে এনেছেন, নিখিলেশের ওপর নির্ভর করবার প্রয়োজন নেই।

আরও কিছুদিন পরে গৌরবের শীর্ষে থেকেই মিসেস ব্যানার্জি একদিন চলে গেলেন, এই পৃথিবী থেকে। নিখিলেশ তখন বিদেশে। গভীর দুঃখ পেয়েছেন তিনি। একজন ভালো লোক চলে গেল। এইসব মানুষের বিদায়ের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানও নষ্ট হয়ে যায়। সদাশিব ব্যানার্জি তাঁর মেয়ে শ্রেয়সীকে নিয়ে সোনার তরী টিকিয়ে রেখেছেন কোনোক্রমে। কিন্তু কন্যা শ্রেয়সীর ইচ্ছা নয় একে চালু রাখা। একে একে আশ্রমবাহিনীর সংখ্যা কমছে। নতুন অভ্যাগতা নেবে না শ্রেয়সী। নিখিলেশ শুনেছেন, সোনার তরীর সম্পত্তিটা নিজের নামেই করেছিলেন মিসেস ব্যানার্জি। ওখানে ফ্ল্যাট বাড়ি করার কথা ভাবছে শ্রেয়সী। মায়ের ব্যাপারে তেমন শ্রদ্ধা নেই শ্রেয়সীর।

এসব ব্যাপারে আর আগ্রহ নেই নিখিলেশের। এক-একটা মানুষের সঙ্গে এক-একটা উদ্যমের শেষ হয় এই দেশে। কিন্তু নমিতার কথা তো মুছে যায়নি মন থেকে। এতদিন পরে আবার তার ঠিকানাটা দেখছেন নিখিলেশ। বিয়ে হবার পর নমিতার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। একেবারে অবাক করে দেবেন নিখিলেশ।

প্রবাসের হাইওয়ে ধরে রাজকমলের গাড়ি এখন দ্রুতবেগে চলছে। ওরা ভাবছে, নিখিলেশ একটু ঘুমিয়ে নিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে নিখিলেশ যে কত পথ ঘুরে এলেন তার হিসেব তো ওদের জানা নেই।

নিখিলেশ জানেন, হরিহর, সর্বজয়া, অপু, দুর্গার গল্পটা রাজু ও মধুলেখার অনেকবার পড়া আছে।

মধুলেখা হঠাৎ বলল, "বাংলা গল্পের তুলনা হয় না, আপনারা লেখেন খু-উ-ব ভালো, কিন্তু পাঠককে কষ্ট দিতে আপনাদের তুলনা নেই। সব গল্প শেষ হয় দুঃখে।"

রাজ বলল, "আঃ মধুলেখা। তোমাকে বুঝতে হবে দেশের অবস্থা। ওখানে সুখের পরিণতি কোথায়? দোষটা মোটেই লেখকের নয়।"

"দুর্গাকে নিয়ে যদি নতুন একটা গল্প লেখা যায়, সেখানে আমি সুখের সন্ধান দেব মধুলেখা। এই গল্পটা আমি অন্য রকম করব। হরিহর হারিয়ে গিয়েছে। রাতের অন্ধকারে খানসেনারা তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে। অপু-দুর্গাকে নিয়ে অন্তহীন পথ হাটছে সর্বজয়া। এবার পথের শ্রান্তিতে সর্বজয়া লুটিয়ে পড়ল পথের ধারে। অপু সেই যে খাবারের সন্ধানে বেরুল আর ফিরল না। কিন্তু দুর্গা বেঁচে রইল। দুর্গা আশ্রয় পেল সোনার তরীতে। তারপর দুর্গা বড় হলো। সর্বগুণে গুণান্বিতা হয়ে সে নজরে পড়ল বিদেশি রাজপুত্রের। দুর্গা এখন বিদেশে সোনার সংসার পেতে সুখে কালাতিপাত করছে। বিদেশে এসে অনেক কষ্ট করে লেখক তাকে খুঁজে বের করলেন। দুর্গা অবশেষে আনন্দময়ী হয়ে উঠেছে।"

মধুলেখা বলল, "খুব ভালো হয়। দুর্গার জন্যে কেঁদে-কেঁদে আর পারি না। ও মাঝে-মাঝে ছবিটা ভি সি আর-এ দেখে আর কাঁদে।"

"টেলিফোন নম্বর?" রাজকমল জিজ্ঞেস করল। নিখিলেশ দেখলেন ডমিনিক মুলেনের ঠিকানা আছে, কিন্তু টেলিফোন নম্বর লেখা নেই।

অতএব নতুন জায়গার ম্যাপটা খুলে ফেলল রাজকমল। রাস্তার নামটা পাওয়া যাচ্ছে। সরু একটা গলি হবে মনে হচ্ছে—শহরটা পুরনো। অনেক খুঁজে-খুঁজে ঠিকানাটা বেরুল। একটা আদ্যিকালের বাড়ি যার সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যর স্পষ্ট চিহ্ন। সেই বাড়ির নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটে ঘণ্টা বাজালেন নিখিলেশ। অনেকক্ষণ পরে একজন বৃদ্ধ বিরক্তভাবে বেরিয়ে এলেন। না, এই বাড়িতে ডমিনিক মুলেন অবশ্যই থাকে না।

নিখিলেশকে দেখে কষ্ট হচ্ছে রাজকমলের। সে নিজেও পাশাপাশি খোঁজখবর করতে লাগল। এখানে কেউ কারও খোঁজ রাখে না।

রাস্তা থেকে বাড়িটা অনেকক্ষণ দেখলেন নিখিলেশ। হয়তো অন্য কোনো উঠে গিয়েছে। কিন্তু মিসেস ব্যানার্জি যে বলেছিলেন, ভীষণ

বড়লোক এই ডমিনিক মুলেন। কোনো বড়লোক কি এই বাড়িতে থাকবে?

আরও কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ালেন নিখিলেশ। বেশ লজ্জা পাচ্ছেন তিনি, এত দূরে টেনে আনলেন এই দম্পতিকে, আর দুর্গাকেই খুঁজে পেলেন না।

রাজকমল বলল, "দুর্গাকে সুখী দেখার জন্যে আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, এতেই আমাদের আনন্দ। তাকে না পাওয়া গেলে আপনি কী করবেন?'

"চলুন এখন সুবিনয় দত্তর বাড়ি। ওরা আপনাকে দেখে খুব খুশি হবে। ছাড়বে না, সমস্ত রাত গল্প করবে আপনার সঙ্গে।"

ভাগ্যে সুবিনয়ের বাড়িতে যাওয়া হয়েছিল। শোভনা দত্ত একমনে শুনছিলেন মধুলেখার কথা। খুব বড়লোক এক বিদেশি রাজপুত্রের মতন কলকাতায় গিয়ে এক বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করে এনেছিল। খুব হইচই হয়েছিল, কলকাতায়, এমন মিষ্টি ঘটনা বড় একটা ঘটে না।

"আপনি নমিতাকে খুঁজছেন? তার সুখের সংসার দেখতে এতো দূরে এসেছেন।" শোভনা অবাক করে দিল নিখিলেশকে।

তারপর শোভনা যা বলল, "বড় দুঃখী মেয়েটি। কলকাতার আপনাদের হলো কী? যার তার হাতে মেয়ে তুলে দেওয়া, কোনো খোঁজখবর না নিয়ে।"

ওই মেয়েটি কয়েক বছর ভীষণ কষ্ট পেয়েছে। লোকটা একটা লোফার। রোজগারপাতি নেই, বউকে ঝিগিরি করাত। যতরকমের অত্যাচার হতে পারে। তাছাড়া অন্য দোষ আছে...পুরুষ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক...এদেশে তো ওইসব করেই গোল্লায় যেতে বসেছে। মনোবিকারে ভরে গেল।

বাঙালি মেয়ে বলেই এতদিন কষ্ট সহ্য করেছে। তারপর পারেনি। বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। সঙ্গে পাশপোর্ট নেই, পাশপোর্ট ওই দুষ্টুটা নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। পুলিস ওকে জেলে পাঠিয়ে ছাড়ত, যদি-না সুবিনয়ের এক বন্ধু দয়া করতেন। উকিল ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে নমিতার জন্যে লড়লেন। এখানে বিনাপয়সায় কিছু হয় না। কিন্তু এই ভদ্রলোক দয়ার সাগর। মেয়েটার শরীরে কত যে পোড়াদাগ হয়েছিল ভাবতে পারবেন না।

অনেক কষ্টে বিয়েটা বানচাল করে দিয়েছেন ভদ্রলোক।

ওঁর কাছেই শোভনা শুনেছে, আজকাল হোমোসেক্সুয়ালরা ইন্ডিয়ায় যাচ্ছে বউ আনতে। ইন্ডিয়ান বউরা সব কিছু মেনে নেয়—স্বামী তখন যা খুশি করে যেতে পারেন। এরা ইন্ডিয়ার কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়—ইন্ডিয়াতে যা কিছুর অভাব থাকুক মেয়ের অভাব নেই। ওই মুলেন লোকটা আগে কয়েকজন বউ এনেছে ক্যালকাটা থেকে। "কন্যাকুমারী বলে কোনো এজেন্সি আছে?" জানতে চাইছে শোভনা। হতে পারে, সব সম্ভব হতে পারে ভারতবর্ষে।

নমিতাকে দেখেছে শোভনা। এখানকার ভাষার ওপর দখল নেই তেমন। শোভনার সাহায্য চেয়েছিলেন উকিলবাবু।

"বড় দুঃখী মেয়ে এই নমিতা", বলল শোভনা। "উকিলবাবু বললেন, ইচ্ছে হলে দেশে ফিরে যাও। তা নমিতা কিছুতেই রাজি হলো না। বড় আত্মসম্মানের মেয়ে নমিতা। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাইল না। উকিলবাবুর সাহায্যে কোন ফলের দোকানে সামান্য একটা চাকরি জোগাড় করে নিয়েছে। অনেক দূরে একখানা ঘর জোগাড় করেছে। কোনোরকমে বেঁচে আছে।"

বহুদিন পরে কত পথ পেরিয়ে অবশেষে দেখা হলো নমিতার সঙ্গে। শরীরটা বিধ্বস্ত হয়েছে নমিতার। শুধু চোখ দুটি এখনও সেই পথের পাঁচালির দুর্গার মতন জ্বলজ্বল করছে।

নমিতার ঘরখানা এক নজরে দেখে নিলেন নিখিলেশ। একটা ক্যাম্প খাট পড়ার পরে জায়গা নেই বললেই হয়। সামনের টেবিলে একটা মাত্র ছবি রয়েছে—মিসেস সর্বজয়া ব্যানার্জি হাসিতে মুখ ভরিয়ে রয়েছেন।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন নিখিলেশ।

কী আশ্চর্য। পৃথিবীতে কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই নমিতার। সমস্ত দুঃখের বোঝা ভাগ্যের ওপর চাপিয়ে দিয়ে শান্ত হয়ে রয়েছে নমিতা। অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে নমিতা বলল, "নতুন মায়ের ভালোবাসা পেয়েছি, আমার আর কী দরকার? এই ছবিটা যতক্ষণ আছে আমার কোনো ভয় নেই।"

নতুন মাকে কষ্ট দিতে চায়নি নমিতা। তাই নিজের ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা ওঁকে লেখেনি নমিতা। "লিখে কী হবে? শুধু নতুন মায়ের কষ্ট বাড়ানো। তিনি তো চেয়েছিলেন আমি সুখী হই জীবনে। তিনি তো চেষ্টা করেছিলেন।"

ভাগ্য, ভাগ্য, ভাগ্য—কথাটা কতবার যে মেয়েদের মুখ থেকে শুনেছেন নিখিলেশ। আজও ভাগ্যকে মেনে নিয়ে শান্ত হয়ে রয়েছে নমিতা। এরা কারও নিন্দা করবে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে পথ ধরে হাঁটছেন নিখিলেশ। সোনার তরীর নমিতাকে প্রবাসের নিঃসঙ্গ নির্বাসনে ফেলে রেখেই তাঁকে বিদায় নিতে হবে এই জনপদ থেকে। নমিতাও হাঁটছে সঙ্গে—নিখিলেশকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দেবে সে।

ঘরে অন্য কিছু ছিল না। নিখিলেশের হাতে একটা আপেল দিয়েছে নমিতা। অনুরোধ করেছে, এটা কিন্তু আপনি খাবেন। নিখিলেশ আপত্তি করেননি, আপেলটা ওভার কোটের পকেটে ঢুকিয়ে নিয়েছেন।

অনেকটা পথ তেমন আলো ছিল না। এই অন্ধকারে স্বস্তি পাচ্ছেন নিখিলেশ। নমিতার মুখের দিকে চাওয়া কষ্টকর হচ্ছিল নিখিলেশের। বিস্ময়ে ভরে উঠেছে নিখিলেশের মন। কখন তিনি এ-সংসারের দুঃখিনী নমিতাদের শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছেন। "এত শক্তি কোথা থেকে পাও নমিতা?" নিখিলেশ ভেবেছিলেন ঈশ্বরের প্রসঙ্গ তুলবে নমিতা। কিন্তু সে অন্য কথা বলল। "আমার নতুন মা। ওঁর কাছে থেকেই তো সব পাই।"

নতুন মা এখন বিশ্বসংসারে নেই, তবু নমিতা ওঁকেই সব অর্পণ করে বসে আছে।

"তোমার ভয় করে না?" নিখিলেশ শিশুর মতন জিজ্ঞেস করলেন।

"ভয় হয়, নতুন মা না কখন হারিয়ে যান। এখানকার লোকগুলো বলে বেড়াচ্ছে ডমিনিক আমাকে কিনে নিয়ে এসেছিল।" বাস এসে গিয়েছে। নমিতা জানে সব মিথ্যে কথা, তবু নিখিলেশকে অনুরোধ করল একবার খোঁজ করে তাকে জানাতে।

দেশে ফিরে এসেছেন নিখিলেশ। খোঁজ করেছেন। যা আবিষ্কার করলেন তাতে স্তম্ভিত হবার কথা। অবশ্যই নমিতাকে বেচে দেননি মিসেস

ব্যানার্জি। তবে "ডোনেশন" নিয়েছিলেন দেড় লাখ টাকার। সদাশিব ব্যানার্জি বললেন, "তখন খুব টাকার দরকার ছিল, নিখিলেশবাবু। ওই টাকাটা না হলে মিসেস ব্যানার্জির লাইফের প্রথম ফরেন ট্যুর প্রোগ্রামটাই ভণ্ডুল হয়ে যেত। দিদির মতন দেশ দেখবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন মিসেস ব্যানার্জি।"

নিখিলেশ অনেক ভেবেছেন। ডোনেশনের খবরটা নমিতাকে না জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন নিখিলেশ। একটা ভালো মানুষের স্মৃতি বুকে আঁকড়ে মেয়েটা কোনোরকমে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করছে, তার শেষ সম্বলটুকু ছিনিয়ে নিয়ে কী লাভ?

নমিতাকে নিখিলেশ লিখলেন, "এই চিঠির মাধ্যমে সোনার তরীর সবাই তোমাকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছে। সেই সঙ্গে রইল আমার বুকভরা আশীর্বাদ। ইতি নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায়।"

বণিক ও রূপসী

ঘরের কোণে ছোট্ট টেবিলের সামনে বসে নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায় যখন গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন ঠিক সেই সময় খবর এল কে একজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

সাহিত্যিক নিখিলেশ একটু অবাক হলেন। শ্রাবণ মাসের এই সময় তাঁর পরিচিত বন্ধুরা নিখিলেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না, তাঁরা জানেন নিখিলেশ সেসময় লেখার মধ্যে ডুবে থাকেন।

লেখার জন্যে নিঃসঙ্গতা প্রয়োজন হয় বলে নিখিলেশের দুঃখ। একাকী মা সরস্বতীর পা জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কান্নাকাটি না-করলে নিখিলেশ গল্পকে ধরতে পারেন না, লেখাও বেরোয় না। সেদিকে হিংসে হয় লেখক কুমারেশ মজুমদারকে। নিখিলেশ শুনেছেন, কোনোরকম সাধ্যসাধনা প্রয়োজন হয় না কুমারেশের। বন্ধুবান্ধব পরিবৃত হয়ে, গল্পগুজব উপভোগ করতে করতেই তর তর করে লিখে যান সাহিত্যিক কুমারেশ মজুমদার। পাঁচশ পাতার একটা উপন্যাস ধরা এবং শেষ করে ফেলা কুমারেশ মজুমদারের পক্ষে এমন কিছু বড় একটা ব্যাপার নয়। নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায় শুনেছেন, ইয়ারবন্ধু পরিবৃত হয়ে প্রায় বাজারের মধ্যে বসে সাহিত্য সৃষ্টির সময়, কুমারেশ মজুমদার শুধু চোখে ও কানে সান্নিধ্য সুখ উপভোগ করেন, মুখে হাসি ফুটে ওঠে, তবে কথা বলেন না কুমারেশ মজুমদার। বন্ধু ও বান্ধবীরা সবিস্ময়ে দেখে লাইনটানা কয়েকটা স্লিপ মুক্তোর মতন শব্দশম্ভারে ভরে উঠল।

সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশের শুরু থেকেই নিখিলেশের স্বভাব অন্যরকম। সে অনেকদিন আগেকার কথা। নিখিলেশের প্রথম বই প্রকাশিত হয়ে পাঠকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ঈশ্বরের আশীর্বাদে নিখিলেশ সেখানের কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের স্নেহপ্রশ্রয় লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দিক্‌পাল লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। পুণাতে

বর্ষীয়ান লেখকের আতিথ্য গ্রহণের বিরল সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন নিখিলেশ সেই সময়। শরদিন্দুর সঙ্গে গল্প করতে-করতে ছোট্ট একটি লেখার তোড়জোড় করছিলেন নিখিলেশ। সম্পাদককে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল পুণা থেকে লেখাটা পাঠিয়ে দেবেন নিখিলেশ সোজা কলকাতায়। নিখিলেশের হাতে কলম দেখেই উঠে পড়লেন শরদিন্দু, সস্নেহে বললেন, "আগে কাজ, পরে গল্প।" নিখিলেশ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, গল্প ও লেখা একসঙ্গে চলতে পারে। কিন্তু শরদিন্দু বলেছিলেন, "মা সরস্বতী বড় খেয়ালি দেবী, একান্তে ছাড়া ভক্তকে স্নেহপ্রশ্রয় দেন না।"

এরপর শরদিন্দু বলেছিলেন, "লেখার সময়ে চোখের সামনে আমি কাউকে রাখি না—সৃষ্টিব ডার্করুমে গল্পের চরিত্রগুলো ভালো প্রস্ফুটিত হয়।"

সেই থেকেই মা সরস্বতীর সঙ্গে একান্তে মোকাবিলা করে এসেছেন নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায়। নিরিবিলিতে না হলে শ্বেতবসনা দেবীর সত্যিই মানভঞ্জন হয় না।

সেই শুরু থেকে নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায় অনেক পথ অতিক্রম করে এসেছেন। মা সরস্বতীকে সারাক্ষণ সোনায় মুড়ে না রাখলেও নিখিলেশ তাঁকে দু'একটি স্বর্ণ বলয় উপহার দিয়েছেন।

গোড়ার দিকে নিখিলেশের ভয় ছিল নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার—জীবনের সঞ্চয় আর কতটুকু? চেনা মানুষেরা তো কয়েকটি উপন্যাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। চরিত্রের ভাণ্ডার শূন্য হলে তখন কী করবেন নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায়? উৎসবের শেষে ভগ্ন মৃৎপাত্রের মতো পড়ে থাকার আশঙ্কায় বারংবার বিচলিত হয়েছেন নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায়।

আশঙ্কার এই পর্বে নিখিলেশ যাঁর স্নেহপ্রশ্রয় লাভ করেছিলেন তাঁর নাম বিমল মিত্র। সাহেব-বিবি-গোলামের মৃত্যুঞ্জয়ী লেখক নস্যি নিয়ে রুমালে নাক মুছতে-মুছতে নিখিলেশকে বলতেন, "আপনিও যেমনি, গল্প কখনও ফুরিয়ে যায়? যতদিন আলো আছে, বাতাস আছে ততদিন পৃথিবী গল্পশূন্য হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।"

ঠিক বুঝতে না পেরে নিখিলেশ পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন সাহিত্য সাধক বিমল মিত্রের দিকে। হাল্কা ঢঙে বিমল মিত্র বললেন, "সেই প্রথম

যেদিন মানুষ পৃথিবীতে এলো সেদিন থেকে আদম ও ঈভের গল্প শুরু হয়ে গেল। যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন গল্প সৃষ্টি হবেই—মানুষের নিশ্বাস প্রশ্বাসেই যে গল্প তৈরি হয়ে যায়, নিখিলেশবাবু।"

বিমল মিত্র এরপর মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন, "সব কিছু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করতে হয় না। রাজা যেমন কর্ণেন পশ্যতি. তেমন লেখককেও কান দিয়ে দেখার শিক্ষা নিতে হয়। তাই তো আমি আড্ডার জন্যে সময় রাখি—আমার আড্ডায় সবার অবারিত দ্বার। অফিসের বড় সায়েব থেকে যদুবেয়ারা, কোটিপতি থেকে আরম্ভ করে প্রায় পথের ভিখিরি পর্যন্ত সবার সঙ্গে গল্প করি গল্প লেখার তাগিদে।"

এরপর বিমল মিত্র সাবধান করেছিলেন, "কিন্তু মশাই মনে রাখবেন, বেশি আড্ডা আবার লেখার বেজায় শত্রু। আড্ডার আফিমে আঙুলগুলো প্রায়ই এমন অবশ হয়ে যায় যে কলম ধরা শক্ত হয়ে পড়ে। এই আমাদের আড্ডার ধরণীকে দেখুন—ভালো লিখতে পারতো। গল্প সংগ্রহের জন্য আড্ডার ব্যবস্থা করল। কিন্তু তারপর আড্ডা সর্বস্ব হয়ে গেল আমাদের ধরণী। মনের আঙুলে এমন বাত ধরেছে যে লেখা হলো না, ওর আড্ডার ফসল থেকে জিনিস তুলে আমি বই লিখে ফেললাম গোটা পাঁচেক।"

বিমল মিত্রের উপদেশ, আড্ডার স্রোত থেকে ছোঁ মেরে গল্প তুলে নিয়ে আকাশে উধাও হতে হবে গাঙ চিলের মতন।

বিমল মিত্রও বলতেন, "অপরের গল্প সম্পূর্ণ হজম করে নিজের গল্প লেখার সময় একাকীত্ব প্রয়োজন—লেখাটা হলো সাধনা। আসনে বসে মনঃসংযোগ না করলে বাগদেবীর বয়ে গিয়েছে বিমল মিত্তিরের দিকে কৃপাদৃষ্টি দিতে।

নিখিলেশ তাঁর নোটবইতে লিখে নিয়েছিলেন বিমল মিত্রের পরামর্শ ; "যখন লিখবেন তখন একা থাকবেন। একলা না হলে নিজের সঙ্গে কথা বলবেন কী করে? শ্রেষ্ঠ রচনায় লেখক নিজের সঙ্গেই মোকাবিলা করেন, কিন্তু সরস্বতীর আশীর্বাদে তাই হয়ে ওঠে বিশ্বমানবের হৃদয়ের কথা।"

"আপনার উইকনেস?" সপ্রতিভ নিখিলেশ জিজ্ঞেস করেছিলেন যশস্বী লেখককে।

বিমল মিত্র বিরক্ত হননি। একটু ভেবে বলেছিলেন, "মেয়েদের থেকে

শতহস্তে দূরে থেকেছি আমি—ওদের সঙ্গে মিশতে পারিনি। যত মেয়ের কথা লিখেছি তাদের কথা অপরের মুখে শুনেছি—অপরের মুখে ঝাল খাওয়া বলতে পারেন।"

কিন্তু বিমল মিত্র এই পর্বেও সাবধান করে দিয়েছিলেন। "লেখা একটু নিরস হলেও মেয়েমানুষকে এড়িয়ে চলাই ভালো. নিখিলেশবাবু। ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলে দিয়েছেন, মায়ের জাতও বটে আবার মায়াবিনীও বটে। লেখকের সাধনা অনেকটা ব্রহ্মচারীর সাধনা--সংসারে থেকেও সে সন্ন্যাসী।"

কোথায় যেন নিখিলেশ পড়েছিলেন, মেয়েরা বড্ড মানুষকে জড়িয়ে ফেলে। মায়া, মমতা, ভালোবাসা—এসব চটচটে রস, মানুষকে কাছে টানাই এদের ধর্ম, দূরে সরিয়ে দেওয়াটা কেবল গল্প উপন্যাসেই হয়ে থাকে।

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। বহু জনের বহু উপদেশ বহু আশীর্বাদ মাথায় করে নিখিলেশ সাহিত্যের আঙিনায় এখনও উপস্থিত রয়েছেন। বড় বিপজ্জনক এই সাহিত্যঅঙ্গন—এখানে কে কতক্ষণ টিকে থাকবে তা কেউ জানে না। নিখিলেশ নিজেই তো দেখলেন উল্কার মতন কেউ-কেউ সাহিত্যগগনে উপস্থিত হয়ে উল্কার মতন বিলীন হলেন। সাহিত্যের পাঠক আজ যাঁকে জয়ধ্বনি দিল আগামী কালই তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। নিখিলেশের জীবনের সবচেয়ে দুশ্চিন্তা এই 'ভূতপূর্ব' লেখক হবার ভীতি। বেঁচে আছি অথচ কলম নেই। ভাবতেই পারেন না নিখিলেশ—অজানা এক আশঙ্কায় সমস্ত শরীর শিরশির করে ওঠে।

এত বছরের সাহিত্যজীবন অতিক্রম করেও এই অনিশ্চয়তার অবসান নেই। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন পাঠক বড় উদাসীন। বিমল মিত্র বলতেন, "পাঠক বড়ই নিষ্ঠুর—মাথায় তুলে নাচানাচি করতে যতক্ষণ, মাটিতে ফেলে মাড়িয়ে যেতেও ততক্ষণ। একবার পরীক্ষায় পাশ করে বাকি জীবন শান্তিতে থাকবার চাকরি নয়। প্রতিবার পাঠকের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সামনে হাজির হওয়া, পরীক্ষার ফলাফলের জন্য নত মস্তকে অপেক্ষা করা।"

আরও একটা মজার কথা এঁদের কাছ থেকে শোনা যা নিখিলেশ নিজেও এখন বিশ্বাস করেন। জীবিতকালে এ-কাজের হিসেব মেটানো হয়

না। লেখকের রোজগারের কড়ির হিসেব হয় মৃত্যুর পরে। কোনো লেখক আজও জীবিত অবস্থায় তাঁর হিসেব চুকোতে পারেননি। জীবিতকালে লেখক বড়জোর যা প্রত্যাশা করতে পারেন তা হলো খোরাকি—কোনোরকমে বেঁচে থাকার মতন কিছু ভাতা। এই ভাতা কখনও কেবল খাই খরচের কখনও সেই সঙ্গে একটু প্রশংসা, যার অপর নাম তারিফ। সেকালের সঙ্গীতপ্রেমীরা এই তারিফের গুরুত্ব বুঝতেন তাই বাহবা দিতে শিখতেন তাঁরা। মাঝে-মাঝে একটু তারিফ ছাড়া শিল্পী বেঁচে থাকতে পারে না। হাঁপানি রোগীর বুক ভরে নিশ্বাস নেওয়ার মতো কত লেখক একটু তারিফের প্রতীক্ষায় রইলেন, পেলেন না কিছুই। অচরিতার্থ প্রত্যাশা নিয়েই চলে গেলেন এইসব বঞ্চিত শিল্পীরা মরণসাগরের ওপারে।

নিখিলেশ ধন্যবাদ জানাতেন ভাগ্যের দেবতাকে। সাহিত্যপারের যাত্রায় তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন, সম্মান পেয়েছেন, অর্জন করেছেন পাঠকের প্রসন্ন প্রীতি। তবু এক অজানা আশঙ্কায় প্রতি রচনার সময় তিনি বিড়ম্বিত হন—চিরবঞ্চিতের বেদনা পেয়ে-হারানো লেখকের বেদনা থেকে কম যন্ত্রণাদায়ক। শীর্ষে পৌঁছিয়েও তাই যশস্বী লেখকদের সুখ থাকে না। কেউ-কেউ প্রার্থনা করেন দ্রুতগতিতে মৃত্যু এসে সমস্ত অনিশ্চয়তার অবসান ঘটাক। শরদিন্দু আগে উদ্বিগ্ন হতেন না, গ্রহনক্ষত্রদের গোপন অভিসন্ধির কথা তিনি আগেই হিসেব করতে শিখেছিলেন। তাই নিজের মৃত্যু সময়ও অনুমান করে শান্ত হয়ে দেবী সরস্বতীর পূজা সাঙ্গ করে অপেক্ষা করে রইলেন ওপারের ট্রেনগাড়ির জন্যে।

গতকাল সমস্ত রাত-ধরে নিখিলেশ কলম ধরে টেবিলের সামনে বসেছিলেন। কিশোরী রাত্রি কখন মধ্যরাতের গাম্ভীর্য ধারণ করেছে, পূর্বগগনে কখন হয়েছে উষার আবির্ভাব। ভোরের পাখিরা এই অঞ্চল থেকে কাক বিদায় নিয়েছে। ভাগ্যক্রমে কয়েকটা কাক নগরজীবনের অভিশাপ অমান্য করে এখনও টিকে রয়েছে, তাদের শব্দে নিখিলেশের সংবিৎ ফিরে এসেছে, রাত শেষ। আবার এসেছে প্রভাত। আগে একসময় কাকের স্বর বড় কর্কশ এবং পীড়াদায়ক মনে হতো নিখিলেশের, কখন সুকণ্ঠ পাখিরা তাদের সমবেত কলতান শুরু করবে নিখিলেশ তার প্রতীক্ষা করতেন। এখন নিখিলেশ কাকের কণ্ঠেও সুরের সন্ধান পান, খারাপ লাগে

না, শব্দদূষণের দুন্দুভিতে জর্জরিত করে কিছুটা স্বস্তি পান। নিখিলেশ ভাবেন, এইচ-এম-ভিকে অনুরোধ করবেন পাখির শব্দের ক্যাসেট প্রকাশ করতে—বুলবুলি, ময়না কোকিল, চড়াই থেকে আরম্ভ করে ঝিঁঝি পর্যন্ত সমস্ত খেচর জগৎ আবার মুখরিত হয়ে উঠবে, মানুষ কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে পাবে তার হারিয়ে যাওয়া পরিবেশকে।

সমস্ত রাত ধরেই নিখিলেশ হাতড়ে বেড়িয়েছেন গল্প। কত বিচিত্র মানুষের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছেন নিখিলেশ তাঁর যাত্রাপথে। অনেক পুরনো মুখের সঞ্চয় যেমন শেষ হয়েছে প্রকাশিত রচনামালার পরে তেমন নতুন নতুন চরিত্রের সংস্পর্শে এসেছেন নিখিলেশ। অর্গল রুদ্ধ করে পৃথিবীকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাননি নিখিলেশ—ধনী, দরিদ্র, ক্ষুদ্র, সৎ, সফল, ব্যর্থ, সুখী দুঃখী বহু মানুষের সুখ-দুঃখ নিজের হিসেবখাতায় তুলে নিয়েছেন। জয় হোক মানুষের, জয় হোক জীবন দেবতার যিনি মানুষকে নিয়ে নিত্যনূতন খেলায় মত্ত হন আজও।

নিখিলেশ আগে সমালোচকের দৃষ্টিতে, সংশোধকের দৃষ্টিতে মানুষকে দেখতেন, সংস্কারের মানসিকতা প্রকাশিত হতো তাঁর উপন্যাসে। এখন নিখিলেশ মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ানোয় তেমন উৎসাহী নন। সংসার সমরাঙ্গনে মানুষ বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, নিখিলেশ অনুভব করেন। বড়বেশি দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে দ্বিপদ এই প্রাণীটির উপর। নিখিলেশ ভাবেন, এবার থেকে তিনি পরম বিস্ময়ে, পরমশ্রদ্ধায় সার্থক ও ব্যর্থ দুই শ্রেণির মানুষের দিকেই তাকিয়ে থাকবেন, খুঁজে বের করবেন ঈশ্বর প্রতিটি মানবশরীরের কোথায় তাঁর রাজতিলক এঁকে দিয়েছেন, প্রতিজনকে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠার শ্রেষ্ঠসৃষ্টির সম্মান।

তবু ভয় হয়ে নিখিলেশের। হয়েছে সময়, দাওগো ছুটি, সবারে আমি প্রণাম করে যাই—এই মানসিকতায় কাব্য অথবা সঙ্গীত সৃষ্টি সম্ভব, কিন্তু কথাসাহিত্য? গল্প-উপন্যাসে মানুষ আজও পরনিন্দা, পরচর্চা চাইছে—সাধু সন্ন্যাসীরা তাই কেউ উপন্যাস রচনা করেননি। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের ঘাড়ে ঋষি টাইটেলটা জোর করে চাপিয়ে দিয়েছেন বাঙালিরা উইথ রেট্রসপেকটিভ এফেক্ট। অর্থাৎ ঋষি অবস্থায় উপন্যাস লেখেননি, উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর ঋষির বেদিতে বসানো হয়েছে তাঁকে।

মানুষের ভুল ধরে-ধরে ঔপন্যাসিক নিখিলেশ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন, মন যখন মেঘের সঙ্গী হয়ে উড়তে চায় দিকে দিগন্তে, নিখিলেশ তখন পরিব্রাজকের ভূমিকা গ্রহণ করে পথকে ঘর করেন। মানবতীর্থের ঘাটে ঘাটে মানবতার মিছিল পর্যবেক্ষণ করে দু'দণ্ডের শান্তি লাভ করেন নিখিলেশ।

ভিনদেশের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে এই যে বেরিয়ে পড়া, এই যে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ—তা নিখিলেশের জীবন ও সাহিত্যকে নতুন মাধুর্যে পূর্ণ করে তোলে। এই ধরনের লেখাগুলির জন্য নিখিলেশ অন্য নাম গ্রহণ করেন। নতুন নাম ছাড়া পথ নেই ; কারণ কথাসাহিত্যিক নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে পাঠক নাটকীয়তা প্রত্যাশা করে, সমাজ সংস্কার প্রত্যাশা করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখে দাঁড়াবার দুঃসাহস প্রত্যাশা করে, সেই সঙ্গে প্রত্যাশা করে প্লটের বাঁধুনি, ঘটনার মসৃণ অপ্রতিহত ধারাবাহিকতা। বড় বেশি দায়িত্ব পড়ে যায় নিখিলেশের ওপর যা বহন করতে গিয়ে শ্লথ গতি হয়ে পড়েন নিখিলেশ। তিনি নিজেই উপন্যাসে ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ার শব্দ শুনতে পান, অথচ তখন বিবাগী মন বলতে চায়, আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ। পৃথিবীতে কে নীতির বা নিয়মের তাল লয় ভঙ্গ করল তার খবরদারির জন্যে তো চৌকিদার নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম হয়নি।

তাই নিখিলেশ যখন ভ্রাম্যমাণ তখন তাঁর নাম ভুবন মাঝি। পারানির কড়ি জমা হলো কি হলো না তা হিসেব না রেখে ভুবন মাঝি পৃথিবীর খেয়াঘাটে পারাপার করেন। কে কোথায় যেতে চায়, কেন যেতে চায়, কখন ফিরবে এসব কোনো প্রশ্নই তোলে না ভুবন মাঝি। পাল তুলে বৈঠা বেয়ে এপার থেকে ওপারে, ওপার থেকে এপারে পাড়ি দেয় ভুবন মাঝি। বড় হাল্কা মনে হয় নিখিলেশের। চরিত্রকে কল্পনার পাকশালায় চড়িয়ে সময়ের প্রয়োজন মতো রান্না সৃষ্টির হাঙ্গামায় যেতে হয় না নিখিলেশকে। কোনো সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকেও সমস্ত ঘটনামালাকে সচল রাখার অলিখিত দায়িত্বও বহন করতে হয় না নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায়কে।

ভুবন মাঝির কোনো দায় নেই, দায়িত্বও নেই ওই পারাপারটুকু ছাড়া—সে যা-দেখে তাই আঁকে। তার কোনো চরিত্র পরিপূর্ণ হতেই হবে এই দাসখত লিখে কেউ খেয়ার যাত্রী হয় না। সেই জন্মমুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত

কারুর ওপর সারাক্ষণ লক্ষ্য রাখতে হয় না। চলমান মানুষের স্রোতে অন্য এক রসের সৃষ্টি করে ভ্রমণ সাহিত্য। ভুবন মাঝিও খুশি হয়, তার কণ্ঠে সুর জাগে, তার চোখে লাগে নানা বর্ণের মহোৎসব।

ভুবন মাঝি অবশ্য পথে-প্রবাসের সব চরিত্রের নাগাল পায় না। সেই সব চরিত্র ফিরে আসে কথাসাহিত্যিক নিখিলেশের কাছে। তাদের নিয়েই গড়ে ওঠে প্রবাসের কথাসাহিত্য।

নিখিলেশ নমিতা নামে এক দুঃখিনী মেয়েকে এবারে খুঁজে পেয়েছেন প্রবাসে। মানুষ ওর ওপর বড় অন্যায় করেছে, অভাগিনী বললে কিছুই বলা হয় না। এদের ঠকিয়ে নিজের সুখ নিশ্চিত করার মতন লোকও পৃথিবীতে যথেষ্ট রয়েছে। এদের মুখোশ খুলে ফেলবেন নিখিলেশ একদিন। কিন্তু এখন নমিতাকে নিয়ে গল্প লিখে ওর কষ্ট বাড়াবেন না নিখিলেশ। অনেক পথ ঘুরে স্বদেশে শেষ দেখা নমিতাকে বিদেশের মাটিতে আবিষ্কার করলেন নিখিলেশ। নমিতা যে ভীষণভাবে বঞ্চিত হয়েছে তা প্রবাসের নির্বাসনে বসে সে ভালোভাবেই বুঝেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য। নমিতার কোনো অভিযোগ নেই কারও ওপর। এই অন্তর্নিহিত শান্তিই নমিতাকে অপরূপ ঐশ্বর্যময়ী করে তুলেছে। শোষণের গল্প, ঠকানোর গল্প পৃথিবীতে কম লেখা হয়নি আরও লেখা হবে, কিন্তু নমিতা তার হৃদয় মাধুর্যে সমস্ত ত্রিসত্তাকে স্নিগ্ধ রসে রূপান্তরিত করেছে।

কিন্তু সে গল্প এখন লিখবেন না নিখিলেশ, কিছুতেই। নমিতা তাঁর বড় প্রিয়, নমিতার শেষ বিপর্যয়কে নিখিলেশ হয়তো বাধা দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি কিছুই করেননি।

প্রত্যেক মানুষকে সাহিত্যের চরিত্র হিসাবে চিন্তা করে নিখিলেশ অনেক সময় তাদের ঠিক বুঝতে পারেননি। দোষ-গুণে মেশানো মানুষের কথা যতই লেখা হোক, নিখিলেশের এক-একসময় মনে হয় গুণ অপেক্ষা দোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে ভোগ নির্ভর ক্ষয়িষ্ণু সমাজে। অতিমাত্রায় ভোগের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থনির্ভর করে তুলছে। এর থেকে মুক্তির পথ কেউ যদি দেখতে পারত। নিখিলেশ নিজের শক্তির সীমা সম্পর্কে সচেতন। তিনি এই স্বার্থসর্বস্ব সুখের মাদকতায় অসুস্থ সমাজের কিছু মানব-মানবীকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে পারেন,

এই পর্যন্ত। কিন্তু সংস্কারের ভূমিকায়, পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় নিজেকে দেখতে সাহস পান না নিখিলেশ—নিখিলেশ জানেন, প্রত্যেক মানুষের হৃদয়েই একটি প্রদীপ আছে, সাহিত্যের অক্ষয় স্রষ্টারা তাঁদের অমোঘ শক্তিতে এই প্রদীপে আগুন জ্বালিয়ে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করতে পারেন। কিন্তু হে ঈশ্বর, এই নিখিলেশকে তুমি তো সেই দুর্লভ শক্তি দাওনি।

নিখিলেশ রাতের অন্ধকারে আপন সাধনায় মগ্ন থেকে বুঝতে পারেন প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশ্বভুবনকে আলোকিত ও মহিমান্বিত করার মতন সৃষ্টিশক্তি তাঁর মধ্যে নেই। নিখিলেশ বড় জোর কালের করণিক। অথবা সময়ের সাক্ষী হিসেবেই তাঁর ভূমিকা। কোনো টীকা-টিপ্পনি ছাড়া সময়ের প্রবাহকে তিনি কেবল তাঁর খাতায় লিপিবদ্ধ করতে পারলেই যথেষ্ট।

নমিতা সম্বন্ধে যে কিছু লিখবেন না নিখিলেশ এই সিদ্ধান্তে আসতেই প্রায় সমস্ত রাত কেটে গেল। দুঃখ হলো লেখক নিখিলেশের। এমন একটা চমৎকার চরিত্র সামনে থাকলে কলম অবশ্যই নিসপিস করবে। কিন্তু মানুষ নিখিলেশ, সময়ের সাক্ষী নিখিলেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। ভালোই হয়েছে। নমিতা এখনও তো বেঁচে রয়েছে—সমস্ত পাতা ঝরে যাবার পরেও এক-একটা গাছ বেঁচে থাকে। খেয়ালি-প্রকৃতি কঙ্কালের মধ্যেও কখনও প্রাণ সঞ্চার করেন, সে ফিরে আসে আপন মাধুর্যে। নমিতাকে সেই সময়টুকু দেওয়া প্রয়োজন। এই অবস্থায় তাকে আঘাত করার অধিকার নেই মানুষ নিখিলেশের, তাতে যতই রাগ করুক লেখক নিখিলেশ।

আরও একটি চরিত্রকে অনেকক্ষণ ধরে মনের কাঁটায় বুনবার চেষ্টা করেছেন নিখিলেশ। প্রবাসের স্বাধীন হওয়ায় মুক্তির স্বাদ বুক ভরে গ্রহণ করে সে বিকশিত হতে চেয়েছিল। গজু মার্কা স্বামী, যাকে কবিতার সহ্য হয়নি, তাকে ত্যাগ করেছিল শেষ পর্যন্ত। স্থানীয় সমাজে সমালোচনা হয়েছিল, বাঙালিরা সাতসাগর পেরোলেও সঙ্গে করে তাদের পল্লীসমাজকে কৌটো বন্ধ করে নিয়ে যায়। কবিতা ওসব তোয়াক্কা করেনি। কবিতা নিজের অজান্তে সুন্দর কথা বলেছিল—"জানেন তো, ছন্দমিল না হলে কবিতার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।" কবিতা বলেছিল নিখিলেশকে, "আমাকে নিয়ে লিখুন আপনি। বউ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে এই ভয় মনে ঢুকলে বাঙালি পুরুষরা অনেক সুসভ্য হয়ে উঠবে।"

"চাকরি হাতছাড়া হবে এই ভয়েই তো বাঙালি সিঁটকে থাকে, কবিতা", নিখিলেশ বলেছিলেন। "বাড়তি বোঝা কি নিতে পারবে?" সংশয় ছিল নিখিলেশের মধ্যে।

"ঘরে রাজা, বাইরে খাজা, এইসব পুরুষ নিয়ে সমাজ কী করবে?" তিক্ততা ছিল কবিতার মন্তব্যে। কবিতার ধারণা, ঘরে নাড়া না খেলে চরিত্রগত পরিবর্তন হবে না বাঙালিদের।

মেয়েদের বিদ্রোহ করার পরামর্শ দিয়েছিল কবিতা। নিখিলেশ ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। কবিতা তখন বলল, "বিদ্রোহ করতে বলতে হবে না। কোনদিন দেখবেন বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছে। মেয়েদের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা একটু হোক। তারপর দেখবেন।"

কবিতা সত্যিই বিদ্রোহিণী। সে বলেছিল, "এখানকার মেয়েরা ভীষণ সুপার ফিশিয়াল--কোনো ব্যাপারের গভীরে ঢুকতে উৎসাহ নেই। নারী স্বাধীনতার নামে এরা অন্তর্বাস পুড়িয়ে ফেলছে—ব্রা বার্নিং উইমেন বলে একটা গালাগালিই সৃষ্টি হয়ে গেল। আজ আমরা কিন্তু বিদ্রোহের সময় নিজের অন্তরটাই পুড়িয়ে ফেলব।"

কবিতা দাসের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন লেখক নিখিলেশ। কবিতা হেসেছিল। "এই দেখুন আমাকে। তিন বছর কলকাতায় স্বামীদেবতার জন্যে খাবার সাজিয়ে প্রতিদিন বসে থাকতাম, কখন স্বামীদেবতা ইয়ারবন্ধুদের সান্নিধ্য শেষ করে ঘরে ফিরবেন কবিতা দাসীর অন্ন ব্যঞ্জন মুখে তোলার জন্যে। আর থ্রি ইয়ার্স ইন দ্য স্টেটসের পরে আমাকে দেখুন—আমি ওকে ভুলেই গিয়েছি। নরকে যাবার ভয় নেই আমার! এই অ্যাপার্টমেন্টে আমি একলা থাকি।

"কারুর জন্যে আমাকে রাঁধতে হয় না, কারুর জন্যে ভাত বেড়ে আমাকে অপেক্ষা করতে হয় না নো প্রবলেম। আর দেখুন লোকটাকে—সবদিকে ধেড়ে কিন্তু স্বভাবে বেবি—বুড়োখোকা বলতে পারেন। একদিন আমার শরীর খারাপ হয়েছিল, কী করে রান্না হবে এই ভেবে মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়েছিল। এখন সেই লোক চমৎকার ঘর সামলাচ্ছে, নিজে রান্নাও শিখে নিয়েছে।"

কবিতার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন নিখিলেশ। কবিতা বলেছেন,

"অ্যাও হয় অও হয় এই মানসিকতায় ফেলে বাঙালি জাতটার সর্বনাশ করবেন না। বাঙালিকে বলুন, হয় এসপার না হয় ওসপার। মধ্যপথ বলে কিছু নেই। ওই যে দক্ষিণেশ্বরের পুরুতমশাই বলে গেলেন, পাঁকের মধ্যে পাঁকাল মাছের মতো থাকবি তা হয় না, পাঁকে থাকলেই গায়ে পাঁক লাগবে, বাঙালির চামড়া আর পাঁকাল মাছের চামড়া তো এক নয়, নিখিলেশবাবু।"

কে এই আকাট গদ্য মেয়ের নাম কবিতা রেখেছিল কে জানে। কবিতা একমত হয়নি, নিখিলেশ মনে করিয়ে দিয়েছে—অমিত্রাক্ষরও একটা ছন্দ, শুধু বাঙালিরা ঐ ছন্দ নিয়ে বেশিদূর এগোতে পারেনি। মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে ওই ছন্দটাকেও কবরে চাপা দিয়েছে।

কবিতা বলেছিল, "ভাববেন না আমি বেয়াড়া, বাঙালি মেয়েদের মধ্যে একমাত্র ছন্দপতন। প্রত্যেক শুভ্রা, অনিতা, কাবেরী, কুহেলির মধ্যে কিন্তু একজন ছিন্নমস্তা লুকিয়ে আছেন, নিখিলেশবাবু। আপনারা নাম কা ওয়াস্তে কালীপুজো করেন। কানোরিয়া, বাজোরিয়া, জালানদের মতন মুখুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, দাস, ঘোষ, মিত্তিররাও এখন লক্ষ্মীর কাছে লোভের বশে দাসখত লিখে বসে আছে। তফাত এই যে সব উমেদারের দিকে নজর দেবার মতন প্রচুর সময় মা লক্ষ্মীর নেই।"

নিখিলেশ স্তব্ধ হয়ে বলেছিলেন বিদেশে কবিতার ওয়ানরুম অ্যাপার্টমেন্ট—যার অদ্ভুত একটা নাম, কন্ডিমনিয়াম নাকি।

কবিতা বলেছিল, বাঙালি মেয়েকে ছিন্নমস্তা করে কলকাতা, হাওড়া বা বাঁকুড়ার পরিবেশে আপনি লিখতে পারতেন না, নিখিলেশবাবু। তার থেকে বরং এক্সপেরিমেন্টটা কোনো কমলা বা শোভনা যে প্রবাসে বসবাসকারিণী তার ওপর করুন। তারপর যদি দেখেন বাঙালি পুরুষমানুষরা তাদেব পান-চিবনো সতী-সাবিত্রীদের যাঁরা দল পাকিয়ে আপনাকে কলকাতা ছাড়া করছে না তখন বরং পরের বইতে ওই কমলা বা শোভনাকে কলকাতায় এনে হাজির করবেন।"

কবিতা মেয়েটি সত্যিই অদ্ভুত। নিখিলেশকে বলল, "মুখ তো শুকনো হয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে, দুপুরে খাওয়াই হয়নি।"

নিখিলেশ বুঝতে পারেন এই মায়াবিনীদের মধ্যেও মা লুকিয়ে রয়েছে, যতই তারা অস্বীকার করুক।

বাঙালি মেয়েরা সত্যিই কোনোদিন বিদ্রোহিণী হবে? নিখিলেশ ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না।

শুধু বিদ্রোহ করল, ঘর ভাঙাল, বেরিয়ে গেল, এইটাই কি মেনে নেবার মতন একটা পরিণতি? নিখিলেশ ঠিক এই ধরনের শেষে স্পষ্ট হতে পারেন না। নিখিলেশ দেখতে চান কবিতারা শেষ পর্যন্ত সুখী হলো। এইখানেই তো অসুবিধে। কবিতা সুখী হয়েছে লিখে দিলে তা তো বানানো হবে। জলজ্যান্ত একটা মানুষের ডকুমেন্টারি ছবি তুলে শেষে স্রেফ একটা বানানো পরিণতি লিখে দিতে ভালো লাগে না নিখিলেশের। ঘটনা যাই ঘটুক পরিণতিটা পছন্দ মতন লিখে দেওয়ার মধ্যেও সাহিত্যিক অসততা থাকে।

না, এত তাড়াতাড়ি কবিতার গল্প লেখা ঠিক হবে না নিখিলেশের। এই তো সবে সংসার ভেঙেছে কবিতা, শুরু করেছে নিজস্ব জীবনযাত্রা। প্রবাসের পরিবেশ ও পরিসংখ্যান দুইই সাহায্য করছে তাকে। এখানে কে একলা থাকল, কে দোকলা থাকল তাই নিয়ে পড়শিদের মধ্যে, বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে না। আর পরিসংখ্যান সে তো আরও সর্বনাশ। বলেই দিচ্ছে, কয়েকজন নয়, লাখ নয়, স্রেফ কোটি-কোটি মানুষ এই দেশে একলা থাকতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, দোকানদাররাও তো মেনে নিয়েছে, ছোট ছোট প্যাকেটে জিনিস বিক্রি হচ্ছে যা একজনের পক্ষে পর্যাপ্ত সুতরাং জিনিস নষ্ট হচ্ছে না।

নিখিলেশ ভাবলেন, নতুন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে কবিতা নিজেই মনস্থির করবে, সঙ্গ ও স্বাধীনতার মধ্যে কোনটা তার পক্ষে বেশি প্রয়োজনীয়। হয় আশ্চর্যভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে কবিতা যা হাওড়ার অবিনাশ ব্যানার্জি লেনে আদৌ সম্ভব ছিল না, অথবা কবিতা নিজেই আবিষ্কার করবে অবিনাশ ব্যানর্জি লেনের বোকা-বোকা মেয়েগুলো সারাক্ষণ হেরে গিয়েও শেষপর্যন্ত জিতে যায়। বাঁধা ছকের জীবন এবং অপরিবর্তিত মূল্যবোধের এই সুবিধে—কষ্ট দেয় কিন্তু সর্বস্ব কেড়ে নেয় না। দুঃখ হয়, কিন্তু কখনও মনে হয় না আমি একা।

নিখিলেশ নিজের সিদ্ধান্ত ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কবিতার জীবন-কাহিনি নষ্ট করবেন না। যতই ব্যস্ততা থাকুক নিখিলেশকে বুঝতে হবে,

ডিটেকটিভ গল্পের মতন তাৎক্ষণিক পরিণতি হয় না সব জীবনে। সময় দিতে হয় মানুষকে, সময়ের পরীক্ষাই যে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা তা নিখিলেশ নিজেই ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর সাম্প্রতিক এক লেখায়। এ নিয়ে কথা উঠেছে, নিখিলেশ কি শ্লথগতি সমাজকে পরোক্ষ সমর্থন করছেন? নিখিলেশ কি প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে আত্মসমর্পণের কথা ভাবছেন? ভাবুক ওরা। কিছু নিন্দুক তো লেখকের কপালে জুটবেই যারা লেখক বাঁদিক দিয়ে গেলে তাঁকে টেনে ডান দিকে আনবার জন্যে অধীর হয়ে উঠবে ; যদি ডানদিকে দিয়ে যেতে চান নিখিলেশ তাহলেও তাঁকে অন্যদিকে নিয়ে যাবার জন্যে উঠেপড়ে লাগবে এরা।

করুক এসব। বিমল মিত্র সেবার বলেছিলেন, "যে লেখকের কপালে শুধু ভক্ত জুটেছে, নিন্দুক জোটেনি তাঁর থেকে অভাগা লেখক কেউ নেই। নিন্দুককে সাবানের মতন ব্যবহার করে পরিচ্ছন্ন হবার পরামর্শ শরদিন্দুবাবুও দিয়েছিলেন, যদিও রসিকতা করে তিনি বলেছিলেন, "এক এক সময় এত সাবান জুটে যায় যে সারাক্ষণই স্নানঘরে ঢুকে থাকতে হতে পারে শুচিবাইগ্রস্ত রমণীর মতন, লেখার সময়ই পাওয়া যাবে না!"

দুটো জ্বলজ্যান্ত চরিত্রকে হাতছাড়া করে, কিছুটা নিরাশ হয়ে ভোরবেলায় বসেছিলেন নিখিলেশ। সবসময়েই যে লিখে যেতে হবে এমন কোনো দাসখত লিখে দেওয়া নেই। শিল্পীর স্বাধীনতা মানে শুধু লেখার স্বাধীনতা নয়, না-লেখারও স্বাধীনতা—এই সত্যটুকু সবাই মেনে নেয় না কেন? ক্লান্ত নিখিলেশ ভাবলেন, এ-বিষয়ে কোথাও লিখে যেতে হবে। এই যে জাঁক চাপিয়ে লেখকের বুকের ওপর বসে থাকা লেখকের জন্যে এটা ভালো নয়। বিমল মিত্র অবশ্য নিখিলেশের সঙ্গে একমত হতেন না। বলতেন, "জাঁক ছাড়া সন্দেশ তৈরি হয় না, নিখিলেশবাবু। এক একসময় মনে হয়, লেখকরা হলেন সরষের মতন, নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পিষ্ট না হলে তেল বেরোয় না।"

কখনও-কখনও এমন খরা আসে, মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে না। তখন লেখকরা গল্প লেখা বন্ধ রেখে অন্য কাজ করেন। কেউ প্রবন্ধকারে রূপান্তরিত হন, কেউ লিখতে বসেন আত্মজীবনী।

আপন আত্মজীবনী রচনার সময় আসেনি নিখিলেশের। তা ছাড়া

জীবনের প্রধান প্রধান অভিজ্ঞতাকেই তো নিখিলেশ কথাসাহিত্যে রূপান্তরিত করেছেন। যা নিজের কথা ছিল তা চরিত্রদের কথা হয়ে ইতিমধ্যেই পাঠকের দরবারে উপস্থিত হয়েছে। নিখিলেশ এই সময়ে আধা-সাংবাদিকে রূপান্তরিত হন। লেখেন নানা মানুষের বিচিত্র কথা, এমন মানুষ যাদের ঠিকানা নিখিলেশের মানসলোকে নয়, যাদের সন্ধান মেলে আমাদেরই এই পরিচিত জগতে। এইভাবেই অনেকদিন আগে নিখিলেশ লিখেছেন সমাজসেবিকা মিসেস সর্বজয়া ব্যানার্জির কথা, তাঁর পরিচালিত অনাথ ভবন 'সোনার তরী'র কথা।

এই লেখার তারিফ মিলেছে অনেক। যদিও এই হিংসুটে জাতের একজন বেনামে মিসেস ব্যানার্জির চরিত্রহননের চেষ্টা করেছেন, এমনকী ইঙ্গিত করেছেন ওঁর বাধাবন্ধনহীন প্রথম যৌবনের কথা, বলেছেন ওঁর নাম হওয়া উচিত ছিল 'সর্বজয়া'! হয়তো মিসেস ব্যানার্জির ছিল কোনো ব্যক্তিগত অপ্রাপ্তির বেদনা বা প্রাপ্তির সুখস্মৃতি, যা মিসেস ব্যানার্জি সহজবোধ্য কারণে নিখিলেশের সঙ্গে আলোচনা করেননি, কিন্তু ঈর্ষাকাতর বঙ্গীয় সমাজে তার জন্য ক্ষমা নেই।

কিন্তু নিখিলেশ অনেক কঠিন হয়ে উঠবার সাহস সংগ্রহ করেছেন। তাঁর এই ধরনের রচনায় তিনি মানুষের ফুটো সন্ধান করে বেড়াবেন না। সন্ধান করবেন তাঁদের যাঁরা আপন সাধনায়, আপন অধ্যবসায়ে প্রতিকূল শক্তির ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছেন।

এই ধরনের সফল মানুষের কথা বাঙালিদের শোনা প্রয়োজন, কারণ তারা ধরেই নিয়েছে জীবনযুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য। অমোঘ পরিবেশের বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তির একক সংগ্রাম অর্থহীন, একমাত্র দলবদ্ধ রাজনৈতিক সংগ্রামই মুক্তির পথ, অগ্রগতির পথ। দলবদ্ধ রাজনীতির গুরুত্ব অস্বীকার করেন না নিখিলেশ, কিন্তু ব্যক্তি যে সমাজে নপুংসকে পরিণত হবে সে সমাজের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে অসম্ভব এ কথা বঙ্গীয় সমাজের চোখের সামনে বারবার উপস্থিত করা বিশেষ প্রয়োজন।

সেই জন্যেই নিখিলেশ কিছুদিন হলো সোমেশ্বর মুখার্জির জীবনবৃত্তান্ত রচনায় হাত দিয়েছিলেন। শিল্পপতি সোমেশ্বরের নাম বাঙালিমহলে অপরিচিত নয়। যে সামান্য কয়েকজন বাঙালি বিজনেসের বাতি প্রবল

প্রতিকূল পরিবেশে টিমটিম করে জ্বালিয়ে রেখেছেন সোমেশ্বর তাঁদের একজন। বিড়লা, মোদি, জালানদের তুলনায় সোমেশ্বর মুখার্জি প্রায় কিছুই নয় কিন্তু বাঙালি মহলে তিনি একজন কেষ্টবিষ্টু। বাঙালিরা যে আদৌ বাণিজ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র হতে পারেন তা কোনো বাঙালি এখন বিশ্বাস করে না।

সোমেশ্বর নিজেই তো সেবার বললেন, "আমার নিজেরই মশাই খেয়াল ছিল না। আপনার লেখা পড়ে মনে পড়ল, ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার সময় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পপতি ছিলেন একজন বাঙালি। এখন প্রথম এক হাজারের মধ্যে কোনো বাঙালি নেই। রয়াল বেঙ্গল টাইগার এবং রয়াল বেঙ্গল বিজনেসম্যান দুই উধাও দেশ থেকে।"

সোমেশ্বর সম্বন্ধে লেখার প্রস্তাব এসেছিল এক সংবাদপত্র সম্পাদক মারফত। নিখিলেশ শুনেছিলেন, সোমেশ্বরের স্ত্রী তাঁর লেখার অনুরাগিণী। সোমেশ্বর নিজে অবশ্য স্বীকার করেছিল, "আমার মশাই, লেখাটেখা পড়ার ধৈর্য আসে না কিন্তু যেখানেই যাই আপনার কথা শুনি, মেয়েদের মধ্যে আপনি পপুলার, হিংসে করতে ইচ্ছে হয় আপনাকে।"

চাপা হাসিতে মুখ আলোকিত করে নিখিলেশ তাকিয়েছিলেন সোমেশ্বরের দিকে। সোমেশ্বর তাঁর পঞ্চান্ন বছরের পুরনো মাথায় হাত রেখে সামান্য চুলকোতে-চুলকোতে বলেছিলেন, "অদ্ভুত এই বাঙালি মেয়েরা। বিজনেসে আপনি রাতারাতি দশ লাখ টাকা প্রফিট করুন আপনাকে হিরো বলে মনে করবে না. কিন্তু আপনি গান শোনান. থিয়েটার করুন, গল্প লিখুন, আপনার রোজগার কানাকড়ি না হলেও বাঙালি মেয়েরা ভাববে, আপনি রাজপুত্তুর।" সোমেশ্বর এরপর দুঃখ করেছিলেন, যত লোক রাজেন মুখুজ্যেকে জানে তার থেকে ঢের বেশি লোক জানে রাণু মুখার্জিকে। এই হচ্ছে বাঙালিদের স্বভাব, গোড়াতেই গলদ বলতে পারেন। এদের বলুন, বিদ্যেসাগর যে দানসাগর হতে পেরেছিলেন তার কারণ তাঁর পাবলিশিং-এর বিজনেস ছিল : বলুন, রবি ঠাকুরও বিজনেসে নেমেছিলেন, বাঙালিরা বিশ্বাসই করবে না। ঐ যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. অনার্সে ফার্স্ট হওয়ার জন্যে ঈশান স্কলারশিপ, তার টাকা জুগিয়েছিলেন এক ইস্কুলের হেডমাস্টার, ঈশানচন্দ্র ঘোষ- কিন্তু তাঁর

পয়সা শেয়ার কেনাবেচা ব্যবসা থেকে।"

সোমেশ্বর মুখার্জির পিতৃদেব গোকুলেশ্বরও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর পিতৃদেব নকুলেশ্বরও ব্যবসায়ী ছিলেন। সোমেশ্বর নিজেই বলেছিলেন নিখিলেশকে, "উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে জল গরম করতে দিয়ে চাল আনতে গেলে ব্যবসা হয় না। ওই যে রাতারাতি পথের ভিখিরি থেকে রাজা হওয়া তা আর এ-যুগের বিজনেসে সম্ভব নয়। ওর নাম ফাটকা। ওতে বিজনেস ডোবে, কখনও বাঁচে না।"

নিখিলেশ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, "আজ দীর্ঘ সময় সোমেশ্বরের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হলো। বিজনেসে একটা কালচার প্রয়োজন, ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। সামান্য কেনাবেচা থেকে একটু বড় ধরনের কেনাবেচা, তারপর আরও বড়, এবং অবশেষে কলকারখানায় উত্তরণ। বিজনেস সম্পর্কে সোমেশ্বরের নানা অদ্ভুত ধারণা আছে, যেসব বাঙালিদের কিছু অর্থ হয় তাদের মধ্যে একধরনের একগুঁয়েমি ও ঔদ্ধত্য গড়ে ওঠে, যার অর্থ দাঁড়ায় আমি সব বুঝি। সংস্কৃতি ও সাহিত্য ও আর্টের জগতে বাঙালি সকলের কাছ থেকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত, তার সমস্ত দরজা-জানালা উন্মুক্ত। কিন্তু অর্থের অন্বেষণে বেরিয়ে এঁরা অন্যরকম নিজেও ভাবেন না। অন্যের ভাবনা গ্রহণ করতেও তেমন উৎসাহ নেই। সোমেশ্বরবাবুও অন্য দলে নন।"

তবু নিখিলেশ কঠিন হতে চান না। বিজনেসের জগতে দু-একটা বাঙালি বাতি টিমটিম করে জ্বলছে, এদের নিভিয়ে ফেলতে মুহূর্তের সময় লাগবে না। কিন্তু ওই যে নিখিলেশ সেদিন সম্পাদক শুভঙ্কর সেনকে বললেন, "ধ্বংস করা কত সহজ, আর গড়ে তোলা কত কঠিন।" এই গড়ে তোলার প্রত্যাশা নিয়েই তো নিখিলেশ রাজি হয়েছিলেন সোমেশ্বরের জীবনবৃত্তান্ত রচনা করতে। সামান্য দোষত্রুটি থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এদেরই জয়ধ্বনি তুলতে হলে, প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বাঙালি মানসে যাতে নবাগতরা উৎসাহ পায়, অনুপ্রেরণা পায় বাণিজ্যলক্ষ্মীর সেবায় প্রাণোৎসর্গ করতে।

সোমেশ্বরের গুণগুলি লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন নিখিলেশ। সোমেশ্বরের প্রতিষ্ঠানগুলির নতুন পরিবেশে নাটকীয় অগ্রগতি হয়নি,

যেমন হয়েছে তামিলনাড়ুর কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সামান্য শুরু থেকে এই পারিবারিক উদ্যোগগুলি কয়েক দশকের মধ্যে সর্বভারতীয় ইন্ডাস্ট্রিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সোমেশ্বর এখনও পিতৃদেব গোকুলেশ্বরের কথাগুলি মেনে চলেন—ধীরে-ধীরে এগোবে, পৃথিবী বড্ড পিচ্ছিল। আরও একটি পৈতৃক উপদেশ : বাধ্য না হলে ধার করবে না। ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ ভীত এক প্রজন্মের বাঙালি। নিখিলেশ কোথায় এক হিন্দিভাষী গুপ্তাজির বক্তব্য পাঠ করেছিলেন, দেনাদার না হলে পাওনাদার হব কী করে?

সোমেশ্বর মানুষটির শরীর একটু ভারী। মুখটি গোলাকার—ইংরিজিতে যাকে বেবিফেস বলে। এই ধরনের মানুষের গ্রীবা প্রায়ই ছোট হয়, যা ফোটোগ্রাফারের সমস্যা সৃষ্টি করে কারণ পৃথিবীতে কোনো মানুষই তাঁর ডবল থুতনি পছন্দ করে না। সোমেশ্বরের রঙ শ্যামলা। এ-বিষয়ে তিনি নিজেই রসিকতা করেন, "কয়লা ধুলে যে ময়লা যায় না তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই গোপালনগরের মুখুজ্যেরা—তিন পুরুষ মেমসাহেবদের মতন ফর্সা বউ গরিব ঘর থেকে তুলে নিয়ে এসেও কোনো কাজ হয়নি, বংশধরদের কালোর জেল্লা একটু কমেছে, কিন্তু অমাবস্যা কাটেনি।"

এরপর চাপা গলায় সোমেশ্বর বলেন, "অমাবস্যা কাটিয়েছি আমি। আমার ছেলেকে দেখেছেন? গায়ের রং দেখেই পুরুতমশাই আটকড়াইয়ের দিনেই বলেছিলেন, নাম দাও গৌরাঙ্গ। আমি মশাই জানি, ওসব নাম এ যুগে সেকেলে মনে হয়। তাই অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানিতে এক বন্ধু ছিল তাকে ধরলাম। সেই সাজেস্ট করল, নাম দাও অভিনব। এই বন্ধুই সাবধান করে দিয়েছিল, ছোট করার তাগিদে খবরদার কিন্তু নব বলে ডাকবে না। বরং অভি বলবে।"

সোমেশ্বরকে নিয়ে গল্প লেখার কথা ভাবতে হবে তা কখনই মনে হয়নি নিখিলেশের। সোমেশ্বরের ব্যস্ত জীবনের চিত্রমালা এঁকে নিখিলেশ শুধু দেখাতে চান যারা বিজনেস করে তাদের বাঙালি হতে আপত্তি নেই। এমন কিছু অসাধারত্ব তাঁদের মধ্যে নেই যা সাধারণ বাঙালির মধ্যে অনুপস্থিত।

কিন্তু লেখক যা ভাবেন তা সব সময় তাঁর সৃষ্টির জগতেও ঘটে না।

চরিত্ররা চলে যায় পরিকল্পনার বাইরে। নিখিলেশ যখন সোমেশ্বরের সম্বন্ধেও চিন্তা করছিলেন প্রাবন্ধিক হিসেবে আর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন কথাসাহিত্যিক হিসেবে ঠিক সেই সময় শুনলেন কাশীনাথ এসেছে।

যখন চিন্তার গর্ভে গল্প ধরার চেষ্টা করেন সেই সময় নিখিলেশ মানুষের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলেন, কারুর সঙ্গেই দেখা করতে চান না। কিন্তু কাশীনাথের কথা আলাদা। লেখক মহলে কাশীনাথকে অনেকেই জানেন। গল্প সাপ্লাই করে কাশীনাথ কুণ্ডু।

প্রতিষ্ঠিত লেখকদের প্রিয় গল্প সাপ্লায়ার থাকে। কয়েকজন লোক এই ভাবে করে যাচ্ছে। রমাপতি কর্মকার বলে এক সাপ্লায়ারের গল্প কে যেন লিখেছিলেন সেবার।

কাশীনাথ কুণ্ডুর বয়স বছর ছত্রিশ। রোগা পাকানো চেহারা—যেন বেতের তৈরি শরীর। তাই দেখলে আরও কমবয়সী মনে হয়। কাশীনাথের নাক ও চোখ নজরে পড়ে যায়। ভাগ্য থাকলে কাশীনাথ চিত্রতারকা হতে পারত। কিন্তু তার নেশা গল্প পড়া। বাংলায় এমন বই নেই যা কাশীনাথ পড়ে না। সব গল্পের সামারি ওর মুখস্থ।

সাহিত্যিক উমাশঙ্কর হালদার এই গুণের জন্যেই কাশীনাথকে পছন্দ করতেন। উমাশঙ্করের বদ অভ্যাস আধুনিক বাংলা বই একদম পড়তে পারতেন না। তাঁর শেষ প্রিয় লেখক বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু উমাশঙ্কর খবর রাখতেন কোন নতুন উপন্যাসে কী গল্প আছে, প্রধান চরিত্রগুলো কী করতে চাইছে। পুজোর সময় রাশি-রাশি শারদসংখ্যা পেতেন উমাশঙ্কর, আকাদমির উপদেষ্টা হিসেবেও অনেক বই নজরানা মিলত। এই সব তিনি কাশীনাথের হাতে নিয়মিত তুলে দিতেন। কাশীনাথ উধাও হয়ে যেত কয়েকদিন, রাত জেগে সব গল্প পড়ে ফেলে আবার হাজির হতো উমাশঙ্করের বাড়িতে।

উমাশঙ্কর লেখার খাতা থেকে মুখ তুলে বলতেন, "এসো কাশীনাথ, খবর কী?"

মুড়ি আসত দু'জনের জন্যে। সেই সঙ্গে কাশীনাথের জন্যে স্পেশাল তেলেভাজা এবং দরবেশ। উমাশঙ্করের তেল ও মিষ্টি দুই বারণ ছিল। ফতুয়া পরে উমাশঙ্কর বলতেন, "খাও কাশীনাথ।"

কাশীনাথ বলত, "শিবতোষ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'আবর্জনা' পড়ে দেখুন, স্যর। ফাটিয়েছে এবার।"

"আবর্জনা, ছাইপাঁশ পড়বার সময় নেই আমার, কাশীনাথ। শিবতোষ তো বাংলাই লিখতে জানে না। শিবতোষের লেখা পড়লে আমার লেখা খারাপ হয়ে যাবে।" তারপর জিজ্ঞেস করতেন, "গল্পটা কি তুমি সাপ্লাই করেছিলে?"

"না স্যর! ওঁর সব কাজ তো রমাপতিবাবুর সঙ্গে। উনিই দীর্ঘদিন ধরে গল্প সাপ্লাই করে আসছেন। আমিও স্যর যাই না। একই লাইনে বিজনেস করি। চেনাজানা লোক, শুধু-শুধু দু'জনে ফাইট করে কী লাভ?"

"ফাইট করেই লেখকদের বেঁচে থাকতে হয়, কাশীনাথ। অলিখিত ফাইট চলেছে, শুধু জীবিত লেখকদের সঙ্গে নয়, মৃত লেখকদের সঙ্গেও, লেখক মরে গেলেন বলে তাঁর বই পড়া বন্ধ হচ্ছে না।"

এরপরেই নিখিলেশের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে উমাশঙ্করের। তিনি নাটকীয়ভাবে আবর্জনা উপন্যাসের গল্পটা বলে গিয়েছেন। "কী করে গল্প না বলতে হয় তার টেক্সটবুক হতে পারে। ওই ভাবে রানিং বাসে মেয়েমানুষের চরিত্র কেউ প্রথম ইনট্রোডিউস করে! সমস্ত কাঠামোটায় ফাটল ধরিয়ে দেবে একটা মেয়ে।"

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করেছেন, "আটচল্লিশ ঘণ্টা হয়নি পুজোসংখ্যা বেরিয়েছে, এর মধ্যে আপনি 'আবর্জনা' পড়ে ফেলেছেন!"

"তুমিও যেমন! আমার তো মাথা খারাপ হয়নি যে শিবতোষের লেখা পড়ব। ওর বাংলায় এগারোটা মুদ্রাদোষ আছে, ওসব ভীষণ ছোঁয়াচে, যদি একবার ধরে নেয় তা হলে লেখার বারোটা বেজে গেল। আমি পড়ি না, কিন্তু লোক রেখেছি, তারা পড়ে রিপোর্ট দিয়ে যায়। বরং ভালো লিখেছে আব্দুল জালিম, কিন্তু এই লোকটার মুশকিল হলো ময়দা মাখতে জানে, কিন্তু গল্পটা ভাজতে শেখেনি। সিঙাড়া কাঁচা ময়দার ভ্যাপসা গন্ধে লোকের তো বমি আসবে।"

উমাশঙ্কর বললেন, "আমার কাশীনাথ কুণ্ডুর সর্বগ্রাসী গল্পক্ষুধা—ও সাপ ব্যাঙ সব খায়! এমনকি বিপুল মিত্তিরের থানইট গপ্পোও পড়ে ফেলে। জানো তো বিপুলের পাবলিশার্সের কথা—কোনো প্রুফ রিডার টিকছে না!

বিপুল মিত্তিরের থানইট নাচন পড়তে গিয়ে সব শরীর খারাপ করছে, একজনের তো চোখের রেটিনাই খুলে গেল।"

পাঠক থেকেই গল্প সাপ্লায়ার হয়ে উঠছে কাশীনাথ। সাহিত্যিক উমাশঙ্করই একবার নিখিলেশকে ফোন করেছিলেন। "কেমন অবস্থা নিখিলেশ? তোমার ধারাবাহিক উপন্যাস, গ্রানাইট খুব জমে উঠেছে রিপোর্ট পাচ্ছি। তা তুমি নাটাশা বলে ট্যুরিস্ট মেয়েটাকে শেষ পর্যন্ত কী করবে? আমার কাছে যেসব খবর আছে, তাতে ভয় হচ্ছে তুমি ওকে শেষ পর্যন্ত খনির ভিতর জীবন্ত সমাধি দেবে।"

"সত্যি আপনি খবরাখবর রাখেন বটে!"

উমাশঙ্কর বললেন, "একজন কমবয়সী স্কুল ফাইনাল ফেলকরা মেয়ে, একজন গৃহবধূ গ্র্যাজুয়েট আর কাশীনাথ—তিনজন রিডার রেখেছি, যাতে সমাজের সর্বস্তর থেকে মতামতটা পাই। এদের কিন্তু খুব ইচ্ছে তোমার নাটাশা বেঁচে থাকুক, বিয়ে করুক ওই শ্রমিক নেতা উদ্ধার হালদারকে। তুমি ভালো করেছ, সংগ্রামী নেতাকে নিয়ে এসে—অরবিন্দ পুরস্কার কমিটিতে তোমার নাম উঠল, কিন্তু কিছু করা গেল না। পার্টির লোকদের ধারণা, তুমি বড়লোকের লেখক। বড়কে আরও বড় করতে কেউ চায় না এই ইন্ডিয়ায়," দুঃখ করলেন উমাশঙ্কর।

তারপর বললেন, "কাশীনাথকে পাঠাচ্ছি তোমার কাছে। খুব ইচ্ছে তোমার সঙ্গে কাজ করে।"

তারপর নিখিলেশ শুনলেন কাশীনাথের সব কথা। ছোট এক কোম্পানিতে কাজ করত কাশীনাথ এবং সেই সঙ্গে চালিয়ে যেত গল্প পড়ার নেশা। কাশীনাথের কোম্পানিতে তালা ঝুলছে বেশ কয়েকমাস ধরে। কোম্পানি খুলবে-খুলবে এই প্রত্যাশায় কিছুদিন কেটে গিয়েছে। তারপর সন্দেহ হয়েছে কোম্পানি আদৌ না খুলতে পারে, কারণ মালিক কলকাতায় লালবাতি জ্বালিয়ে জয়পুরের কাছে অন্য নামে কোম্পানি চালু করছে। ক্লোজার হয়ে গিয়েছে কাশীনাথের কোম্পানিতে। এইসব কোম্পানির ব্যাপার উমাশঙ্কর কিছুই বোঝেন না। তিনি কিছু কপি করার কাজ দিয়েছেন কাশীনাথকে। সেই সঙ্গে বলেছেন, রমাপতি কর্মকারের মতন গল্প সাপ্লাই করো, রোজগার হোক।

কাশীনাথ গোটা কয়েক প্রাইভেট টিউশনি পেয়েছে। কিন্তু সব ভোরের দিকে। তারপর হাতগুটিয়ে বসে থাকা সারাদিন। তাছাড়া টিউশনি মোটেই ভালো লাগে না কাশীনাথের। তার থেকে অনেক ভালো লাগে এই গল্পবেচার পেশা। কাশীনাথ নিজে বিভিন্ন জায়গায় টো টো কোম্পানি করে গল্প জোগাড় করে। সেই সব গল্প উমাশঙ্করের নিপুণহাতে কেমন প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে তা দেখে কাশীনাথ বিস্মিত হয়।

পেটের দায়ে এই কাজের জন্যে কাশীনাথ পয়সা নিচ্ছে, কিন্তু যদি কখনও অন্নের অন্য ব্যবস্থা হয় তখন কাশীনাথ বিনামূল্যেই এই কাজ করবে।

উমাশঙ্কর নিজেই একবার কাশীনাথকে বললেন, "লেখকরা তো শূন্য থেকে গল্প আনেন না। এঁরা হলেন জুয়েলার—অনেক যত্নে সংগ্রহ করা মণিমুক্তো সোনার গহনায় বসিয়ে এঁরা অভিনব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেন।" কাশীনাথ মুক্তো সংগ্রাহক—সংসারের ধুলো ঘাঁটতে-ঘাঁটতে এক আধটা মানিক খুঁজে পান, ছুটে যান উমাশঙ্করদের কাছে।

অবশেষে কাশীনাথ এসেছে নিখিলেশের কাছে। উমাশঙ্কর এখন সব কাঁচাগল্প নিতে পারেন না কাশীনাথের কাছে। পাঁচ লক্ষ টাকার তিনি ভাস্কর পুরস্কার পাওয়ার পর থেকে দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছে উমাশংকরের। সারাক্ষণ সেক্সের গল্প লেখাটা মানায় না যাঁরা ওই পর্যায়ে উঠে গিয়েছেন। এখন জীবন দর্শন, জাতীয় সংহতি, বিশ্বমানবতা ইত্যাদি বিষয়ের দিকে ঝোঁক দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এসব বিষয়ে কলকাতার গল্প সাপ্লায়াররা কিছুই সরবরাহ করতে পারে না।

কাশীনাথ বোকার মতন উমাশংকরকে বলেছে, "তা হলে আপনি ফুটবল, ক্রিকেট অথবা হিন্দি গানের ওপর নভেল লিখুন—ওরা ইন্ডিয়াকে এক করে দিয়েছে সুরের বুল ডোজারে।"

উমাশংকর চুপ করে থেকেছেন, রবি ঠাকুর বেঁচে থাকলে নিশ্চয় তিনি ভাস্কর সম্মান পেতেন এবং তখন তিনি 'ময়নে পিয়ার কিয়া' বলে উপন্যাস নিশ্চয় লিখতেন না। কাশীনাথ অগত্যা বলেছে, "আপনি তা হলে স্যর মাদার তেরচার ওপর গপ্পো লিখুন।" উমাশঙ্কর সংশোধন করে দিয়েছেন, "তেরচা নয়, তেরেজা। শোনো কাশীনাথ, ওই গপ্পো সায়েব লেখক ছাড়া

কেউ ঠিকমতন ম্যানেজ করতে পারবে না। জানা খবরে বোঝাই থাকলে উপন্যাস কখনও উপন্যাস হয় না, কাশীনাথ।"

স্বয়ং উমাশঙ্করদা নিজেই যখন পাঠিয়েছেন তখন কাশীনাথের কাছ থেকে গল্প সংগ্রহ করার মধ্যে দোষ নেই। কাশীনাথ জিজ্ঞেস করেছে, "আপনি স্যর, শুধু গল্পের গাঁট চান, না ডায়ালগও চান। উমাশঙ্করবাবু আজকাল ঝকঝকে ডায়ালগও কেনেন কাশীনাথের কাছ থেকে। গল্পও অনেক বানাতে পারেন উমাশঙ্কর, কিন্তু দ্বন্দ্বের ফাঁস বা গাঁটটা অনেক সময় মাথায় আসে না।"

কাশীনাথের দেওয়া গল্প থেকে দুটো ছোট বই লিখেছেন নিখিলেশ। একটা লোক জমি কেনার লোভে বউকে বেচে দিল। একমাত্র ইন্ডিয়াতেই এই ধরনের কাণ্ড এখনও সম্ভব—প্রশংসা পেয়েছেন নিখিলেশ।

কাশীনাথ পরামর্শ দিয়েছে, "আপনি কিছু সেক্সের গল্প লিখুন, স্যর। লেখক প্রতুল গাঙ্গুলি টপাটপ সেক্সের গল্প তুলে নিচ্ছেন বিভিন্ন সাপ্লায়ারের কাছ থেকে। প্রতুল গাঙ্গুলির এক বন্ধু আছেন মার্কেট রিসার্চে কাজ করেন। তিনি স্যর প্রাইভেট সার্ভে করে দেখিয়ে দিয়েছেন। মানুষ গল্পের মধ্যে একটু সেক্স প্রত্যাশা করে। এমনকি সংরক্ষণশীল গৃহবধূরাও। প্রতুল গাঙ্গুলির বই স্যর একের পর এক হিট করছে।"

নিখিলেশ উৎসাহ দেখাননি। সেক্স নিয়ে তিনি শুচিবায়ুগ্রস্ত নন, কিন্তু সেক্স ছাড়া গল্প পড়ার যোগ্য হবে না তা বিশ্বাস করেন না তিনি। কাশীনাথকে বলেছেন, "সেক্স-সর্বস্ব গল্পে আমার আগ্রহ নেই কাশীনাথ। ওসব তুমি অন্য কাউকে বেচতে পারো।"

কাশীনাথের সেবার টাকার অভাব ছিল। একদিন সে নিখিলেশকে বলল, "একটা ভালো গল্প স্যর খোঁজ পেয়েছি। আপনাকে ছাড়া এ গল্প কাউকে দেওয়া যায় না। অন্য লোক এই গল্পের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে, খুব ডেলিকেটভাবে হ্যান্ডেল করা প্রয়োজন।"

ব্যস্ত ছিলেন নিখিলেশ সেদিন। একটা গল্পের শেষ পর্যায়ে এসে প্রধান চরিত্র নিয়ে হাঁসফাঁস করছেন। নিখিলেশের আর একটা দুর্বলতা, একাধিক গল্প নিয়ে একই সময়ে চিন্তা করতে পারেন না। তাই নিখিলেশ তখন কিছু টাকা তুলে দিয়েছিলেন কাশীনাথের হাতে। পরের সপ্তাহে দেবার কথা

ছিল কাশীনাথের, কিন্তু সেই যে কাশীনাথ উধাও হলো আর দেখা নেই।

নিখিলেশ দু'খানা পোস্টকার্ড ছেড়েছেন। কাশীনাথের গল্প সবসময় পছন্দ না-হলেও ওর সঙ্গে গল্প করে আনন্দ পাওয়া যায়। সমাজের যেসব জায়গায় নিখিলেশের যাওয়ার সুযোগ হয় না সেসব জায়গায় মানুষ কী ভাবছে কী প্রত্যাশা করছে তার খোঁজখবর পেয়ে যান নিখিলেশ। কাশীনাথকে আগেই বলেছিলেন, "তুমি যেখানে যেরকম গপ্পো পাবে বলে যাবে।" গল্প পছন্দ না হলেও নিখিলেশ কিছু টাকা দিয়েছেন কাশীনাথকে। বলেছেন, "এটা তুমি অন্য কোথাও বেচে দাও কাশীনাথ, আমি এটা ঠিক সামলাতে পারব না।" কাশীনাথ স্বীকার করেছে, "আপনি খুব উদার, স্যর। প্রতুল গাঙ্গুলি গল্প হোল্ড করে, টাকা দিয়ে গল্প কিনে না-লিখলেও গল্প ছাড়বে না। এটা ঠিক? আপনি বলুন। অনেক ক্যারেকটার, স্যর, নিজেকে দেখবার জন্যই গল্পটা সাপ্লাই করে। আর আমারও একটু হাতযশ হয়, স্যর। অন্য অথররা যখন শোনে অমুক গল্পটা আমিই সাপ্লাই করেছি তখন বাজারে একটু খাতির হয়।"

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করেছেন, "কাশীনাথ, এখন কলেজে ছেলেমেয়েরা তুই-তোকারি করছে? আমাদের সময় তো ভাবা যেত না।"

"আপনাদের সময় আর নেই, স্যর। এখন স্বামী-স্ত্রী সব তুই-তোকারি।"

"আমাদের সময় ছোটলোকরা বস্তিতে ওই রকম করত।"

"ছোটলোক আর বড়লোকের এখন অনেক ব্যাপারে তফাত নেই স্যর। আপনি গল্পে লিখে দেবেন।"

সেই কাশীনাথ অনেকদিন উধাও থাকার পর আজ নিজেই হাজির হয়েছে। নিখিলেশ পড়ার ঘরেই ওকে ডাকলেন।

পায়ের ধুলো নিল কাশীনাথ। এইটাই ওর স্বভাব। উমাশঙ্কর এই প্রণাম পেলে খুব খুশি হতেন, প্রাণভরে আশীর্বাদও করতেন। নিখিলেশ এমন পছন্দ করেন না, কিন্তু কেউ হঠাৎ পায়ের ধুলো নেবার জন্যে বসে পড়লে কী করা যায়?

টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো মন্তব্যই করেননি নিখিলেশ। কিন্তু কাশীনাথ নিজেই ব্যাপারটা তুলল। অনেকগুলো টাকা

আপনার কাছে নিয়ে রেখেছি, স্যর। দিয়ে দেব। প্রণব মিত্তিরের কাছে কিছু টাকা পাওনা। ওঁর লাস্ট উপন্যাসটার মেটিরিয়াল আমিই সাপ্লাই করেছিলাম। হঠাৎ মারা গেলেন। লেখকের স্ত্রীকে গিয়ে তো বলা যায় না, এই টাকাটা উনি দেননি। বললেও হয়তো বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমার কাছে প্রমাণ আছে। প্রণব মিত্তির নিজে আমাকে পোস্টকার্ড ছেড়েছিলেন, কাশীনাথ তোমার গল্পটা ব্যবহার করছি 'ক্রন্দন' পত্রিকার শারদসংখ্যায়, শুধু শেষটা ট্রাজেডি করে দিচ্ছি, ওরা কমেডি পছন্দ করে না, দাম একটু কম দেয়। তুমি গপ্পোটা যেন আর কাউকে দিয়ে বোসো না। ইতি প্রণব মিত্র।"

"তা স্যর, কাশীনাথ কুণ্ডু ছোটলোক নয়—একগল্প কখনও দু'জনকে বিক্রি করে না। ওই স্বভাব ছিল রমাপতি কর্মকারের। আমি দাম পাই না পাই, লেখকদের ঠকাইনি। লেখক টিকে না-থাকলে গল্প সাপ্লায়ার যে টিকে থাকবে না এইটুকু বুঝবার মতন বুদ্ধি এই মগজে আছে, স্যর।"

কাশীনাথ কোনো গল্প বেচতে এসেছে আন্দাজ করছিলেন নিখিলেশ।

কিন্তু সে এবার অবাক করে দিল। "আমি গল্প সাপ্লাইয়ের কাজ ছেড়ে দিয়েছি, স্যর।"

এখন স্বল্পসঞ্চয়ে ঢুকেছে কাশীনাথ। পোস্টাপিসের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে কাশীনাথ—সেভিংস সার্টিফিকেট, ইন্দিরাপত্র, কিষাণপত্র এই সব বিক্রি করে। সেইসঙ্গে ইউনিট ট্রাস্ট ইত্যাদি। বাঙালিরা এখন আর উড়নচণ্ডী হচ্ছে না স্যর, সুদ খাবার সুখ পেতে চাইছে সমস্ত মধ্যবিত্ত। ফলে কাজ মন্দ হচ্ছে না, স্যর।"

তবু কাশীনাথ এসেছে নিখিলেশের কাছে। "একজন আপনাকে খুব দেখতে চায়। আপনার লেখা পড়ে পাগল!"

"নিয়ে এসো একদিন। এই চাপটা কমে গেলে।"

যে আসতে চায় তার নাম কুমুদিনী। এবং সে এখানে আসতে চায় না। "বাড়ির বাইরে বড় একটা বেরোয় না, কুমুদিনী।"

কুমুদিনীর কাছে গল্প আছে, জানায় কাশীনাথ। "কিন্তু একটা পয়সা নেবে না। কুমুদিনী বলেছে এমন কাউকে গল্প দিতে চায় যাকে বিনামূল্যে দেওয়া যায়।"

কৌতূহল বোধ করেন নিখিলেশ। মেয়েটি কে? কী করে? এসব জানতে চাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কাশীনাথ এসব বিষয়ে কিছুই জানে না।

“কী করে বলতে পারব না। তবে ঐ ইন্দিরাপত্র, কিষাণপত্র, রহতপত্র এসব কেনে। ওই থেকেই তো আলাপ!” আগে পোস্টাপিসে এসেছেন কুমুদিনী, ওকে পাকড়াও করেছে কাশীনাথ—ওর সঙ্গে কেনাবেচা হয়েছে। এখন কুমুদিনী আর পোস্টাপিসে আসে না, কাশীনাথ নিজেই বাড়িতে যায়। সার্ভিস না দিলে খরিদ্দার পাবে না আজকাল। সঞ্চয়পত্রর মেয়াদ শেষ হয়েছিল। কাশীনাথ নিজেই সেসব নতুন করে বিনিয়োগ করে

“ভীষণ ভালো লোক, স্যর। আমার কাছ থেকে একটা পয়সা কমিশন নেয় না। ভাগ দিতে গিয়েছিলাম, বলল, তুমি রাখো। ওই পয়সা নিয়ে আমি বড়লোক হব না।”

কাশীনাথ বলল, “সেভিংস লাইন অনেক ভালো। পাঁচটা ভালো মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ফুটবল প্লেয়ার পাঁচু পাইন, গাইয়ে ঋতেন ভরদ্বাজ, শিল্পী জগদা পালধি এঁরা সবাই আমার কাস্টমার।”

কাশীনাথ যে একটা লাইন পেয়েছে তাতে খুব খুশি নিখিলেশ। কাশীনাথ বলল, “এ লাইনে সবচেয়ে আনন্দ যাদের সঙ্গে দেখা হয় তারা সংসার খরচা করেও দু'টো পয়সা জমাবার কথা ভাবছে।”

এবারে কাশীনাথ যে-টাকাটা নিয়েছিল তার কিছুটা ফেরত দিয়ে আবার প্রণাম করল নিখিলেশকে। “ওই টাকা রেখে দাও, কাশীনাথ। কখন একটা গল্প পেয়ে যাবে পোস্টাপিসের সামনে।”

“এ গল্পের জন্যে পয়সা নিলে মহাপাপ হবে আমার। কুমুদিনী বলেছে, আপনার পায়ের ধুলো এক-বার ওখানে ফেলাতে পারলে আরও অনেক কাণ্ড জোগাড় করে দেবে। সেভিংস লাইনে পয়সা অনেক। আপনি বাণ্টি ব্যানার্জির নাম শুনেছেন? এই স্বল্পসঞ্চয় থেকে তিনখানা মোটরগাড়ির মালিক হয়েছেন। আপনি আশীর্বাদ করলে আমারও হবে। শুধু অবস্থাপন্ন লোকদের সঙ্গে একটু ভাব-ভালোবাসা থাকা প্রয়োজন।”

নিখিলেশ কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। যে-কোনো মহিলার বাড়িতে হুট করে বললেই যাওয়া যায় না।

"না, স্যর। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই নিয়ে যাব। হুট করে কুমুদিনী দেবীর বাড়ি যাওয়া যায় না। কিন্তু আপনি না গেলে আমার মুখ থাকে না।" কাশীনাথ আরও বলল, "একদিন ওঁর বাড়িতে কিষাণপত্র দিতে গিয়ে দেখি আঙুলে আপনার ছদ্মনামে লেখা বই ভুবন মাঝির 'ঘরে ঘরে মোর দেশ আছে' পড়ছেন। আমি লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, ওটা নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায়েরই ছদ্মনাম, আর তাঁকে আমি চিনি। প্রথমে বিশ্বাসই করতে চান না। তখন আপনার লেখা পোস্টকার্ড দেখালাম। তখন থেকেই ধরেছেন।"

নিখিলেশের জন্যে আরও বিস্ময়। পরের দিন কাশীনাথ আবার হাজির। ছোট্ট সুন্দর খামে ছোট্ট চিঠি : "আপনাকে দেখার সৌভাগ্য কি আমার হবে না? ইতি কুমকুম।"

এই নামের ব্যাপারটাই প্রথম সাক্ষাতের সময় তুলেছিলেন নিখিলেশ। আর সে স্বীকার করেছিল, "আদিতে যে কুমুদিনী ছিল সে-ই কুমকুম হয়েছে।" কুমকুম বলেছিল, "এই রকমই হয় আমাদের জীবনে, সময়ের সঙ্গে তাল রাখার জন্যে নিজেকে বার বার পাল্টাতে হয় নিখিলেশবাবু।"

কুমুদিনী বলেছিল, "আমি কুমুদিনী বললে একটা সেকেলে বেশি বয়সের মেয়ের ছবি ভেসে ওঠে, আর সোমেশ্বরবাবু চান মডার্ন আপটুডেট ফিটফাট সঙ্গিনী। কুমুদিনী তো নিজেকে জলে ফেলে দিতে পারে না, তাই সে একটু অদলবদল করে কুমকুম হয়ে ওঠে। সোমেশ্বরবাবুর তো নামটা দারুণ পছন্দ, কিন্তু আমি জানি আইডিয়াটা পেয়েছি আপনার বই থেকে। মনে আছে আপনার নায়ক-নায়িকা মাধব ও মৃণ্ময়ী--হঠাৎ ধারণা হলো নাম দুটো বড্ড সেকেলে, আধুনিক হবার খুব ইচ্ছে, কিন্তু পারছে না। তখন ওরা ঠিক এক খোঁচায় হয়ে গেল মৃণ্ময় ও মাধবী, চমৎকার আধুনিক নাম।"

কুমুদিনী স্বীকার করেছে, সরকারি-কাগজপত্রে পুরনো নামটা থেকে গিয়েছে, ইচ্ছে করলেই নাকি নিজের নাম পাল্টানো যায় না, আদালতের আশীর্বাদ প্রয়োজন হয়।

সোমেশ্বর মুখার্জি, কুমু এইসব নামে অস্বস্তিবোধ করছেন নিখিলেশ। ওঁদের সম্পর্কটা কী হতে পারে তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না নিখিলেশের। কুমকুমের মধ্যে কিন্তু অস্বস্তি নেই। নিখিলেশকে সে যত্ন করে বসিয়েছে।

ওই কাশীনাথকে বিদায় করে দিয়েছে এবং নিখিলেশকে জানিয়ে দিয়েছে তাড়াহুড়ো নেই, আজ তার হাতে অঢেল সময়। সোমেশ্বরবাবুর বাড়িতে আজ লক্ষ্মীপুজো, ওখানেই থাকবেন।

নিখিলেশ তাকাচ্ছেন কুমকুমের দিকে। মেয়েদের বয়স আজকাল আর অনুমান করা যায় না। রূপচর্চা পারদর্শিনী হয়ে বঙ্গললনারা দীর্ঘদিন তাজা ফুলের মতন প্রস্ফুটিত হয়ে থাকছে। মধ্যবয়সের বিপজ্জনক সীমানার কাছে দাঁড়িয়ে কিছু-কিছু সুন্দরী যৌবনবসন্তে ঝলমল করে। কুমকুম অবাক করে দিচ্ছে নিখিলেশকে, পথে কোথাও দেখা হলে, বাংলার বধূদের হৃদয়ে হিংসার উদ্রেক করবে যে সে নিজেই অকপটে তার প্রকৃত পরিচয় স্বীকার করছে লেখক নিখিলেশের কাছে।

কুমকুম বলল, "আমার এক বান্ধবী ছিল, আপনার মস্ত ভক্ত। সেই শুনিয়েছিল, অনেক জিনিস দেশ থেকে তুলতে না পেরে স্রেফ তার নাম পাল্টে দেওয়া হলো। এখন এদেশে আর 'দুর্ভিক্ষ' হয় না, কিন্তু খরায় দেশ উজাড় হয়। 'কলেরা'র কথা আর কাগজে বেরোয় না, কিন্তু 'আন্ত্রিক' রোগে শত-শত মানুষ মারা যায়।" এর পর কুমকুম স্বীকার করেছিল, বেশ্যা, রক্ষিতা এসব কথাও কেউ ভুলেও ব্যবহার করে না—এখন সঙ্গিনী, বান্ধবী এই সব কথা ব্যবহার করে লোকে স্বস্তি পায়।

চায়ের ব্যবস্থা করল কুমকুম। দেখাল তার নিখিলেশ-সংগ্রহ, কিন্তু স্বাক্ষর করতে বলল না, "আপনার সই নিজের কাছে রাখার মতন যোগ্যতা আমার নেই।" এরপর হঠাৎ কুমকুম জিজ্ঞেস করল, "আপনি কী ভাবছেন?"

নিখিলেশ হঠাৎ বললেন, "কোথায় যেন দেখেছি তোমাকে!" কিন্তু স্মরণে আসছে না।

কুমকুম অস্বীকার করল না। "বলব না ভাবছিলাম, কিন্তু যখন কথা তুললেন আপনি..."

আরও কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন নিখিলেশ। কুমকুম বলে উঠল, "মাটিতে নয়, আকাশে, মেঘের অনেক ওপরে। আপনি যাচ্ছিলেন দিল্লি। আমিও যাচ্ছিলাম দিল্লি। সোমেশ্বরবাবুর মাথায় কখন যে অদ্ভুত সব মতলব আসে।"

নিখিলেশ সেবার দিল্লি গিয়েছিলেন সোমেশ্বরের অতিথি হয়ে। সোমেশ্বরের ব্যবসায়িক জীবন নিয়ে দু'জনে কিছু আলাপ হয়েছে। নিখিলেশ কৌতূহল প্রকাশ করেছেন সোমেশ্বরের প্রাত্যহিক জীবনে। সোমেশ্বরের জীবনে একটি দিন—এ ডে ইন দ্য লাইফ অফ এ বিজনেসম্যান—আঁকতে চান নিখিলেশ।

সোমেশ্বর বলছিলেন, ভোর চারটেতে ঘুম ভেঙে যায়। অথবা ঘুমকে ত্যাগ করেন সোমেশ্বর। তারপর পুরো একঘণ্টা বিজনেস সম্পর্কে চিন্তা এবং আবার একটু বিশ্রাম। ভোর ছ'টায় খবরের কাগজ চাই সোমেশ্বরের। সোমেশ্বরকে বলা হতো, সাড়ে-ছ'টার আগে কলকাতার কাগজওয়ালারা কাগজ দেয় না। ওসব কথায় বিশ্বাস করেন না সোমেশ্বর—হুকুম দিয়েছেন ছ'টাতেই কাগজ চাই! কাগজ আসছে।

সোমেশ্বর কখনও প্রথম পাতাটা পড়েন না, ওতে দিনটা খারাপভাবে শুরু হয়। সোমেশ্বর সোজা চলে যান শেয়ারমার্কেটের পাতায়—কলকাতা, বম্বে, দিল্লি, এমনকি পাটলিপুত্র স্টক এক্সচেঞ্জের খবরাখবর নেন সোমেশ্বর, তারপর খবর নেন কমোডিটির মার্কেটের—ডাল, তেল, সর্ষে, মশলা ইত্যাদির হোলসেল বাজারদর। তারপর খেলার পাতায় চোখ বুলিয়ে নেন, মোহনবাগানের খেলা থাকলে একটু খুঁটিয়ে পড়েন। এবার আসেন প্রথম পাতায়, ওইটাই শেষ আইটেম। এডিটোরিয়াল ভুলেও পড়েন না সোমেশ্বর, ওসব পড়ার ধৈর্য থাকলে সোমেশ্বর তো বি. এ. ফেল করতেন না।

এই ফেলদের সম্বন্ধে দুর্বলতা আছে সোমেশ্বরের। বি. এ ফেলদের প্রেফারেন্স দেন সোমেশ্বর—তাঁর অফিস বি. এ ফেলে বোঝাই, একমাত্র পুত্র অভিনব ছাড়া। আধডজন প্রফেসারের নিরন্তর তদারকির জোরে সে বি. কম. পাশ করেছে, তারপর অবশ্য পড়ায় উৎসাহ দেখায়নি। সোমেশ্বরও চাননি—বিজনেস ডিগ্রি নিয়ে তুমি কী করবে? বি. এ, এম. এ, পি-এইচ. ডি-রা তোমার দাসত্ব করবার জন্যে ছটফট করবে, ওদের কাগজপত্তরগুলো তোমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবে।

সোমেশ্বর তাঁর স্ত্রী বিভাবতীর সঙ্গেও নিখিলেশের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। জনায়ের ব্যানার্জি ফ্যামিলির মেয়ে, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমার

মতন চেহারা। "মিষ্টি মনোহরা, আর প্রাণহরা সুন্দরী একই জায়গা থেকে এসেছে ভাবা যায় না, নিখিলেশবাবু।"

"কাজ, কাজ আর কাজ, নিখিলেশবাবু। কাজে ভয় থাকলে বিজনেস অচল এ যুগে", বলেছেন সোমেশ্বর। খুব কাজের চাপ থাকলে আমি চারটে নাগাদ ঘণ্টাখানেকের জন্যে আপিস থেকে বেরিয়ে পড়ি হাঁটবার জন্যে, বিশ্রাম নেবার জন্যে, টেলিফোন থেকে ছুটি নেবার জন্যে। ব্যস্ত মানুষকে অভিশাপ দেবার জন্যে ঈশ্বর এই টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন।"

এই ছুটি নিয়ে চারটের সময় আপিস থেকে বেরিয়ে পড়ার ব্যাপারে কুমকুম যথাসময়ে খুব হেসেছিল। "বিকেলবেলা তো দয়া হয় ওঁর। ব্যস্ত মানুষরা কখন একটু সময় করে পায়ের ধুলো দেবেন সে তো আমরা ঠিক করতে পারি না। আমরা তৈরি হয়ে থাকি—দুপুরে খাওয়ার পরে যতক্ষণ খুশি ঘুমোবার উপায় থাকে না। সাজগোজে সময় লেগে যায়। ভীষণ খুঁতখুঁতে মানুষ সোমেশ্বরবাবু—ললনা পত্রিকা থেকে দাগ দিয়ে দেন, আজ এই রকম শাড়ি পরবে, এই রকম জামা পরবে। উনি তো বলে খালাস। ললনা পত্রিকার ডিজাইন যে বাজারে আসতে সময় লাগে তা তাঁর খেয়াল থাকে না। এই যে শাড়ি এবং চোলি দেখছেন, এটা কেনা হয়েছে, 'বুলবুলি' বলে একটা স্পেশাল দোকান থেকে। ওরা ললনা পত্রিকার ডিজাইনগুলো রাখে, কিন্তু বড্ড বেশি দাম।"

সোমেশ্বরবাবুর মাথায় ভূত আছে। "সব সময় বুলবুলিতে একই ডিজাইনের দুটো সেটের অর্ডার দেন, একটা আমার জন্যে, আর একটা বাড়ি চলে যায় গিন্নির কাছে। ওঁকেও বলে দেন, আজ সন্ধেবেলায় এই রকম পরবে।"

"তোমার এখান থেকে বেরিয়ে তোমার জামাগুলো বাড়িতে দেখলেও আনন্দ হয় কুমকুম—তোমার অভাবটা কোনো রকমে পূরণ হয়ে যায়", বলেন সোমেশ্বর।

কুমকুমকে প্রথম দেখার কথা নিখিলেশের মনে পড়ছে। সোমেশ্বরের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে একই ফ্লাইটে দিল্লি যাত্রার প্রস্তাব দিয়েছিলেন নিখিলেশকে।

সেই প্লেন যাত্রার কথা মনে পড়ছে নিখিলেশেব। প্লেনের চারটে সিটের

ডানদিকে বসেছিলেন বিভাবতী, তাঁর বাঁদিকে সোমেশ্বর, তার বাঁদিকের সিটটা সহযাত্রী নিখিলেশের জন্য জোগাড় করা যায়নি, তার পরের সিটটাই নিখিলেশের। ওই সিটের যাত্রী একটু পরেই উঠে এসেছিলেন। নিখিলেশের মনে পড়ছে, সেই মহিলা যাত্রীটিই কুমকুম।

"আমি আদৌ অপ্রত্যাশিত ছিলাম না নিখিলেশবাবু। আমার টিকিট সিটনম্বর সব ঠিক করেছিলেন সোমেশ্বরবাবু। অদ্ভুত সব খেয়াল। আমি ভাবতেই পারিনি সোমেশ্বরবাবু তাঁর স্ত্রীকে ওই ফ্লাইটে নিয়ে যাচ্ছেন।" মিসেস মুখার্জি যখন টয়লেটে গেলেন তখন উনি ফিসফিস করে বললেন, অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল, তোমরা দু'জনে আমার দু'পাশে বসে থাকবে, আমি দুজনের স্পর্শ পাব। ভাবতে পারেন!"

নিখিলেশকে কুমকুম জিজ্ঞেস করেছে, "আরও কিছু আপনার নজরে পড়েছিল?"

ব্যাপারটা নিখিলেশের নজর এড়ায়নি। কুমকুম ও বিভাবতী একই পাড়ের পিংক শাড়ি পরেছিলেন। এই রকম মিল হঠাৎ হয়ে যেতে পারে।

"হঠাৎ নয়, নিখিলেশবাবু, সোমেশ্বরবাবু, নিজে সিলেক্ট করে দিয়েছিলেন ওই শাড়ি। আমি পরে জিজ্ঞেস করে জেনেছি বিভাবতীকেও উনি ওই শাড়ি পরতে রিকোয়েস্ট করেছিলেন। কী অদ্ভুত সব খেয়াল। আপনিও যে সোমেশ্বরবাবুর অতিথি তা পরে বুঝেছিলাম। আমার কী অবস্থা ভাবুন। এমন অবস্থায় জীবনে পড়িনি। ফ্লাইটে সোমেশ্বরবাবু মাঝে-মাঝে আমার দেহ স্পর্শ করছেন, আমি একেবারে অসহায়। যা ভয় করছিল। বিভাবতী দেবী যদি বুঝে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত যা ভয় পাচ্ছিলাম তাই। সোমেশ্বরবাবু যখন টয়লেটে গেলেন তখন বিভাবতী আমার দিকে কেমনভাবে তাকালেন! জিজ্ঞেস করলেন, আমি ওঁর স্বামীকে চিনি কিনা।"

"আমরা খারাপ লাইনে আছি, কিন্তু আমাদের প্রফেশনাল কতকগুলো রীতি আছে। আমি আকাশ থেকে পড়লাম, বুঝিয়ে দিলাম, ওঁকে চিনি না।"

নিখিলেশের মনে পড়ছে কুমকুমকে দিল্লির একই হোটেলে দেখেন তিনি। এখন শুনলেন, সবই আগাম ব্যবস্থা করা ছিল। কুমুদিনী নামে বুকিং ছিল কুমকুমের, হোটেলের ন'তলায়, আর সোমেশ্বরবাবু ছিলেন ছ'তলায়।

সেবার নিজের ঘরেই ডিনারের আয়োজন করেছিলেন সোমেশ্বর কিন্তু

ওঁর ঘরে গিয়ে নিখিলেশ দেখেন সোমেশ্বর নেই, ওঁর আর একজন শ্যালক এসেছেন। বিভাবতী বললেন, "কাজপাগলা মানুষ, আমার স্বামী। আপনাদের নেমন্তন্ন করেও থাকতে পারলেন না, হঠাৎ কেন যে বেরিয়ে গেলেন।"

"কাজের নেশা বাঙালিদের পক্ষে ভালো", বলেছিলেন নিখিলেশ।

"কাজ নিয়ে থাকে বলে কিছু বলতে পারি না। কাজ না থালে লোকেদের যেসব নেশা ধরে, শুনলে মাথাগরম হয়ে যায়।" বিভাবতী বলে দিয়েছিলেন।

জোর হাসিতে গড়িয়ে পড়লেন কুমকুম। "সেদিন আপনারা যে বোকা হলেন তা বুঝতে পারলেন না।"

আসলে হোটেলে ঢুকেই খুব বিরক্ত হয়েছিল কুমকুম। মিসেস সোমেশ্বরও যে একই হোটেলে বসবাস করবেন তা ভাবা যায় না। বাধ্য হয়েই নিজের ঘর থেকে কুমকুম ফোন করেছিল—ব্যাড লোক, ফোন ধরলেন বিভাবতী। কুমুদিনী তখন রাগে ফুলছে। একটু পরে আবার ফোন। এবার সোমেশ্বর ধরেছেন। কুমকুম জানিয়ে দিয়েছে, সে অস্বস্তিবোধ করছে। অন্য হোটেলে চলে যেতে চায় সে।

তার পরেই সোমেশ্বর চলে এসেছেন আমার ঘরে। আমি সব খবর পেয়েছি কারা ডিনারে অপেক্ষা করছে। কিন্তু অদ্ভুত লোক। কিছুতেই ডিনারে গেলেন না, দরজা ভিতর থেকে লক করে আমার সঙ্গে খেলেন, দু'ঘণ্টা সময় কাটালেন, সাধ-ইচ্ছে পূরণ করলেন। বললেন, এই যে ডেঞ্জারাসভাবে বেঁচে থাকা এতে আমি উত্তেজনাবোধ করি, কুমু। আমাকে হাজার টাকা দিলেন পরের দিন কেনাকাটা করবার জন্যে। বললেন, তুমি ফিরে এসো দুপুর চারটের মধ্যে, তারপর আমি বিভাকে পাঠাব, ওই সময় আসব তোমার ঘরে।"

"ফেরার সময় আবার ওই মতলব আঁটছিলেন, সোমেশ্বরবাবু। আমার খুব খারাপ লাগছিল, ওঁর স্ত্রীকে অত কাছ থেকে দেখলে যে কী ভীষণ কষ্ট অস্বস্তি হয়। সোমেশ্বরবাবু কিন্তু বুঝতে চান না। আমি শেষ পর্যন্ত অন্য ফ্লাইটে আগে ফিরে এলাম। বড়লোক পুরুষমানুষের কী যে খেয়াল, নিখিলেশবাবু, আমাদের দুঃখ যদি কেউ বুঝত!"

চুপ করে বসেছিলেন নিখিলেশ। কুমকুম জিজ্ঞেস করল, "আপনি কর্মবীর সোমেশ্বরকে নিয়ে বই লিখছেন?"

সোমেশ্বরকে নিয়ে নিখিলেশ বই লিখছেন না। ফিরে এসে দীর্ঘ এক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সোমেশ্বরের স্তুতি গাননি তিনি, বরং বলেছেন, বিজনেসে সোমেশ্বর যতটা এগিয়ে যেতে পারতেন ততটা অগ্রগতি সম্ভব না। তবে সোমেশ্বরের কৃতিত্ব তিনি নষ্ট হতে দেননি। পিতৃদেবের ব্যবসায় লালবাতি জ্বালাতে বাঙালিরা ইদানীং ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে সোমেশ্বর তার ব্যতিক্রম।

কুমকুম বলেছে, "বই লিখুন আপনি। তবে মানুষটাকে পুরো জেনে লিখুন। সব কথা না বললে সমাজের প্রতি অবিচার করা হয়।"

নিখিলেশ কী বলবেন। কুমকুম জানাচ্ছে, সোমেশ্বরের সব কথা সে বলবে। গোটা মানুষটাকে জানা প্রয়োজন নিখিলেশের। তারপর যদি পছন্দ হয় মানুষটাকে তা হলে লিখুন তাকে নিয়ে বই, কোনো আপত্তি করবেন না কুমুদিনী।

নিখিলেশ লক্ষ্য করলেন, কুমুদিনী খাবার দিচ্ছে তাঁকে। কিন্তু নিজে কিছু খাচ্ছে না। কারণ যা জানতে চেয়ে আরও অবাক হবার পালা। সোমেশ্বরের জন্যই কুমুদিনী মাসে একদিন উপোস করে। জানাশোনা কোনো গণকঠাকুর কুমুদিনীকে বলেছেন, সোমেশ্বরের গ্রহনক্ষত্ররা কিছু গোলমাল বাধাতে পারে। অনেক ভেবেছে কুমুদিনী। "আমি তো আর বিভাবতীকে বলতে পারি না, বরের জন্যে উপোস করুন। শেষ পর্যন্ত নিজেই করছি, হাজার হোক একটা সম্পর্ক তো রয়েছে।"

সেই থেকে নিখেলেশের সঙ্গে কুমুদিনীর আলাপ। খরিদ্দারের মঙ্গলের জন্য ইন্ডিয়ান কলগার্ল উপবাস করছে, এই বিষয়ে উপন্যাস লিখলে পশ্চিমের লোকের কী প্রতিক্রিয়া হবে তা ভেবে নিখিলেশ শিহরন অনুভব করেন। অদ্ভুত দেশ এই ভারতবর্ষ, বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও এখানে এমন সব ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই ঘটছে যা বিশ্বের কল্পনার বাইরে। নিখিলেশের উচিত ছিল ইংরিজিতে কথাসাহিত্য রচনা করা—ভারতবর্ষের

বৈচিত্র্যের প্রতি বিশ্বমানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেত।

নিখিলেশকে সেদিন কুমুদিনী বলেছিল, আমার বন্ধু তটিনীকে নিয়ে আপনার কিছু লিখতে হবে। ওর খুব ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গে দেখা করার। একবার একটা চিঠিও লিখে ফেলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিঠি পাঠানো হয়নি।

তটিনীর স্বপ্ন ছিল নিখিলেশ একদিন আসবেন, নিজের হাতে পা ধুইয়ে দিয়ে অতিথিকে স্বাগত জানাবে তটিনী। সেই চিঠি কুমুদিনী পড়েছে। কিন্তু কোনো পরামর্শ দিতে পারেনি কুমুদিনী।

তটিনীর ধারণা ছিল চেনা-জানা কারও মাধ্যমে না গেলে বড়মানুষের নাগাল পাওয়া যায় না। সাধারণ মানুষের কত সুবিধে—তারা কেমন নির্ভাবনায় বলতে পারে অমুক তার চেনাজানা। তটিনীদের সে-উপায় নেই। চেনাজানা থাকলেও মুখবুজে থাকতে হয়, খারাপ মেয়ের কাছেও বিশ্বস্ততা প্রত্যাশা করে বসে থাকেন ধনীরা।

কুমুদিনী বলেছে, "এই যে আপনার বইগুলো দেখছেন, তার বেশিরভাগই তটিনীদি সংগ্রহ করেছিলেন। বইয়ের প্রথম পাতায় তটিনী দাসের স্বাক্ষর দেখতে পাবেন। থাকতেন আমার পাশের ফ্ল্যাটে। ছোট ফ্ল্যাট, কিন্তু এখানে হাঙ্গামা কম। ভদ্রপাড়ায় মিটমিট করে জ্বলে থাকার মধ্যে শান্তি অনেক, তটিনী বলল। বদনামী পাড়ায় হাজার হাঙ্গামা যা তটিনীর মতন মেয়ের সহ্য হওয়ার কথা নয়।"

তটিনী নিজেই একটা পরিচয় করে নিয়েছিলেন। বিমা কোম্পানির এজেন্ট। নিজের একটা বিশ্বাসযোগ্য পরিচয় না থাকলে এই সব ভদ্র পাড়ায় ভীষণ অসুবিধে হয়। কুমুদিনী নিজেও একটা পরিচয় করে নিয়েছে—ভাগ্যরেখাবিদ। একেবারেই বাজে কথা, ভাগ্যের কোনো রহস্যই তার জানা নেই, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মিশতে সুবিধে। ভাগ্যরেখাবিদ হবার জন্যে তো কোনো পরীক্ষা পাশের প্রয়োজন হয় না।

তটিনীর সমস্ত জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখুন নিখিলেশ, এই ইচ্ছা কুমুদিনীর। "আপনার লেখা পড়ত তটিনীদি, আর-স্বপ্ন দেখত একদিন আপনার উপন্যাসে সে একটা জায়গা পেয়েছে।"

কুমুদিনী একদিন অনেক সময় ধরে তটিনীর গল্প—যা সে তটিনীর নিজের মুখে শুনেছে তা বলবে নিখিলেশকে। কোন ঘটনাটা গল্প হয় আর কোনটা গল্প হয় না কুমুদিনী তা ভালো বোঝে না, কিন্তু তটিনী বুঝতেন। গল্পের বই পড়ার নিয়মিত অভ্যাস ছিল। বই-ই তটিনীর প্রকৃত সঙ্গী। মাঝে-মাঝে হোটেলে যেতে হতো তটিনীকে—ব্যাগে অবশ্যই থাকত বই। অদ্ভুত এক অভ্যাস তটিনীদির। অপরিচিত পরিবেশে অপরিচিত সান্নিধ্যে কিছুতেই ঘুম আসে না। সেই সময় তটিনী নিজের ব্যাগ থেকে বই বের করে খুলে বসতেন। বিশেষ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া ভুবন মাঝির ভ্রমণবৃত্তান্ত—যে-ভুবন মাঝি ঘরকে করেছে বাহির আর বাহির করেছে ঘর।

নিখিলেশ বিস্ময় অনুভব করেন। কত চিন্তার গভীরে না গিয়েই তিনি কত কথা বলেছেন পথভোলা উদাসীন ভুবন মাঝির মুখ দিয়ে। সে যখন পথে বেরোয় তখন ঘর তাকে ডাকে, আর যখন ঘরে ফেরে তখন পথ ইশারা দেয় বারবার, ভুবন তুমি ঘরে বসে করছ কী? এসো তুমি নীল আকাশের নীচে, এসো তেপান্তরের মাঠে। এই ভুবন মাঝি ঘরছাড়া কোনো ভাগ্যহীনা রমণীকে রাতের যন্ত্রণার মধ্যে ভরসা দিয়েছে, শান্তি দিয়েছে। শান্তি দিয়েছে ভাবতে ভীষণ ভালো লাগছে নিখিলেশের। ভুবন মাঝির পরের ভ্রমণকথা তিনি আরও মন দিয়ে লিখবেন, ভুবন মাঝির মধ্য দিয়ে মুক্তি চেয়ে নেবেন মানুষের। শান্তির সন্ধান করবে ভুবন মাঝি পৃথিবীর সব অভাগিনীর জন্যে।

কুমুদিনী বলছে, ভুবন মাঝি এক জায়গায় খাঁচার পাখির সঙ্গে বনের পাখির কথোপকথন সৃষ্টি করেছেন রাবীন্দ্রিক স্টাইলে। সেই সব কথা তটিনীদি পড়েছেন এবং চোখের জল ফেলেছেন। তটিনী বলেছেন, "কুমু পড়ে দেখো! আমার কিন্তু কেমন সন্দেহ হয়, খাঁচার পাখি আর বনের পাখি আলাদা নয়, একজনেই।"

"তাহলে খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে কেমন করে হয়, তটিনীদি?" কুমুদিনী সন্দেহ করেছে।

"হয়, হয়", তটিনী বলেছেন। "যে-পাখি খাঁচার সে বনে গিয়েও শান্তি পায় না, আর যে-পাখি বনের তার কোনো মোহ থাকে না বন সম্বন্ধে। আমার এক এক সময় মনে হয়, কুমু, বনে কোনো শান্তি নেই। খাঁচাই

ভালো পাখিদের জন্যে।”

“তুমি লেখো না চিঠি, ভুবন মাঝিকে?” কুমু বলেছে, তটিনীদি কিন্তু লিখেওছেন, তারপর সাহস কুলোয়নি। “আমি এক বারাঙ্গনা, বনের পাখির মতন বনে বিচরণ করি, যদিও আমারও একদিন খাঁচার সুরক্ষা ছিল, এই কথা তো ভুবন মাঝিকে লেখা যায় না।” ওঁকে লেখা যায় না কিন্তু বলা যায়, এই ছিল তাটিনীর মনোভাব।

“তারপর?” জিজ্ঞেস করলেন নিখিলেশ। এতো দায়িত্বের বোঝা কেউ তো কখনও তাঁর ওপর চাপাতে চায়নি। কিংবা হয়তো চেয়েছে। অনেকে তাদের বুকের ভার লাঘব করতে, কিন্তু নিখিলেশের কাছে তারা পৌঁছতে পারেনি।

নিখিলেশ, তুমি ওঠো, জাগো। সংসার-অরণ্যের দাহ ঘন অন্ধকারে তোমার পথকে আলোকিত করুক, তুমি মানুষকে জাগ্রত করার জন্য, আশায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যে লেখো—বলো যত পরাজয় ও ব্যর্থতার গ্লানিতে তুমি জর্জরিত হও তোমার জয় হবে। জয় হবে, জয় হবে, কারণ মানবের জন্যেই এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা তো প্রতি মানুষের ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়েই বিশ্বভুবনে প্রেরণ করেছেন।

সময় লাগবে। একটু সাহসও লাগবে। কিন্তু নিখিলেশ আর দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না। তটিনীর সব কথা শুনবেন নিখিলেশ এই কুমুদিনীর কাছে। তটিনীর একটা খাতা ছিল। মাঝে-মাঝে এই খাতার পাতায় তটিনী লিখে গিয়েছে নিজের কথা। প্রকাশের পথ না পেয়ে খাতার পাতাতেই নিজেকে অনাবৃত করেছে তটিনী।

সেই খাতাটা কুমুদিনী আর একদিন দিয়ে দেবে নিখিলেশকে। নিখিলেশ যদি কিছু সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে তটিনী বেঁচে উঠবে নিখিলেশের বইয়ের পাতায়। বেঁচে থাকার খুব ইচ্ছা ছিল তটিনীর, ইচ্ছা ছিল বিজয়িনী হয়ে আবার খাঁচায় ফিরে যাওয়ার। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। বনের পাখির যে কত বিপদ তা খাঁচার বাসিন্দাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

এরপর আরও কয়েকবার দেখা হয়েছে কুমুদিনীর সঙ্গে। কাশীনাথও

এসেছে নিখিলেশের সঙ্গে কথা বলতে।

"অদ্ভুত এক পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছ তুমি। কাশীনাথ, আমি উপকৃত হয়েছি। বিদেশ বিভুঁইয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি অকারণে, অথচ এই কলকাতা শহরেই রয়েছে অন্য এক ভুবন।"

কাশীনাথ জিজ্ঞেস করেছে, "ভুবন মাঝিকে সবসময় দূরে যেতে হবে কেন? ভুবন মাঝি বেরোতে পারে না কেবল কলকাতা দেখতে? বিভূতি মুখোপাধ্যায়ে মতন আপনিও নাম দিন—'দুয়ার হইতে অদূরে'। খুব ভালো নাম হলে একবার ব্যবহারে মন ভরে না পাঠকের, আবার নামটা দেখতে ইচ্ছে করে অন্য কোনো মলাটে।"

নিখিলেশ মনস্থির করে ফেলেছেন—কলকাতাতেই ভ্রমণ করবেন তিনি। নিজের ঘরেই অতিথি হয়ে কেমন লাগে তা নিবেদন করবেন পাঠকদের কাছে। বড় দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছে তাঁর—মানুষ যে লেখার ওপর এতোটা প্রত্যাশা করে তা অনেকদিন স্মরণে ছিল না—যদিও বিমল মিত্র সেই কতদিন আগে বলতেন, "আমিই ঈশ্বর—আমার চরিত্রদের ঈশ্বর। আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না, কিন্তু আমার দায়িত্ব অনেক।"

তটিনীর নিজের হাতে লেখা খাতাটা নিখিলেশ সংগ্রহ করে এনেছেন। ওর মধ্যে মস্ত এক সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে। নিখিলেশ খুব সাবধানে এগোচ্ছেন। "অবিশ্বাস্য এক চরিত্র, এই তটিনী, বুঝলে কাশীনাথ। এই পর্যায়ের মেয়েদের মধ্যে এমন সাহিত্যবোধ, সৌন্দর্যবোধ থাকতে পারে অকল্পনীয়। আর কি অসম্ভব নাটকীয়তা। তার কি বিচিত্র পরিণতি। আমি গল্পটা বুকের মধ্যে নেবার চেষ্টা করছিলাম। তারপর একদিন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে একবার উত্তরপাড়া ঘুরে আসব যেখানে তটিনীকে প্রতিমাসে হঠাৎ একবার দেখা যেত। স্টেশন থেকে নামার সময় হাতে থাকত একটা নাইলনের থলি—রিকশায় উঠে তটিনী বলত, ভদ্রকালী, ডি-ওয়ালডি।"

"ওখানে কি লোকে জানত না তটিনী কে?"

"সে মস্ত গল্প কাশীনাথ। আমি কিছুটা তটিনীর লেখা থেকে আন্দাজ করতে পেরেছি, কিছুটা আমাকে উত্তরপাড়ার গলিটা থেকে খুঁজে বের করতে হবে, ওখানে বোধহয় মাখলা বলে একটা জায়গাও আছে। আর

অনেক কিছু আমাকে ক্রমশ শুনতে হবে কুমকুমের কাছে। এখন যতটা পড়ছি, আর প্রতিবার নতুন এক জগতের ইঙ্গিত ফুটে উঠছে আমার চোখের সামনে। পৃথিবীর সব চরিত্র যদি এইভাবে নিজেকে লেখকের কাছে উপস্থিত করত তা হলে লেখকরা সৃষ্টির গভীরে চলে যেতে পারতেন।”

কুমকুমের কথায় আজ কাশীনাথের মুখে চিন্তার ছায়া দেখা দিল। দিদিমণি আজকাল নাকি তেমন সঞ্চয় সার্টিফিকেট কিনছেন না। কাশীনাথ বুঝিয়েছে, ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে অনেক ভেবে-ভেবে গভরমেন্ট কত রকম ব্যবস্থা করছে—কত রকমের পত্র—ইন্দিরাপত্র, কিষাণ-বিকাশপত্র, জাতীয় সঞ্চয়পত্র, জাতীয় জমাপ্রকল্প। মাসিক জমাপ্রকল্প—একবার জমা দিয়ে মাসের মাস বছরের পর বছর সুদ খান, অথচ আসলে হাত পড়বে না, বরং বোনাসসহ ফেরত পাবেন। পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের কথাও বলেছিল কাশীনাথ। সেবার খুব হেসেছিল কুমুদিনী—“আমাদের আবার প্রভিডেন্ট ফান্ড। তুমি লোক হাসিও না, কাশীনাথ।”

“চিরকাল তো কাজ করতে পারবেন না। পনেরো বছর পরে সুদে আসলে অনেক টাকা, যার ওপর ভরসা করে লোকে রিটায়ার করতে পারে।”

আরও হেসেছে কুমুদিনী। “সময় থাকতে থাকতে, শরীর থাকতে থাকতে যেতে চাই কাশীনাথ। আমাদের লাইনে কেউ রিটায়ারের কথা ভাবে না।”

কী যে হয়েছে কুমুদিনীর বুঝতে পারে না কাশীনাথ। কয়েকটা ইন্দিরাপত্র ম্যাচিওর করেছে। কাশীনাথ ওকে বলল, “এগুলো আবার খাটান, আবার ডবল করুন। ডবলের ডবল, তারও ডবল, ব্যাপারটা কী অসাধারণ ভেবে দেখুন।” কিন্তু কুমুদিনী কিছুই বললেন না, কাগজগুলো ভাঙিয়ে টাকাটা নিলেন। এলাইনে আগে গহনার রেওয়াজ ছিল—ভালো সময়ে গড়াও, খারাপ সময়ে ভাঙাও। কিন্তু সোনার গহনা তো সুদের বাচ্চা পাড়ে না, একটা হার তো পাঁচ বছর পরে দুটো হয়ে যায় না। এই দিদিমণিই একদিন বলেছেন, “সবাই আমাদের ঠকাবার জন্যে বসে আছে কাশীনাথ,

কেউ-কেউ নেয় শরীর, কেউ-কেড়ে নেয় টাকা। স্যাকরাও সবচেয়ে ঠকায় আমাদের—সোনায় পান মিশিয়ে দেয়।"

নিখিলেশের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে কুমকুমের। ব্যবস্থাটা কাশীনাথই করে দিয়েছে। তার নীরব প্রত্যাশা, নিখিলেশ বলবেন কুমুদিনীকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন হতে, সঞ্চয় করতে। নিখিলেশ বুঝতে পারেন কাশীনাথের সমস্যা। কেউ যদি আগামিকাল সম্বন্ধে মাথা না ঘামায় তাহলে আজ এজেন্টদের চলে কী করে?

নিখিলেশ ভেবেছিলেন তটিনীর ব্যাপারেই কথা বলবেন সারাক্ষণ। লেখায় ইঙ্গিত পেয়েছেন, তটিনী গান জানত। গীতবিতানের কথাগুলো কী সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছে তটিনী তার আত্মপরিচয়, দিনলিপিতে, এমন কি তার চিঠিতে। এই এক অভিনব পরিস্থিতি—তটিনী চিঠি লিখেছে একের পর এক। নিখিলেশকেও লিখেছে সে। কিন্তু সেসব চিঠি প্রেরককে পাঠানো হয়নি। কিন্তু পত্রালাপ চলেছে অবিরাম। তটিনী কোথাও কোথাও ধরে নিয়েছে উত্তর পেয়েছে সে—প্রত্যাশিত উত্তর। আবার কোথাও তটিনী কল্পনা করে নিয়েছে প্রাপক চিঠি পেয়েও উত্তর দিচ্ছেন না। মানুষ নিঃসঙ্গ হলে এমন হয়। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলবার শ্রেষ্ঠ পথ এই চিঠি।

কিন্তু আজ কুমুদিনীর ফ্ল্যাটে বসে নিখিলেশের মনে হলো সে বেশ চিন্তিত। কুমু কি অনেক রোগা হয়েছে?

কুমু অস্বীকার করল না। "শরীরটাই যাদের একমাত্র সম্পদ তাদের উপায় কী বলুন?" কুমুর কথা নোটবইয়ে লিখে রাখার মতন। কুমুর আরও অভিযোগ : "অনাহার এড়াবার জন্যেই আমাদের উপবাস, নিখিলেশবাবু। মেয়েদের তন্বী দেখবার জন্যে সোমেশ্বরবাবু ব্যাকুল, কিন্তু নিজেদের শরীর ক্রমশই ফুলছে।"

কুমু কিছু চেপে রাখল না। সোমেশ্বর ইদানীং যাতায়াত একটু কম করছেন। যখন আসেন তখন বলেন, "ভীষণ কাজ।" খুব ইচ্ছে করে কুমুকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে কোথাও ঘুরে আসেন। বউয়ের সম্বন্ধে বললেন, "ফ্রান্স হলে বউকে পাঠাতাম তোমার কাছে ট্রেনিং-এর জন্যে। অর্ধাঙ্গিনী যখন হেডমিসট্রেস হয়ে সারাক্ষণ শাসন করেন তখন শরীরে মনে কোনো সুখ থাকে না, কুমু।"

কুমুর ওখানে স্নান সেরে নিয়েছেন সোমেশ্বর। শরীরে ফরাসি পারফিউম স্প্রে করে দিয়েছে কুমু। নিজেই আঁচড়ে দিয়েছেন চুল। আজ সন্ধ্যায় কী খাবেন জানতে চেয়েছেন কুমু। সোমেশ্বর মদ স্পর্শ করেন না, পিতৃনির্দেশ ছিল।

"মদ খেয়ো না বলতেন বাবা। মেনেছি। অন্য ব্যাপারে কিছু বলেননি মুখ ফুটে, খুব বেঁচে গিয়েছি, না-হলে তোমার সঙ্গে হয়তো দেখাই হতো না, কুমু।"

"কাজ নিয়ে আপনি ভীষণ চিন্তা করেন," বলেছে কুমু। সোমেশ্বরের প্রিয় ফ্রিজ-ঠান্ডা ডাবের জল কুমু এগিয়ে দিয়েছে ওঁর দিকে।

সোমেশ্বর খুশি হয়েছেন। বলেছেন, "কর্মজীবনে কাজটাই তো সব। এতদিন একলা ছিলাম, কাজে ডুবে থাকতে হয়েছে। এবার পুত্রটি কাজের হয়েছে। অফিসে বসছে। অভিনবর হাতে ক্রমশ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে হাল্কা হয়ে যাব। তখন হাতে অনেক সময় থাকবে। কিছুটা ধর্মের দিকে, কিছুটা তোমাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকব, কুমু। এই ধর্মর ব্যাপারটা ধরিয়ে দিয়েছে আমার বউ। তবে আমি দেখেছি ধর্মর সঙ্গে কোনো ঝগড়া নেই ভোগের। গৃহীকে তো সন্ন্যাসী হতে বলেননি মহাপুরুষরা।"

এসব কথা কুমুর ভালো লাগে না আজকাল। কারণ সেদিন হট করে স্নানের পর ডাবের জল খেয়ে বেরিয়ে গেলেন সোমেশ্বর। কুমুকে বললেন, "হঠাৎ জরুরি ফোন এসেছে।" কিন্তু কুমু অন্য খবর পেয়েছে, ম্যানেজার মঙ্গলবাবুর কাছ থেকে। মঙ্গলময় মিত্তির মশাই-ই একদিন সংগ্রহ করেছিলেন কুমুকে। খবর দিয়েছিলেন, "বাবু আপনার জন্যে পাগল।"

মঙ্গলময় নামটা নিখিলেশের অজানা নয়। সোমেশ্বরের আপিসে পরিচয় হয়েছে। লোকটা অফিসের কাজেই জড়িয়ে থাকে ধারণা ছিল, বাবুর প্রাইভেট কাজেও তাহলে রয়েছে মঙ্গলময়। অতস্ত নম্র মানুষ মনে হয়েছে, বাবুকে ভীষণ ভয় পায়, বাবুর পান থেকে যাতে চুন না খসে তা দেখার জন্যেই মঙ্গলময় সারাক্ষণ ব্যস্ত।

সেই মঙ্গলময়ের কাছে ইঙ্গিত পেয়েছে কুমু, সোমেশ্বর সেদিন নতুন আকর্ষণে অন্যত্র অতিথি হয়েছিলেন। আগে খবর পাননি। শেষ মুহূর্তে

মঙ্গলময় ব্যবস্থা পাকা করতে পেরে বাবুকে ফোন করেছিলেন। বাবু তখনই কুমুকে বললেন, "জরুরি কাজ", চলে গেলেন।

আগুনে জ্বলছে কুমুদিনী! "লোকটা কী ভীষণ পাজি কল্পনা করতে পারবেন না।"

"কে মঙ্গলময়?"

"চাকরের ভালোমন্দতে কী আসে যায়?" কুমু বলছে সোমেশ্বরের কথা।

কুমু কিছুই চেপে রাখল না। কুমু তখন নরেন ঘোষের বান্ধবী। মাঝারি সাইজের ব্যবসাদার—হিল্লিদিল্লি করে বেড়ায় না, কিন্তু "ঘরসংসার করে সুখ আছে।" এই বাড়িও নরেন ঘোষ ঠিক করে দিয়েছিলেন, অতি অল্প ভাড়ায়। বলেছিলেন, "তোমার যতদিন খুশি থাকো।" না-হলে এই পাড়ায় মাথা গুঁজবার জায়গা পেত কী করে কুমু? তারপর কী করে কুমুদিনীর শরীরের খবর পেলেন সোমেশ্বর। মঙ্গলময় এল দূত হয়ে। দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল কুমু।

শেষে একদিন সোমেশ্বর বিনা নোটিশে হাজির হলেন অনেক উপহার নিয়ে। কুমু বলেছিল, "একজনের বান্ধবী হয়ে আছি, তাঁকে ঠকানো আমার কাজ নয়।"

"উপহার ফিরিয়ে নিয়ে কোথায় যাব?" জিজ্ঞেস করেছিলেন সোমেশ্বর।

কুমু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিল, "বাড়ি নিয়ে যান। বাড়ির লোক আপনার হাত থেকে কিছু পেলে খুব খুশি হবে।" সোমেশ্বর অনেকদিন পরে সেই বাড়ি নিয়ে যাওয়ার গল্প কুমুকে শুনিয়েছেন, কুমুর জন্যে কেনা উপহারে কেমন করে বউকে ঠকানো হলো। সেই থেকেই তো ওঁর মাথায় ভূত চাপল। যা কুমুর কথা ভেবে কেনেন তারই আর একটা বাড়িতে পাঠিয়ে দেন বিভাবতীর জন্যে।

কিন্তু কুমুকে আয়ত্তে আনতে সংহার মূর্তি ধারণ করতে হয়েছে সোমেশ্বরকে। ম্যানেজারকে বলেছেন, "মঙ্গু, কে এই নরেন ঘোষ? ওকে একটু ওষুধ দাও। সোমেশ্বর মুখুজ্যে কখনও বিফল হয়ে ফিরে আসে না। সোমেশ্বর যা চায় তাই পায় এ-কথা বোঝে না কেন ওই ফুচকে নরেন ঘোষ

এবং তার বুলবুলিটা। নরেন ঘোষের জন্যে মেয়েটা তো গদগদ—পুরুষ মানুষ সম্বন্ধে এমনভাবে কথা তো বিয়ে করা বউও বলে না, মঙ্গু।"

মঙ্গু কাজে লেগে গিয়েছে। নরেন ঘোষের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে শেষপর্যন্ত। নানা ক্রিমিন্যাল মামলায় তিনি জড়িয়ে পড়েছেন, সরকারি রেডও হয়েছে বাড়িতে। প্রায় যথাসর্বস্ব হারাতে বসে ধর্মে মতি হয়েছে নরেন ঘোষের, কামিনীকাঞ্চনের মোহ ত্যাগ করে নরেন ঘোষ কোথায় কোন মঠে গিয়ে বসে থাকেন। সেই সময় আবার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন সোমেশ্বর, বিজয়ীর মতন কুমুদিনীর আতিথ্যগ্রহণ করেছেন সোমেশ্বর। বলেছেন মঙ্গুকে, এখনও কী হয়েছে নরেন ঘোষের, জেলে পাঠাব ওকে। কুমুকে আমি স্বপ্নে দেখেছি, সে আমার।"

ক্রমশ তিক্ততা মুছে গিয়েছে, সোমেশ্বরকে মেনে নিয়েছে কুমুদিনী। সোমেশ্বরও খেলার পুতুল পেয়ে সুখী হয়েছেন। কুমুকে কত জায়গায় পাঠিয়েছেন—দিল্লিতে, বোম্বাইতে, ম্যাড্রাসে, বাঙ্গালোরে। কুমুকে একবার ব্যাংককেও নিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু ওর পাসপোর্ট নেই।

অদ্ভুত লোক এই সোমেশ্বর। কুমুর এখানে এসে বিছানায় শুয়ে বউয়ের গল্প বলেন। বিভাবতীকে, অভিনবকে জানা হয়ে গিয়েছে কুমুদিনীর। কোনো মনোকষ্ট হয়নি কুমুদিনীর। "সোমেশ্বরবাবু তো বসে থাকবার লোক নয়। কুমুকে না পেলে মঙ্গুবাবুকে অন্য কোথাও পাঠাতেন। বাবুর যাতে অসুবিধা না হয় তা দেখাই মঙ্গুর কাজ।"

এই সোমেশ্বর সময়ে অসময়ে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। যখন বিজনেসে বড় সাফল্য এসেছে তখন সেলিব্রেট করবার জন্যে কুমুর সান্নিধ্য কামনা করেছেন। আবার যেদিন ওঁর ইলেকট্রিক অয়েল মিলে তালা লাগালেন সেদিনও এসেছেন। "বড় ক্লান্ত আমি, কুমকুম। মাইনে নিয়ে যারা পুরো কাজ করে না তারা দুশ্চরিত্র ছাড়া কী? এই দুশ্চরিত্র ওয়ার্কারগুলোই দেশটাকে শেষ করবে।" সেদিন কপালে অমৃতাঞ্জন মাখিয়ে দিতে বলেছিলেন সোমেশ্বর।

সোমেশ্বর নিষ্ঠুর। কুমুদিনীর মৌরসিপাট্টা নিয়ে বসে আছেন। তবে কুমুদিনীর সুখস্বাচ্ছন্দের ব্যাপারে নীচতা দেখাননি। প্রতিমাসে নিয়মিত টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন মঙ্গুর হাতে। নিজে যখন আসেন তখন উপহার

আনেন, কিন্তু টাকা কখনও নিজের হাতে তুলে দিয়ে মেয়েমানুষকে ছোট করেন না।

মঙ্গু অনেক সময় ভাউচার সই করিয়ে নেয়। অবাক হয়েছিল কুমু। অনেকদিন আগে তটিনী বলেছিল। বড়লোকরা আমাদের খরচও বিজনেসের ঘাড়ে চড়িয়ে দেয়। মঙ্গুবাবু ভাউচার সই করাতে-করাতে বলতেন, "এসব চলে যায় বিজ্ঞাপন খরচে।"

এখন সোমেশ্বরের বিজনেস খারাপ যাচ্ছে। আরও একটা মিলে তালা পড়েছে--সম্পত্তিটা বিক্রিও করা যাচ্ছে না ওয়ার্কারদের হাঙ্গামায়। রাগে ফুঁসছেন সোমেশ্বর, "আমার ব্যবসায় আমি লালবাতি জ্বালাব তাতেও এ-ব্যাটাদের আপত্তি। দেশটা নয়ছয় হয়ে গেল মালক্ষ্মী, এখানে আর থাকবেন না।"

কিন্তু সোমেশ্বর কেন কুমুর কাছে আসা কমিয়ে দিলেন? সে-খবর যথাসময়ে পেয়েছে কুমুদিনী। বাবু একটি সুলক্ষণা বান্ধবীর সন্ধান পেয়েছেন। মঙ্গুকে বলেছেন, "বড় ভাগ্যবতী মেয়ে। যেদিন আলাপ হলো পরের দিনই স্টক মার্কেটে অনেকগুলো টাকা এল। কুমুর পয়মন্ত ভাবটা কমে যাচ্ছে এমন একটা সন্দেহ মাঝে-মাঝে মনে উঁকি মারে।"

কুমু জ্বলছে। কুমু বলেছে, "লোকটা নরেন ঘোষকে হাতে মেরে আমাকে জিতেছিল, এখন ভাতে মারতে চায় আমাকে। আর একটা নেপালি বসিয়ে রেখেছে, অথচ মাসিক পয়সা ক্রমশই কমছে। মঙ্গু সব বুঝেও চুপ করে থাকে, বাবুর নির্দেশ মতন চলবার জন্যেই যে তার জন্ম হয়েছে। বাবু নির্দেশ দিলে কুমুকে টাকায় মুড়ে রাখতেন মঙ্গলময়বাবু।"

নিখিলেশ অস্বস্তি বোধ করেছেন। সোমেশ্বরের এই দিকটা আগে জানা হলে লোকটাকে নিয়ে কিছুই লিখতেন না। একটা বড় প্রবন্ধ বেরিয়েছে। এখন সোমেশ্বর আশা করে বসে আছেন পুরো একটা বই লিখবেন নিখিলেশ তাঁর সম্বন্ধে। বলেছেন, "চলে যান পুরী অথবা নৈনিতাল। মঙ্গু সব ব্যবস্থা করে দেবে। ওখানে হোটেলে নিরিবিলিতে থেকে লিখে ফেলুন বইটা—মা সরস্বতী তো আপনার আঙুলের ওপর বসে আছেন।"

নিখিলেশ বাড়ি ফিরে এসেছেন। কুমুদিনীর বুকের মধ্যে প্রতিহিংসার

আগুন জ্বলছে, বুঝতে পারেন নিখিলেশ। সোমেশ্বরকে ঘৃণা করতে শুরু করেছেন কুমুদিনী। কুমুদিনী এখন মুক্তি চায়। কিন্তু নিষ্ঠুর সোমেশ্বর অত সহজে খাঁচার পাখিকে বনে ফিরে যেতে দেবার অনুমতি দেবেন না। কুমুদিনীকে বন্দিনী রেখে যে বিশেষ আনন্দ পাচ্ছেন সোমেশ্বর তা বুঝেই বুকের মধ্যে আগুন জ্বলছে কুমুদিনীর।

এই প্রতিহিংসা থেকে আর কী হতে পারে? এদেশের মেয়েরা এখনও ভীষণ অসহায়—বিয়ে করেই তারা অধিকার পায় না, আর কুমুদিনীর অবস্থা তো অন্যরকম। নিখিলেশ ভেবেছেন, কী কী হতে পারে? কুমুদিনী কি শেষপর্যন্ত সোমেশ্বরের স্ত্রীর কাছে সব ফাঁস করে দেবে? কিন্তু তাতে তো নিজের প্রফেশনের অমর্যাদা হবে—কুমুদিনী নিজেই বলেছে, কয়েকটা মূল্যবোধের ওপরেই কুমুদিনীর মতন খারাপ মেয়েরাও দাঁড়িয়ে থাকে।

নিখিলেশ মিথ্যাচার করবেন না। সোমেশ্বরকে তিনি চেনেন, তাঁর সম্বন্ধে লিখেওছেন, কিন্তু মন চাইছে কুমুদিনী প্রতিশোধ নিক। লেখক নিখিলেশ তাতে খুশি হবেন।

নিখিলেশ শুনেছেন, ওই নরেন ঘোষ আবার সামলে নিয়েছেন। পুলিশের হাঙ্গামা, ট্যাক্সের হাঙ্গামা কাটিয়ে বিজনেসে দুটো পয়সার মুখ দেখতে আরম্ভ করেছেন। কুমুদিনী কি বিদ্রোহ ঘোষণা করে নরেন ঘোষের কাছেই ফিরে যাবে? আর একটা দারোয়ান পুষতে বলবে ঘোষমশাইকে যে দারোয়ান সোমেশ্বরকে এই বাড়িতে ঢুকতেই দেবে না!

নিখিলেশ এর পর ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বেশ কয়েক সপ্তাহ বাইরে কাটিয়ে নিখিলেশ সবে ফিরে এসেছেন কলকাতায়। সেদিন সকালে দক্ষিণের বারান্দায় বসে নিখিলেশ আবার ভাবছেন সোমেশ্বর ও কুমুদিনীর কথা। কুমুদিনী বলেছিল, এমন শিক্ষা দেবে সোমেশ্বরকে যে লোকটা কখনও ভুলতে পারবে না। কিন্তু সেরকম কিছু হয়নি। প্রতিশোধ নেব বললেই মেয়েরা তা পারে না, তারা বড় দুর্বল।

ঠিক সেই সময়েই ফোন এল খবরের কাগজ থেকে। নিখিলেশ এই কাগজেই সোমেশ্বরের জীবন নিয়ে 'লক্ষ্মীর বরপুত্র' বলে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। ওঁরাই বললেন, "সোমেশ্বর খুব সিরিয়াসলি অসুস্থ। হার্টের

অ্যাটাক নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছেন। একটা ছোট্ট প্রবন্ধ তিনশ শব্দের মধ্যে তৈরি করে রাখা প্রয়োজন এই বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সম্বন্ধে।" নিখিলেশ ক্ষমা চাইলেন। বললেন, "ওই যে লিখেছিলুম তার বাইরে আমার কিছু বলবার নেই, সুধন্যবাবু। আমি ওঁর সম্বন্ধে আর লিখব না।"

নিখিলেশ এরপর ফোন করেছিলেন কুমুদিনীর বাড়িতে। কিন্তু সেই ফোন বোধহয় খারাপ। বাজছে, কিন্তু কেউ তুলছে না।

নিখিলেশ বাড়ি থেকে বেরোবার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু সেই সময় কাশীনাথ এসে হাজির।

কাশীনাথ বলল, "ভীষণ ব্যাপার স্যর। কুমুদিনীর ওখানে কাল যা কাণ্ড! কুমুদির স্পেশাল রিকোয়েস্টে সোমেশ্বর মুখার্জি একটু বিশ্রাম নিতে এসেছিলেন। কুমুদির সঙ্গে ওঁর সম্পর্কের পঞ্চম না ষষ্ঠ বার্ষিকী! তারপর না স্যর—"

তারপরের ব্যাপার বলতে কাশীনাথ নিশ্চয় সোমেশ্বরের অসুখের কথা বলছে। কিন্তু কাশীনাথ সে খবর পায়নি। কাশীনাথ বলল, "আমি স্যর অন্য দৃশ্য দেখে এসেছি। সোমেশ্বরবাবু যখন ফুলটুল নিয়ে কুমুদির ঘরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন তখন ভয়ঙ্কর দৃশ্য।"

"কী দৃশ্য? কুমুদিনী বিষটিষ খেয়ে বসে আছে? সব সম্ভব বাঙালি মেয়েদের দ্বারা।"

কাশীনাথ বলল, "না, স্যর। সোমেশ্বর যার জন্যে স্বপ্নেও প্রস্তুত থাকতে পারেননি তাই। সোমেশ্বরবাবুর ছেলে অভিনব ও কুমুদিনী একই বেডরুমে..."

কাশীনাথ বলল, "ভীষণ প্রতিশোধ নিয়েছে কুমুদি। কয়েকদিন ধরেই কুমুদি কিছু একটা মতলব আঁটছিলেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে অভিনবর নতুন আপিসে গেলেন, তখন সোমেশ্বরবাবু ক্যালকাটায় নেই। কুমুদি আমার কাছে ওইসব ইন্দিরাপত্র, কিষাণপত্রর ব্যাপার বুঝে নিলেন। বললেন, কাজ হলে আমিই পাব। প্রতিদিন খুব সাজগোজ করে বেরোতেন কুমুদি—যেতেন ওই অভিনবর কাছে। তারপর আমাকে দিয়ে নিজের ফোন নম্বর পাঠিয়েছেন অভিনবর কাছে।"

"তারপর স্যর, ভীষণ আবদার করেছেন, সোমেশ্বরবাবুর কাছে, বার্ষিকীতে আসতেই হবে। এদিকে অভিনবকে আমিই কুমুদির কাছে নিয়ে এলাম, স্যর। আমি তো অতশত জানি না। নিজের গাড়ি ছেড়ে, অভিনব ট্যাক্সি চড়ে যখন আমার সঙ্গে এল তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল। আমি ভাবলাম, সত্যিই বড় একটা বিজনেস কুমুদি আমাকে পাইয়ে দেবে।"

কাশীনাথ বলল, "কয়েক ঘণ্টা পরে আমার ফিরে যাবার কথা ছিল, অভিনবকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু ঢুকবার সময়েই শুনি ভীষণ ব্যাপার। সাজগোজ করে সোমেশ্বরবাবুও এসে গিয়েছেন। সময় যখন খারাপ হয় তখন এইরকমই হয়, সেমসাইড হয়ে যায়।"

"এইরকম শাস্তির কথা কখনও শুনেছেন স্যর?" কাশীনাথ জিজ্ঞেস করল। চুপ করে রইলেন নিখিলেশ।

কাশীনাথ বলল, "ইন্ডিয়ান মেয়েদের দেখলে বোঝা যায় না, স্যর। ওরা যদি একবার জ্বলে ওঠে তাহলে সে-আগুন নিভানো ভীষণ শক্ত। সময় পেলে একবার ওখানে যাবেন। কুমুদি আপনাকে কীসব বলবার জন্যে ভীষণ উদগ্রীব হয়ে আছেন।" এই বলে কাশীনাথ কুণ্ডু চা না খেয়েই লেখক নিখিলেশের বাড়ি থেকে হনহন করে বেরিয়ে পড়ল।

আজব আপ্যায়ন

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী এবং সুশীতল চট্টরাজ কলকাতার এই দুই নাগরিককে নিয়েই এবারের প্রথম গল্প। এঁদের দু'জনের সঙ্গে আমি নিজেও আছি—তবে এবারের হাঙ্গামায় আমি না থাকতে পারলেই সুখী হতাম।

বয়স বাড়ছে, নিজের শরীরস্বাস্থ্য এবং সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা চিন্তায় সারাক্ষণ জর্জরিত হয়ে আছি—এ-সময় অত্যধিক উত্তেজনা সহ্য হয় না। নাটকীয় কোনো ঘটনার রিপোর্ট পরের দিন ভোরে সংবাদপত্রে পড়তে পারি, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী হবার মতো স্নায়বিক সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, কিছু অস্বাভাবিক এবং উত্তেজক ঘটনা চোখের সামনে এবং সেই অভিজ্ঞতা আমাকে এখনও শান্ত হতে দিচ্ছে না এবং আজ আমাকে লিখতে বসিয়েছে।

লেখক হিসেবে আমার একটা অলিখিত নীতি আছে—যাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সখ্যতা আছে, যাঁদের বাড়িতে আমি আতিথেয়তা নিয়েছি তাঁদের পারিবারিক কোনো ঘটনা সম্পর্কে আমি গল্প লিখি না।

এক্ষেত্রেও গল্প লেখা ঠিক নয়। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করবেন না, বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন, "ব্যাপারটা নিয়ে তুমি একটা গল্প লেখো। যে-কাগজে তুমি লিখবে তার একশ কুড়িখানা কপি আমি ক্যাশ টাকা দিয়ে কিনে নেব ফর প্রাইভেট সার্কুলেশন। তবে, অন ওয়ান কন্ডিশন, যার জন্যে এই স্পেশাল আপ্যায়ন তার নামটা পাল্টাতে পারবে না। ওই লোকটা সম্বন্ধে কাগজে, ম্যাগাজিনে ইনিয়ে-বিনিয়ে কত খবরই তো বের হয়, ওই সব রঙিন সাক্ষাৎকারের সঙ্গে আসল খবরটাও জানা হয়ে যাক পাবলিকের।"

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী আরও বলেছিলেন, "আমার এই শরীরে নীল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। বুঝতেই পারছ, পাবলিক কথাটার ওপর আমার কখনো তেমন ভরসা বা শ্রদ্ধা ছিল না। পাবলিক বললেই পি ডবলু ডি বা পাবলিক

ইউরিন্যালের কথা মনে পড়ে যেত—ইংরেজ আমলেও এ-দুটো খুব পরিষ্কার জায়গা ছিল না।"

"এসব কী বলছেন?" বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীকে আমি বাধা দেবার চেষ্টা করেছি। "পি ডবলু ডিতে অনেক ভালো লোক আছেন, ভালো কাজও হচ্ছে, কাগজে তার রিপোর্টও বেরোয়।"

"রাখো রাখো!" সস্নেহে ধমক লাগিয়েছিলেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। নিজের ভারী শরীরটি নাড়িয়ে বিশ্বনাথ বলেছিলেন, "পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, পাবলিক সার্ভেন্ট, পাবলিক উয়োম্যান—ভালো-ভালো মেটিরিয়াল এই পাবলিক কথাটার কুসংসর্গে দুর্গন্ধে ভরে উঠেছে। সেই মান্ধাতার আমল থেকে এইরকম হয়ে এসেছে। ইদানীং কিন্তু একটা পরিষ্কার কথা কানে আসছে। কতদিন যে কথাটা পরিষ্কার থাকবে তা অবশ্য জানি না—জনগণ। আজকাল যখন খুব মন মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তখন যে-কথাটা বিশ্বাস করতে প্রাণ চায় তা হলো—জনগণই শেষ কথা বলবেন।"

অ্যাভারেজ জনগণ থেকে ওজনে বেশ ভারী বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী একটু থেমে আমাকে বলেছিলেন, "তুমি আমার এই ঘটনাটা জনগণকে জানাতে পারো। আমি একটুও রাগ করব না, বরং খুশি হব।"

কিন্তু সুশীতল চট্টরাজের কথাও আমাকে ভাবতে হবে। হাজার হোক, একডাকে চেনা যায় এমন একটি নাম এই সুশীতল চট্টরাজ। খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি, বিবিধভারতী ইত্যাদির কল্যাণে সুশীতলের খ্যাতি এখন বেড়েই চলেছে। আর্টের লাইনে, ফ্যাশনের লাইনে, অপসংস্কৃতিবিহীন গ্রুপ থিয়েটারের লাইনে মস্ত এক উঠতি তারকা এই সুশীতল চট্টরাজ। কাগজের বিজ্ঞাপনে ওঁর নাম নজরে না পড়বার কোনো উপায় নেই। সবচেয়ে বড় টাইপ বিজ্ঞাপনের মাথার ওপর ঘোষণা থাকে : 'সুশীতল চট্টরাজের সৌজন্যে, সুশীতল চট্টরাজ পরিকল্পিত ও প্রযোজিত শিল্প প্রদর্শনী আজ আকাদেমিতে'। কিংবা, 'সুশীতল চট্টরাজ নিবেদিত অমুক শিল্পগোষ্ঠীর নাট্য নিবেদন অমুক'।

সুশীতল চট্টরাজ নিজেই আমাকে বলেছিলেন, "ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান এরিয়ায় নাম করতে কারও বেশিক্ষণ সময় লাগে না। ঘটে একটু বুদ্ধি এবং মানিব্যাগে সামান্য কিছু টাকা প্রয়োজন, এই যা!"

চোখ বুজে সুশীতল বলেছিলেন, "এই যে আমার নাম হচ্ছে, লোকে যে এখন আমাকে একডাকে চিনতে পারছে, এর পিছনে রয়েছে সিম্পল একটি পলিসি। আমার অফিস-ম্যানেজার সেবাব্রত রক্ষিতকে বলে দিয়েছি কোনো বিজ্ঞাপনে আমার নাম ৬০ পয়েন্ট টাইপের কমে থাকলে সে বিজ্ঞাপনের বিল পাশ করবে না।" ,

সুশীতল চট্টরাজ আরও মন্তব্য করলেন, "আমার ম্যানেজার সেবাব্রত রক্ষিত ছেলেটি খুবই ডাইনামিক। ও সেই সঙ্গে অর্ডার দিয়েছে, যেকোনো বিজ্ঞপ্তিতে সবার ওপরে সুশীতল চট্টরাজের নাম থাকবে—শম্ভু মিত্র, সত্যজিৎ রায়, রবিশঙ্কর, মৃণাল সেন যেই থাকুক সে নাম সুশীতলের নামের তলায় ছোট টাইপে ছাপা হবে। আমার একটু লজ্জা-লজ্জা লাগছিল। কিন্তু সেবাব্রত রক্ষিত মনে করিয়ে দিল, এ-দেশে চিরকালই তাই হয়েছে, স্যর। তাজমহল কে পরিকল্পনা করেছিল তা আমরা জানি না, কিন্তু তাজমহলের খরচ যিনি বহন করেছিলেন সেই শাজাহানের কথা সবার মুখে মুখে। সিনেমার পোস্টারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যজিৎ রায়ের মাথার ওপরে চুন-সুরকির বিজনেসম্যানদের নাম বারবার ছাপা হয়েছে, কেউ আপত্তি করেনি, বরং খুশি মনে মেনে নিয়েছি।"

সুশীতল চট্টরাজ যা-কিছু বলেন তা জোরের সঙ্গে বলেন। ওঁর মুখোমুখি বসলে, ওঁর সব বক্তব্য বিনম্রচিত্তে মেনে নিতে ইচ্ছে করে। এইটাই সুশীতলের ব্যক্তিত্ব—এ-বিষয়ে কোনো দ্বিধার সম্ভাবনা নেই।

সুশীতল চট্টরাজের কথায় আমাকে যথাসময়ে আসতে হবে। সত্যিকথা বলতে কী, তিনি এবং বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী এঁরা দু'জনেই হলেন আমাদের প্রধান চরিত্র। এঁদের মধ্যে কে যে এক নম্বর এবং কে যে দু'নম্বর তা আপনাদেরই স্থির করতে হবে। আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসলে সবকিছু গোলমাল করে ফেলি। কখনও মনে হয় এই বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীরই গল্প। আবার কখনও মনে হয়, গল্পটা সুশীতল চট্টরাজেরই। নায়ক হিসেবে কারও নাম যদি ৬০ পয়েন্ট টাইপে ছাপাতে হয় তিনি অবশ্যই সুশীতল চট্টরাজ।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী আমার অতি প্রিয় গিনিদির দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

শ্বশুরবাড়ির নানা আত্মীয়তার শাখাপ্রশাখা পেরিয়ে গিনিদির দেওর হলেন এই বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। সেই সুবাদেই কবে যেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল।

আমার এক বন্ধু বলে দিয়েছিলেন, অন্য কিছু জানা না থাকলে দুনিয়ার সমস্ত রায়চৌধুরীকে এক্স-জমিনদার বলে ধরে নেবে। রায়চৌধুরীরা কখনও হেঁজিপেঁজি লোক হয় না। যেমন ধরো দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সত্যজিৎ রায়চৌধুরী।

"সত্যজিৎ রায় আবার রায়চৌধুরী হলেন কবে?"

আমি ভুল খবরের ক্যাচ লুফে নেবার চেষ্টা করেছিলাম।

কিন্তু বন্ধু সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলেন, "এসব রিসার্চ চালিয়ে বের করতে হয়! রায়চৌধুরী ছাড়া অমন খাসা প্রতিভা কী করে হবে?"

অবিশ্বাসে আমার মুখ কুপিত হচ্ছে দেখে বন্ধু বললেন, "যাঁর ঠাকুরদার নাম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তিনি সত্যজিৎ রায়চৌধুরী না হয়ে যান না।"

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর বয়স আমার থেকে দু'এক বছর বেশি। চেহারাটি জমিদারসুলভ—যেমন ভারি, তেমন দীর্ঘ। চার-পাঁচ পুরুষ শিকারি না-হলে অমন গোঁফ, অমন চোখের তীক্ষ্ণতা এবং হাতের অমন বাইসেপ হয় না। বিশ্বনাথ চৌধুরী নিজে পালোয়ান নন, কিন্তু পারিবারিক পালোয়ানীর অদৃশ্য ছায়া রয়েছে তাঁর চলনে, বলনে এবং প্রকৃতিতে। আর শিকারের সঙ্গে ওঁর কী ধরনের সম্পর্ক তা আমার জানা না-থাকলেও, চেহারা দেখলেই মনে হয় একটা সদ্য শিকার হওয়া বাঘকে পায়ের গোড়ায় রেখে বন্দুক হাতে ছবি তোলাবার দেহ অবশ্যই বিশ্বনাথ চৌধুরীর আছে।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর কোনো পেশা নেই। যদিও বাড়ির সামনে নেমপ্লেটে লেখা আছে : বি এন রায়চৌধুরী, বি এ বি এল। বাড়ির নাম ডোমজুড় হাউস। নিশ্চয় কোনো এক সময় ডোমজুড়ে ওঁদের জমিদারী ছিল। পেশায় ঢোকবার মতো বিদ্যে তাঁর আছে এই প্রমাণের জন্যেই বিশ্বনাথ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো ডিগ্রি জোগাড় করেছিলেন, কিন্তু নাক বেঁকিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "আমি কি বেশ্যা যে আমার পেশা থাকবে?"

ডোমজুড় হাউস আজ কিছুটা বিবর্ণ এবং হৃতশ্রী। অনেকদিন এই সুন্দর বাসগৃহ কোনো যত্ন পায়নি। বাংলার জমিদারী সভ্যতা এবং অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের ছাপ এই গৃহের সর্বাঙ্গে। কিন্তু বাড়িটা কলকাতার অভিজাত অঞ্চলে—আশেপাশে বেশ কয়েকটা পায়রা-খোপের মতন ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছে। নতুন এই সব ব্যারাকের জঙ্গলে একখানা মাত্র প্রকৃত বাড়ি অবশিষ্ট আছে, তার নাম ডোমজুড় হাউস।

বাড়িটার চারধারে আরও কয়েকটা ছোট-ছোট আউট-হাউস আছে। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণও তেমন আশাপ্রদ নয়। কিন্তু কলকাতায় বাড়িঘরদোরের অত্যধিক অভাবে এই সব বাড়িও কৌলীন্য অর্জন করেছে এবং শোনা যায় সেখানকার মাসিক ভাড়া থেকেই বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীকে অনেকেই নানা অর্থনৈতিক উপদেশ দিয়েছেন। কেউ বলেছেন, গেটের কাছে অত জায়গা রয়েছে, দোকান করো। কেউ বলেছেন, বাড়ির নিচে ছোট কারখানা বসাও। কেউ বলেছে, পেট্রোলপাম্পের আবেদন করো, অনেক খোলা জায়গা রয়েছে। বিশ্বনাথ চৌধুরী করজোড়ে উত্তর দিয়েছেন, "আমি মুদিও নই, কুলিকাবারিও নই, যে পাম্প বসিয়ে তেলের ব্যবসা করব। আমরা হচ্ছি খানদানি জমিদার, ল্যান্ডলর্ড হিসেবেই আমার এই চ্যাপ্টার শেষ হবে।"

অবশ্য বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর সংসারে কোনো অভাব নেই। বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী এবং বিধবা মা আছেন। একখানা লাল রঙের ইটালিয়ান ফিয়াট গাড়ি আছে। এই গাড়িখানার খুব যত্ন করেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। ইদানীং একটা মোটর সাইকেলও কিনেছেন বিশ্বানাথ। বন্ধুরা স্কুটার কেনবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বনাথ বলেছিলেন, "ওর থেকে পায়ে হাঁটা ঢের ভালো, ঠিক যেন ইঁদুরের ওপর চড়েছি মনে হয়।" এই মোটর সাইকেলের পৌরুষ আছে, গর্জন আছে—বিশ্বনাথের বাহন বৃষ বলেই মনে হয়!

বিশ্বনাথ অভিজাত ক্লাবের মেম্বার। এই সব ক্লাবের নতুন সদস্য উঠতি ধনীদের সম্বন্ধে বিশ্বনাথের অবশ্যই একটু তাচ্ছিল্য আছে। সবিনয়ে তিনি

মনে করিয়ে দেন, "চারপুরুষ ধরে তাঁরা এই ক্লাবের মেম্বার। আমার গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার যখন এই হল্-এ বসে ফ্রেঞ্চ কনিয়াকের অর্ডার দিচ্ছেন তখন ওই লোকটার ঠাকুর্দা জয়পুর থেকে সদ্য এসে বড়বাজারে কানাগলিতে নর্দমার সামনে উঁচু হয়ে বসে লোটা মাজছে।"

বিশ্বনাথ কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র মানুষ। অপমানিত না হলে কখনও ফোঁস করে ওঠেন না। মুখে সর্বদা অমায়িক হাসিটি লেগেই আছে। এই যে জমিদারী প্রথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে উঠে গেল, এই যে শতাব্দীর রাজকীয় মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে কলকাতা নগরী হঠাৎ বৈশ্যযুগের রক্ষিতা হয়ে উঠল তার জন্য কোনো অভিযোগ নেই বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর। যখন যে ঋতু আসবে তা মেনে নেবার মতো মনোবল আভিজাত্য তাঁর রক্তে রয়েছে।

এই বিশ্বনাথের বাড়িতে অনেক পুরনো বাংলা বই ও সাময়িক পত্র ছিল। বিশ্বনাথ আমাকে সেসব দেখবার অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এমনও বলেছিলেন, "তোমার যা যা প্রয়োজন তা উপহার হিসেবে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারো। তোমার কাছে থাকলে ওসব বই ভালো থাকবে। আমাদের বংশে সরস্বতী বেচা নিষেধ।"

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী দু'একবার আমাকে তাঁর ক্লাবে নিয়ে গিয়েছেন। অভিজাত এই ক্লাব কলকাতার সাকসেসফুল নাগরিকদের মিলনতীর্থ। এখানে সভ্য হওয়ার জন্যে কত ধনপতি সদাগর বছরের পর বছর অধীর আগ্রহে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করে আছেন।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী আমাকে বলেছিলেন, "রায়চৌধুরী বংশের জমিদারী বলতে এইটুকু স্পেশাল অধিকার টিকে আছে। নাতি, তস্য নাতি এই ক্লাবে প্রায় অটোমেটিক মেম্বার হয়ে যাবে—কারণ লালুদের সঙ্গে ঝগড়া করে স্যার নগেন মিত্তির যখন এই ক্লাব স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন আমার দাদু অভয়প্রসন্ন রায়চৌধুরীই স্যর নগেনকে জমি দিয়েছিলেন নিরানব্বুই বছরের লিজে। চুয়াল্লিশ বছর হয়েছে, আরও পঞ্চান্ন বছর পরে এই জমি আবার বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর কাছে ফিরে আসবে, অবশ্য তখন যদি বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী এবং ক্যালকাটা সিটি বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে।"

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ওখানে ফরাসি কনিয়াক অর্ডার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "বংশের নির্দেশ : হুইস্কি নামক ফায়ার ওয়াটার স্পর্শ করবে না। তাই কনিয়াকের ওপরেই লাইফটা চালিয়ে দিলাম। তবে একেবারে রেশন মাপা। ওই যে আবদার সেলিম আলিকে দেখছ, ওকেই বাবা বলে গিয়েছিলেন, খোকাবাবুকে কখনও দুটোর বেশি পেগ সার্ভ করবে না। সেই নির্দেশ এখনও মানা হচ্ছে। শুধু বাবা পেগের সাইজ বলে যাননি সেলিমকে ; সেই সুযোগে বড়া পেগ অর্ডার দিলেও ও কিছু বলতে পারে না।"

আমার জন্যে একটা মিকস্ড জুস ককটেল অর্ডার দিয়ে বিশ্বনাথ বললেন, "এমন সফ্ট্ ড্রিঙ্ক কোথাও পাবে না—স্বয়ং লেডি কারমাইকেল আমার দিদিমার জন্যে এই রেসিপি বানিয়েছিলেন। সেই রেসিপি আমার দাদুর কাছে শিখেছিল ওই সেলিমের দাদু। তারপর বুঝতেই পারছ—সেই ট্রাডিশন সমানে চলে আসছে! খেয়ে নাও, কারণ বেশিদিন এসব ফরমুলা বেঁচে থাকবে না। সেলিমের ছেলেটা গেস্টকিনে লোহা কাটতে ঢুকেছে, আর সেলিমের নিজের পেটে রয়েছে ডায়োডেনাল আলসার।"

"চিয়ার্স," এই বলে ফরাসি কনিয়াকের গেলাশ মৃদু চুম্বন করেছিলেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। "অনেকে ভাবে মাল খেয়েই আমি এই হেভি শরীর করেছি। একদম বাজে কথা—এই শরীর বংশের ফিকস্ড্ অ্যাসেট। ঐরাবত কখনও ইঁদুরের জনক হয়? সায়েব পেন্টারের আঁকা আমার বাবার অয়েল পেন্টিংখানা তোমাকে দেখাব।"

একটু হেসে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী বলেছিলেন, "লোকে যতই আমাকে বেকার আখ্যা দিক, আসলে আমিও সেলস্ লাইনে আছি। তোমার একটা গল্পের ওই লাইনটা খুব ভালো লেগেছিল—পৈতৃক সম্পত্তি এক-একখানা বেচছি আর খাচ্ছি! সুপার সেলসম্যান ছাড়া আমি কী? বলো? বিখ্যাত টায়ার কোম্পানির ইংরেজ বড়সায়েব একবার বছরের শেষাশেষি সমস্ত ব্রাঞ্চ অফিসে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, যতটা সম্ভাব বেচার চেষ্টা করুন। তারপর দেখা গেল, একজন ব্রাঞ্চের ম্যানেজার জানাচ্ছেন, গুদোম সাফ—নিজেদের আন্ডারওয়ার এবং গেঞ্জি ছাড়া আমার ছেলেরা সব বেচে

ফেলেছে!"

কনিয়াকের গেলাশে আর একটা চুমু খেয়ে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী বলেছিলেন, "ওই রকম সেলস্ করেছিলেন আমার মামাতো ভাই। বরিশাল থেকে বিতাড়িত হয়ে রিফিউজী খাতার নাম লিখিয়ে এখন বাঘা যতীন কলোনিতে থাকেন। ভাইপোটা সর্বহারার মহান নেতা হবার আশায় পার্টিতে যোগ দিয়েছে। দিক! কি বলো? কনিয়াকের জন্যে প্রাণ না কাঁদলেই হলো!"

এই ক্লাবেই একদিন সুশীতল চট্টরাজের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী সবে প্রথম পাত্র শেষ করে কনিয়াকের দ্বিতীয় পাত্রের দিকে নজর দিয়েছেন এমন সময় বললেন, "ঐ যে সুশীতল আসছে। ডোমজুড়ের ওধারের লোক। রাইজিং বিজনেসম্যান বলতে পারো। সুশীতলের খুব শখ হয়েছিল এই ক্লাবের মেম্বার হবে। তা টাকা থাকলেই তো এখানে নাক গলানো যায় না, তা হলে তো বড়বাজারের প্রত্যেক গদির শেঠজীর তো এখানে মেম্বারশিপ পাওয়া উচিত। এখানে মেম্বার হতে হলে চাই সামথিং এলস্, অর্থাৎ সামাজিক মর্যাদা, যা ওই সুশীতল চট্টরাজেরও অভাব ছিল। সুশীতলের খুব মুখ মিষ্টি। আমাকে ওই ডোমজুড়ের সুবাদে এসে ধরে পড়ল, লতায় পাতায় কী একটা অতিদূর সম্পর্কও দেখিয়ে দিল। বলল, আমি আপনার ছোট ভায়ের মতো। আমি বলে ফেললুম, এটা ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর যুগ, বেশি ভাইটাই না-হওয়াই ভালো। কিন্তু সুশীতল কিছুতেই শুনল না।"

কনিয়াকের গেলাশে আর একটা সুখচুমুক দিয়ে বিশ্বনাথ বললেন, "নামে সুশীতল, কাজেও সুশীতল---কিছুতেই চটে না। আর কম স্পিডে লাইফের পাখা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের রেগুলেটার সব সময় তেতে আগুন হয়ে আছে। তা যা বলছিলাম, সুশীতল ধরে পড়ল, কুঁজোরও চিত হয়ে শোবার শখ হয় মাঝে-মাঝে! দাদা, আমাকে ক্লাবে ঢুকিয়ে দিন। তা অনেক কষ্টে মেম্বার করিয়ে দিলাম।"

সুশীতল চট্টরাজ এবার আমাদের সামনাসামনি এসে পড়লেন। বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীকে দেখে তিনি বিনয়ে বিগলিত হয়ে উঠলেন।

বললেন, "এক পেগ স্কচ হয়ে যাক।"

বিশ্বনাথ গম্ভীরভাবে জানালেন, "হুইস্কি খাওয়া গুরুদেব এবং পিতৃদেব দু'জনেরই নিষেধ। ওটা মদ নয়, ওর নাম আগুনের জল!"

সুশীতলের সঙ্গে আমারও আলাপ হয়ে গেল। তিনি বললেন, "আমাকে দাদার ফ্যামিলি ফ্রেন্ড বলতে পারেন। ওঁদের বাড়িতে আমার নিয়মিত যাতায়াত—বউদি, কাকিমা সবাই আমাকে ভীষণ স্নেহ করেন।"

বিশ্বনাথের দিকে মুখ ঘুরিয়ে সুশীতল বললেন, "অনেকদিন ডোমজুড় হাউসে যাওয়া হয়নি। বউদি কেমন আছেন?"

বিশ্বনাথ হেসে উত্তর দিলেন। "বউদি এখন নিজের দাদা, বউদি এবং ভাইঝিকে নিয়ে হইহই করছে। ওরা আমাদের ওখানে এসেছে ক'দিনের জন্যে। তারপর দাদা বউদি চলে যাবে ট্রান্সফার হয়ে পুনায়। মেয়েটার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা ক'মাস পরেই—আমাদের কাছেই থেকে যাবে। একদিন সময় করে এসো, সুশীতল।

সুশীতল চট্টরাজ এবার কিছুটা দূরে সরে গেলেন। কনিয়াকের গেলাশে চুমুক দিয়ে বিশ্বনাথ বললেন, "ছেলেটি উদ্যমী আছে। বাপের ছোট্ট একটা কাপড়ের দোকান ছিল। সেটা অনেক বাড়িয়ে এখন কীসব কোম্পানির ডিসট্রিবিউশন নিয়ে ক্লথকিং না হোক ক্লথ উজীর হয়েছে। ডোমজুড়ে একটা সরষের তেলের কল খুলেছে—আমারই জমিতে। একটা ফার্টিলাইজার এজেন্সিও নিয়েছে—ওতে নাকি আজকাল টু'পাইস হচ্ছে। ওই এজেন্সি নেবার সময় সুশীতলের অত রমরমা ছিল না। গ্যারান্টি পেপারে এমন একজনের সই দরকার যার কলকাতায় বড় বাড়িঘরদোর আছে। সুশীতল এসে কেঁদে পড়ল। আমার গিন্নিও বললেন, লোকটা নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে—আমাদের সাহায্য করা উচিত। এসব অবশ্য অনেক বছর আগের কথা, তখন সুশীতল এই ক্লাবের মেম্বার হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি।"

সুশীতল চট্টরাজকে বয়সের তুলনায় কমবয়সী দেখায়। বেশ ফর্সা, ছোটখাট্টো, টাইট মানুষটি। চোয়ালটা একটু ভারী—শুনেছি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকেরা অমন চোয়ালের মালিক হন।

সুশীতলের চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। কাচগুলো ম্যাজিকের মতো,

আলোর উজ্জ্বলতা অনুযায়ী মিনিটে-মিনিটে রঙ পাল্টায়। সুশীতল চট্টরাজ আজ পরেছেন গোলাপফুলের ছাপ মারা বুশশার্ট এবং দুধসাদা লেটেস্ট ফ্যাশনের টেরিলিন ট্রাউজার। তবে সুশীতলের যা শরীর তাতে ধুতি-পাঞ্জাবিও ভালো মানাতো।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কেমন দেখলে সুশীতল চট্টরাজকে?"

"বেশ 'পলিশ্ড্' লোক।" আমি নির্দ্বিধায় আমার মতামত জানিয়ে দিই।

"আগে এতো পালিশ-টালিশ ছিল না। স্রেফ কাপড়ের গুদোম এবং তেলকল নিয়ে ব্যস্ত থাকত। ইদানীং দেখছি ওর চকচকে ভাবটা বাড়ছে।"

"চকচকে হওয়াটা খারাপ নয়," আমি মন্তব্য করি। "বিশেষ করে হাই সোসাইটিতে মিশবার সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছেন।"

বিশ্বনাথ আমার কথায় আমল দেননি। "আমাদের সাতপুরুষ তো স্রেফ ওইসব নিয়েই মাথা ঘামিয়েছেন—ওই সাবজেক্ট তাই আর আমার ভালো লাগে না," কনিয়াকের গ্লাসে মৃদু চুমুক দিয়ে বলেছেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। ওঁর হাতের সিগার জ্বলে উঠেছে। অমন ভারী চেহারায় রোগা টিকটিকে সিগারেট স্টিক মানায় না—মোটা সিগার এবং বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী যেন মেড ফর ইচ আদার।"

সুশীতল চট্টরাজের সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়েছে। সুশীতল চট্টরাজ নিবেদিত কোনো এক বিখ্যাত সংস্থার প্রথম অভিনয় রজনীতে তিনি আমাকে বিশেষ নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন। রবীন্দ্রসদনে নাটকের শেষে সুশীতল চট্টরাজ আমাকে ক্লাবে টেনে নিয়ে গেলেন।

বড় একটা হুইসকি অর্ডার দিয়েছেন নিজের জন্য। আমি এখনও মদ ধরিনি শুনে খুবই হতাশ হয়েছেন সুশীতল চট্টরাজ। "ড্রিংকসের সঙ্গে যোগ না-থাকলে রাইটার হওয়া যায় না, শংকরবাবু", সুশীতল আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন। "মাতাল হবেন না, কিন্তু মদ খাবেন না কেন?" কঠিন প্রশ্ন তুলেছেন সুশীতল।

সুশীতল আরও বলেছেন, "প্রথম জীবনে আমিও বোকামি করেছি। স্রেফ কাজের মধ্যে ডুবে থেকেছি—তারপর বুঝলাম স্রেফ কাজের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার মতো বোকামি পৃথিবীতে নেই। কাজকর্মের সঙ্গে

ফুর্তিটুর্তি একটু না মিশলে লাইফের কোনো মানে হয় না।"

লক্ষ্য করলাম, সুশীতল চট্টরাজ নিজের কথা বলে যেতেই ভালোবাসেন। অন্য কাউকে তিনি মুখ খুলবার তেমন সুযোগ দেন না। আরও দেখলাম, সেলফ-মেড ম্যান হিসেবে নিজের পর অত্যধিক বিশ্বাস তাঁর। সুশীতল চট্টরাজ সমাধান করতে পারেন না এমন সমস্যা যেন সংসারে নেই।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, প্রত্যেকটি সমস্যা এক একটা বন্ধ তালার মতো—প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা আলাদা চাবি আছে। কিন্তু সুশীতল চট্টরাজ তৃতীয় পেগ হুইস্কির শেষে বললেন, "একদম বাজে কথা। তাহলে তো মশাই, এক বস্তা চাবি নিয়ে আমাকে ঘুরে বেড়াতে হতো। দুনিয়ার সমস্ত তালা খোলবার জন্যে একটা মাস্টার 'কী' আছে এই সুশীতল চট্টরাজের!"

"ভাবছেন সেটা কী?" বেশ স্টাইলের সঙ্গে নিজেই প্রশ্ন তুললেন সুশীতল চট্টরাজ। "ক্যাশ, মশাই ক্যাশ! নাসিক ইন্ডিয়া সিকিউরিটি প্রেসে ছাপা সরকারি নোট ঢোকে না এমন কোনো তালার ফুটো ভগবান এখনও সৃষ্টি করেননি!"

সুশীতল নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছেন। এইসব লোক অনেক সময় অতীতকে ভুলবার জন্যে নানা রকম উল্টোসিধে কথা বলে থাকেন। সেসব ধৈর্য ধরে শুনে যাওয়াই ভালো।

সুশীতল চতুর্থ পেগের স্বাদ নিতে-নিতে বললেন : "ওই যে আপনাদের...অমুক মিত্তির—অত বড় বিপ্লবী থিয়েটার নট—যার পার্ট শুনে কত ছেলে বিপ্লবী হয়ে গেল, তিনিও মশাই মাত্র থার্টি থাউজেন্ড রুপিজ ক্যাশের জন্যে এই অধমের কথায় উঠছেন, বসছেন!"

সুশীতলের ঠোঁটে চাপা হাসির ঝিলিক। "...অমুক ঘোষ আপনাদের। ব্ল্যাক হোল, ব্ল্যাক মার্কেটে, ব্ল্যাক মানির বিরুদ্ধে সারা জীবন স্টেজে আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছেন—কিন্তু এই অধমের কাছে কাতর আবেদন, ভাউচার সই না-করিয়ে অর্ধেক পয়সা দিন!"

"দিচ্ছেন?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"অবশ্যই দিচ্ছি—না-হলে বনের বাঘ পোষ মানবে কেন? এই যে

সার্কাসের বাঘ নিয়ে দিনের পর দিন খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছি সে তো ওই ক্যাশ মাইনাস ভাউচারের জোরে!" মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন সুশীতল চট্টরাজ।

"কী বুঝছেন?" অভিজ্ঞ একজামিনারের মতো এবার প্রশ্ন করলেন সুশীতল চট্টরাজ।

"সত্যিকথা বলতে কী সমাজের সব রহস্য বোঝবার মতো ব্রেন আমার নেই, মিস্টার চট্টরাজ।"

আমার অসহায় স্বীকারোক্তি বোধ হয় সুশীতলের মনে একটু করুণার উদ্রেক করল। মৃদু হেসে তিনি উপদেশ দিলেন, "সে বললে তো চলবে না। গল্প লেখার লাইনে যখন এসেছেন তখন সমাজের রহস্যলহরী তো আপনাকে বুঝতেই হবে!"

"উত্তরটা আমার হয়ে আপনিই বলে দিন", সুশীতল চট্টরাজকে আমি অনুরোধ জানাই।

সুশীতল চট্টরাজ মিটমিট করে হেসে বললেন, "কমরেড মাও বলেছিলেন, বন্দুকের নলই হলো শক্তির উৎস। আমি একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলতে চাই, মানিব্যাগই হলো সমস্ত শক্তির উৎস!"

দার্শনিক তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ না করে আমি বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর খবরাখবর জিজ্ঞেস করি। "আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

সুশীতল সেবার যে রকম শ্রদ্ধাবনত ছিলেন এখন তার প্রমাণ পাওয়া গেল না। বললেন, "গিয়েছিলাম, ওঁদের তো আবার স্পেশাল রয়াল টেম্পার! গেলে দেখা হবে, কিন্তু উনি নিজে কখনও আমার বাড়িতে আসবেন না।"

"আছেন কেমন?" আমি জানতে চাই।

সুশীতল বললেন, "চমৎকার আছেন। প্রাত্যহিক দু'পেগের প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। বউদিও খুব ব্যস্ত। ভাইঝি বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখাশোনা করতে হচ্ছে। বিশ্বনাথবাবুও বউদির হুকুম মতো চলেছেন। এ রকম দায়িত্ব তো এখনও পাননি। বিষ্ণুপ্রিয়ার মা-বাবা পুনায় চলে গিয়েছেন, লোকাল গার্জেন বলতে এখন ওঁরাই।"

এর পরেই বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী একদিন আমার বাড়িতে হাজির

হয়েছেন। চেয়ারে বসেই বিশ্বনাথ বললেন, "একটা উপকার করতে হবে ভায়া। ঝপ করে দু'পাতার মধ্যে শরৎকালের ওপর একখানা রচনা লিখে ফেল তো। আমি ততক্ষণে একটা চুরুট শেষ করে ফেলি।"

"কী ব্যাপার, মিস্টার রায়চৌধুরী?" আমি অবাক হয়ে যাই।

"আর বোলো না। বুড়োবয়সে খুব বিপদে পড়া গিয়েছে. আমার শালার মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া—সামনেই হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা। মেয়েটা অর্ডার দিয়ে গেল, 'পিসেমসাই আমি কলেজে যাচ্ছি, ফিরে এসে যেন রচনাটা পাই।' বোঝো আমার অবস্থাটা! ওর বাপি নাকি ওই রকম হুকুম মতো রচনা লিখে দিত। কিন্তু আমার যে একেবারে অন্য কেস। গল্পের বইটই দু'একখানা পড়ি, কিন্তু বাংলায় কলম ধরা! দেড় ঘণ্টা বৃথা চেষ্টা করে যখন ঘেমে নেয়ে উঠছি, তখন খেয়াল হলো, হাতের গোড়ায় তুমি থাকতে আমার চিন্তা কী? বিষ্ণুপ্রিয়াকে আজ একেবারে চমকে দেওয়া যাবে।"

এরকম অনুরোধ আজকাল বড় একটা আসে না। তাছাড়া ইস্কুল কলেজের মাস্টারমশায়দের পছন্দমতো 'এসে' লেখা গল্প-উপন্যাস লেখার থেকে অনেক শক্ত কাজ। কিন্তু বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী অনেকবার আমাকে আদরযত্ন করেছেন, তাঁকে না বলা যায় না।

আমি এই বুড়ো বয়সে শরৎকালের ওপর প্রবন্ধ লিখে যাচ্ছি, আর বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী একমনে সিগার টেনে চলেছেন।

এক ফাঁকে বিশ্বনাথ বললেন, "ভাগ্যে বেশ কিছুদিন আগে জন্মেছিলাম। এখন জন্মালে, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক কোনো পরীক্ষায় আমি পাশ করতে পারতাম না। তোমার এখান থেকে বেরিয়ে একবার সাউথ ক্যালকাটায় পোয়েট পি লালের কাছে ছুটতে হবে। একখানা ইংরিজি রচনার অর্ডারও আছে বিষ্ণুপ্রিয়ার। আমার শালার চুল ক্রমশই কেন উঠে যাচ্ছিল তা এবার আমি বুঝতে পারছি!"

কথাবার্তায় বুঝতে পারছি, বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী তাঁর শালার মেয়েটির স্নেহডোরে বাঁধা পড়েছেন। বললেন, "অল রাউন্ডার মেয়ে বলতে যা বোঝায়! দেখতে শুনতে মা লক্ষ্মীর মতন। রবীন্দ্রসঙ্গীত জানে, চণ্ডালিকায় নেচেছে, সেকেন্ডারি পরীক্ষায় দুটো লেটার। ছবি যা আঁকে তোমায় কী বলব! আমার একখানা স্কেচ করেছে—দেখে তো আমি তাজ্জব। আমি

এখন বলছি, এসব তো তোর বাপের সুপারভিশনে হয়েছে। এখন তুই হায়ার সেকেন্ডারিতে অন্তত তিনটে লেটার না পেলে পিসেমশায়ের মুখ থাকে না।"

আমি শরৎকাল সম্পর্কে মাস্টারপাঠ্য রচনা লিখে চলছি, আর বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী বলে চলেছেন, "মায়ের আমার হাতের লেখা মুক্তোর মতো। রূপেগুণে লক্ষ্মী-সরস্বতী! স্বভাবটিও বড় মিষ্টি। এখনও খুব কচি আছে। আগে এতটা বুঝিনি, এখন নিজেদের খুব কাছে পেয়ে সব ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি।"

বুঝছি, বেশি বয়সে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী মায়ায় জড়িয়ে পড়ছেন। সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী বললেন, "ওর বাপমায়ের সঙ্গে আমাদের কর্তাগিন্নীর কম্পিটিশন লেগে গিয়েছে। ভগবানের দয়ায় হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় ভালো করলে আমরাই জিতব। গিন্নী এবং আমি তো তাই উঠেপড়ে লেগেছি!"

আমার লেখাটা নিয়ে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী বললেন, "খুব উপকার করলে ভায়া। শালার মেয়ের কাছে মুখ রাখার জন্যে লেখাটা নিজের নামেই চালাতে হবে—কিছু মনে কোরো না। প্রফেসর পি লালকেও ওই কন্ডিশন দিতে হবে। তারপর ওঁর লেখাটা নিয়ে আমি ক্লাবে চলে যাব। ওখানে নিরিবিলিতে বসে বাংলা ও ইংরিজি রচনা দুটো আমি নিজের হাতে টুকে ফেলব ; তারপর সোজা বাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া ঠিক চারটের সময় ফিরে আসবে আজ।"

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর লাল ফিয়াট রেসিং গাড়ির স্টাইলে প্রচণ্ড গর্জন করে অন্য অনেক পথচারীকে ডোন্টকেয়ার করে প্রফেসর পি লালের সন্ধানে বেরিয়ে গেল। বুঝলাম বুড়ো বয়সে ভরত রাজা হরিণ শিশুর প্রেমে পড়েছে।

কয়েকদিন পরে হরিণ শিশুটিকেও দেখেছি আমি। লাল ফিয়াট ড্রাইভ করে চলেছেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী, আর পাশে বসে আছে একটি ফুটফুটে নবযৌবনা। মেয়েটির মুখটি বেশ সরল—কোথাও মলিনতার ছোঁয়া নেই। বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী হাত তুলে ইঙ্গিতে বললেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি কলেজে পৌঁছতে যাচ্ছেন। বুঝলাম, বিনামাইনের বেশ ভালো চাকরি

পেয়েছেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে বিষ্ণুপ্রিয়া যতক্ষণ না পুনায় বাপ-মায়ের কাছে ফিরে যাচ্ছে ততক্ষণ বিশ্বনাথবাবু ও তাঁর স্ত্রীর একদিনও ছুটি নেই।

এই ভাবেই গল্প শেষ হলে আমার পক্ষে ভালো হতো। দেখানো যেত, রুদ্র মেজাজের বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী একটি কিশোরীর দায়িত্ব মাথায় নিয়ে পরিণত বয়সে কেমন সম্পূর্ণ কোমল হয়ে গেলেন। সেরকম নানা পয়েন্টও ছিল। যেমন একদিন ক্লাবে ওঁর সঙ্গে দেখা হলো। বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী একটা বড় সাইজের লেম্বু-সোডা পান করে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। একটু দূরেই হুইস্কি নিয়ে বসেছিলেন সুশীতল চট্টরাজ। তিনি ফিক করে হেসে জানতে চাইলেন, "কিছু বুঝলেন?"

মৃদু হেসে সুশীতলই বললেন, "দুর্লভ দৃশ্য। বাঘে ঘাস খাচ্ছে। বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর হাতে কানিয়াকের বদলে লেম্বুপানি। উপায় নেই। বিষ্ণুপ্রিয়ার সামনে কর্তা গিন্নী এখন আদর্শ স্থাপন করছেন! মিসেস রায়চৌধুরীর বাপের বাড়ি শিক্ষিত আদর্শবাদী পরিবার—কেউ প্রফেসর, কেউ প্রিন্সিপ্যাল, হার্ড ড্রিংকস্ ও-বাড়িতে এখনও জাতে ওঠেনি।"

বুঝলাম, বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী সম্পর্কে অনেক খবরাখবর সুশীতল চট্টরাজের মুঠোর মধ্যে রয়েছে।

সুশীতল হেসে বললেন, "ও-বাড়িতে আমার অবাধ গতিবিধি। অলমোস্ট এ মেম্বার অফ দ্য ফ্যামিলি বলতে পারেন। কিন্তু ডোমজুড় হাউসের লাগোয়া জমিটা আমাকে ক'বছরের জন্যে দিতে বলছি, রাজি হচ্ছেন না। বললুম বিশ্বনাথবাবুকে, পার্টনারশিপে আসুন, কিছু একটা করা যাক—তাতেও উৎসাহ দেখালেন না।"

এরপর ঠোঁট বেঁকালেন সুশীতল চট্টরাজ। "না দিক—কিসসু আমার এসে যায় না। ভগবানের দয়ায় ইনকাম আমার বেড়েই চলেছে। সিনেমা থিয়েটার কলমে প্রত্যেকদিন আমার নাম দেখছেন তো!"

না দেখে উপায় আছে? বড় বড় আর্টিস্ট, বড় বড় লেখক, বাঘা বাঘা ডিরেকটরের মাথার ওপর বিরাট বিরাট টাইপে লেখা থাকছে 'সুশীতল চট্টরাজ নিবেদিত।'

বেশ খুশি হয়ে সুশীতল বললেন, "এ লাইনে টাকা যথেষ্ট—বাড়তি লাভ এই নামটা। তেল চিনি নুন সিমেন্ট স্টিল এটসেটরায় পয়সা হয় কিন্তু নাম হয় না, বরং বদনাম। আর্ট কালচারের লাইনে মস্ত লাভ এই সুনামটুকু। তাছাড়া..."

সুশীতলের উত্তরের শেষ অংশটা শুনবার জন্যে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। "কী হলো, থামলেন কেন?"

"দু'চারজন সুন্দর সুন্দর লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, বুঝতেই পারছেন। এদেশের কত ছেলেমেয়ে যে আর্টিস্ট হবার জন্যে ছটফট করছে আপনাকে কী বলব?"

সুশীতল চট্টরাজ এরপর অর্থের অনন্ত শক্তি সম্পর্কে আর একখানা বক্তৃতা দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু আমি সুযোগ বুঝে পালিয়ে এসেছি। যাদের টাকা আছে তাদের মুখে টাকার মাহাত্ম্য সম্পর্কে বাণী আমার ভালো লাগে না। বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী নিজেও একবার বলেছিলেন, "নতুন বড়লোক এবং বনেদী ভদ্রলোকের মধ্যে ওইখানেই তফাত। নতুন হাঁড়িতে রাখলে টাকা সবসময় গোখরো সাপের মতো ফোঁস ছাড়ে এবং বেরিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করে।"

কয়েক সপ্তাহ পরেই নাটকটা যে এমনভাবে জমে উঠবে তা কল্পনাও করিনি। বাড়িতে বসেই হঠাৎ বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর স্বহস্তলিখিত নিমন্ত্রণপত্র পেলাম। "রবিবার দুপুরে অতি সামান্য কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকে ডোমজুড় হাউসে মধ্যাহ্নভোজে ডাকছি। বিশেষ আকর্ষণ, মধ্যাহ্নভোজের পরবর্তী ছোট্ট অনুষ্ঠান। তোমাকে আসতেই হবে, আশ্বাস দিচ্ছি বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী নিবেদিত এই অনুষ্ঠান তোমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

দু'দিন পরেই বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন। "আসছো তো ব্রাদার? হাতে গোনা সামান্য কয়েকজন গেস্ট, একজন না এলেই চেয়ার খালি থাকবে।"

"আপনি ডেকেছেন, গিনিদির আদরের দেওর আপনি, আসতেই হবে।"

গিনিদিও আসছেন কিনা জানতে চাইলাম। শুনলাম, গিনিদির ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে, তাই নেমন্তন্ন করতে গিয়েও নেমন্তন্ন করেননি বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। "ফিজিক্যাল ফিটনেস না-থাকলে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী নিবেদিত পোস্টলাঞ্চ অনুষ্ঠানটা ভালো না লাগতে পারে, তাই গিনি বউদিকে বাদ দিলাম।"

"কী ব্যাপার, মিস্টার রায়চৌধুরী? সুশীতল চট্টরাজের হাওয়া আপনার গায়েও লাগল নাকি? 'বিশ্বনাথ চৌধুরী নিবেদিত' কথাগুলো আপনি যেভাবে পুনরাবৃত্তি করছেন।"

"থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ভাই। খুব ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। সুশীতল চট্টরাজকেও চিঠি পাঠিয়েছি বাই হ্যান্ড ডেলিভারি। নিশ্চয় সে পেয়েছে। কিন্তু ওর ফোনটা খারাপ। তোমাকে একটা উপকার করতেই হবে। সুশীতলের বাড়িতে চলে যাও, লক্ষ্মীসোনা ভাই। ওকে বোলো, সুশীতল না-এলে পুরো অনুষ্ঠানটাই নষ্ট হবে যাবে। সুশীতল আসছে কি না খবরটা ফিরে এসে জানিও আমাকে। সুশীতলকে বোলো, মনে রাখবার মতো লানচে পার্টি হবে এটা। সত্যিকথা বলতে কি, ওয়ান অফ মাই লাস্ট পার্টিজ!"

টেলিফোন নামিয়ে রেখে ছুটেছি পূর্ণদাস রোডে সুশীতল চট্টরাজের নিজস্ব বাটিতে। তেতলা বাড়িটা বছরখানেক হলো কিনছেন সুশীতল চট্টরাজ। তার পর থেকেই নানারকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন চলেছে। এর জন্যে অজস্র টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু সুশীতল চট্টরাজ এখন টাকার তোয়াক্কা করেন না। "আগে 'কমফর্ট' তারপর তো টাকা, কী বলেন?" সুশীতল তাঁর একতরফা বাণী শুনিয়েছেন আমাকে।

ভক্তবৃন্দপরিবৃত অবস্থায় সুশীতল চট্টরাজ তাঁর এয়ার কন্ডিশন স্টাডিতে বসেছিলেন। সেই ঘরে বিখ্যাত এক অভিনেত্রীর সঙ্গে সুশীতলের ছবি টাঙানো রয়েছে। এই অভিনেত্রীর পারিবারিক নাম ধরে সুশীতল বললেন, "মিসেস...অমুক নিজেই সই করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে ছবিটা পাঠিয়েছেন। ভীষণ সেনসিটিভ আর্টিস্ট, যদি খবর পান ছবিটা আমি ডিসপ্লে করিনি তাহলে খুব কষ্ট পাবেন। তাই এই স্টাডিতে টাঙিয়েছি। আর ওই ছবিটা তো দেখছেন,

চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে আলোচনারত এই অধম—গভর্নমেন্টের ফটোগ্রাফার অবনী বিশ্বাস পার্সোনাল উপহার পাঠিয়েছে।"

ভক্তদের একজন জানালেন, "সামনের মাসে আর একখানা ছবির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে আলোচনারত সুশীতল চট্টরাজ। ওই ছবিটা কিন্তু কালারে তোলা হবে সুশীতলদা।"

"জনগণ যা চাইবে তাই হবে," চোখ দুটো অর্ধেক বুজে স্পেশাল স্টাইলে বললেন সুশীতল চট্টরাজ। "আর্টের লাইনে জনগণই তো শেষ কথা বলবেন। এই যে আমি টেক্সটাইল বিজনেস থেকে সময় করে আর্টের লাইনে আসছি, তার কারণ, নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের সুযোগ করে দিতে হবে। টাকার আমার অভাব ছিল না, এটাকে বলা চলতে পারে একটা সামাজিক দায়িত্ব। সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি অফ বিজনেস কথাটা সি-এম, পি-এম, ডি-এম, এ-ডি-এম সবাই আজকাল বলছেন। এ-ডি-এম মানে আমাদের ডোমযুড়ের অ্যাডিশনাল ডিসট্রিক্ট ম্যাজিসট্রেট। ওখানে অনেক প্রপার্টি এবং বিজনেস কনসার্ন রয়েছে আমার, সুতরাং জুনিয়র অফিসারকেও অবজ্ঞা করবার এক্তিয়ার নেই।"

সুশীতল চট্টরাজ আমার সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বলবার জন্যে ভক্তবৃন্দকে ঘর থেকে বিদায় করলেন। দু'নম্বর এয়ারকুলারটা চালিয়ে দিয়ে সুশীতল বললেন, "সামাজিক দায়িত্ব-ফায়িত্বর রেফারেন্স দিই বটে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আর্ট কালচারের মাধ্যমে টুপাইস আসেও। কলকাতাকে আপনারা যতই দরিদ্র বলুন, অকাজে পয়সা উড়োতে এ-শহরের লোকদের জুড়ি নেই। থিয়েটাব, সিনেমা, নাচগান যতই টিকিট করুন সব বিক্রি হয়ে যায়—হুজুগে পয়সা উড়োবার জন্যে এখানকার লোকরা সারাক্ষণ উসখুস করছে, এই নির্জলা সত্যটা এতোদিনে আমি বুঝতে পারছি।"

এবার আমি বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর বার্তা দিলাম। সুশীতলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "হ্যাঁ চিঠি পেয়েছি। আমি যে এতো ইমপর্টান্ট হয়ে উঠেছি জানতাম না। আমি না গেলে মধ্যাহ্নভোজন বন্ধ হয়ে যেতে পারে আপনার মনে হয়?"

"সেইরকমই তো শুনলাম, মিস্টাব চট্টরাজ। বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর

ওপরে আপনার প্রভাব যে প্রচণ্ড তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।"

মিটমিট করে হাসলেন সুশীতল চট্টরাজ। "দু'একটা ছোটখাট সার্ভিস দিই। বিশ্বনাথবাবুর লাল ফিয়াট সেদিন সকালে স্টার্ট নিচ্ছিল না আমিই নতুন অ্যামবাসাডরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে কলেজে পৌঁছে দিলাম।"

আমি দেখলাম পকেট থেকে বহুমূল্যবান বিদেশি পারফিউম বের করে হাতের চেটোতে একটু ঠেকিয়ে নিলেন সুশীতল চট্টরাজ। বিখ্যাত এক বম্বে ফিল্মস্টারের নাম করে বললেন, হাই সোসাইটিতে এখন এইটাই ফ্যাশন। পুরুষমানুষের শরীর দিয়ে নাকি কত মিনিট অন্তর অপ্রীতিকর গন্ধ বেরুচ্ছে, ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা তা কমপিউটর যন্ত্রে মেপে দেখেছেন এবং বহু বিখ্যাত মহিলা তারকার সঙ্গে পরামর্শ করে এই বহুমূল্য পারফিউম অতি সামান্য কয়েকজন পুরুষের ব্যবহারের জন্য বের করেছেন। বম্বের তিনজন বিখ্যাত স্টার ছাড়া একমাত্র সুশীতল চট্টরাজই ইণ্ডিয়ার চতুর্থ ভাগ্যবান ব্যক্তি যিনি এই পারফিউম সরাসরি প্যারিস থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

"কাস্টমসে ধরে না?" আমি বোকার মতো জিজ্ঞেস করি।

"বাঙালি গৃহবধূদের জন্যে গল্প লিখে-লিখে আপনার ব্রেন গোলমাল হয়ে গিয়েছে!" মধুর অভিযোগ করলেন সুশীতল চট্টরাজ। "সেদিন আপনাকে বললাম কী? মানি ব্যাগই হচ্ছে শক্তির উৎস। ক্যালকাটা, বম্বে, দিল্লীতে কত লোক রয়েছেন যাঁরা ইমপোর্টেড গাড়িতে ঘুরে বেড়ান, ইমপোর্টেড জামাকাপড় ছাড়া পরেন না, ইমপোর্টেড ক্রকারিতে তাঁরা খাওয়াদাওয়া করেন, ইমপোর্টেড বিছানায় আধশোয়া হয়ে ইমপোর্টেড সিগারেট এবং ইমপোর্টেড ড্রিংকস-সহ ইমপোর্টেড টি ভি ও টেপ প্রোগ্রাম দেখেন। লোডশেডিং হলে তাঁদের ইমপোর্টেড জেনারেটর চালু হয়ে যায়। হিন্দুস্থানী দিলটুকু ছাড়া আর সব কিছুই তাঁদের ইমপোর্টেড। কাস্টমসের লোকরা এসব জানে না ভাবছেন?"

এরপর আর কী বলার থাকতে পারে আমার? আমি আবার পুরনো কথায় ফিরে এলাম। "বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর ডোমজুড় হাউসে আগামী রবিবার আপনার তাহলে পদধূলি পড়ছে?"

ঠোঁট বেঁকিয়ে সুশীতল চট্টরাজ বললেন, "ঐদিন সকালে রবীন্দ্রসদনে

আমি খুব ব্যস্ত। সি-এম, এফ-এম, এইচ-এম এবং আই-এম চারজনে একসঙ্গে অ্যাপিয়ারেন্স দিচ্ছেন, রেয়ার অকেশন।"

"সি-এম বুঝলাম চিফ মিনিস্টার। কিন্তু বাকিগুলো?"

"শুধু গল্প লিখলে হবে না, চলতি ল্যাংগুয়েজটা ইমপ্রুভ করুন," সুশীতল চট্টরাজ মৃদু বকুনি লাগালেন। "সি-এম-এর সঙ্গে থাকবেন যথাক্রমে ফিনান্স মিনিস্টার, হেলথ মিনিস্টার এবং ইনফরমেশন মিনিস্টার। একেই বলে চতুর্বজ্র সম্মেলন। সুশীতল চট্টরাজ নিবেদিত অনুষ্ঠান ছাড়া কোথাও এরকম সম্মেলন দেখতে পাবেন না। এর পরেই আমি চলে যাব ডোমজুড় হাউসে। আফটার অল পুরনো ল্যান্ডলর্ড—এখানে যত খারাপ অবস্থাই হোক, ওঁদের সম্মানটা রাখা উচিত আমার।"

সুশীতল বললেন, "আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আধ ঘণ্টার মধ্যে টেলিফোন লাইন ঠিক হয়ে যাচ্ছে, তখন আমি নিজেই ফোন করে দেব ডোমজুড় হাউসে। টেলিফোন ঠিক হওয়ার জন্যে দু'দিন ক্যালকাটা টেলিফোনসের জি-এম-এর ওপর নির্ভর করেছিলাম, কোনো ফল হয়নি। এক ঘণ্টা আগে স্রেফ মানিব্যাগের ওপর নির্ভর করেছি, হাতে-হাতে ফল পেয়ে যাব আধ ঘণ্টার মধ্যে!"

"সুশীতলবাবু, আপনি তো ডোমজুড় হাউসের খুব কাছের লোক। হঠাৎ এই নেমন্তন্ন কেন? কোনো স্পেশাল অকেশন-টকেশন আছে নাকি?" আমি এই সুযোগে ভিতরের খবরটা জানবার চেষ্টা করি।

"আপনি ভাবছেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর বিবাহবার্ষিকী? সে গুড়ে বালি! ওঁদের বিয়ের দিনেই কে যেন মারা গিয়েছিলেন, তাই নো বিবাহবার্ষিকী ওই বাড়িতে!" কিন্তু সুশীতল চট্টরাজ স্বীকার করলেন, "খোদ ডোমজুড় হাউসে মধ্যাহ্ন ভোজনপর্বটা রীতিমতো স্পেশাল ব্যাপার, কারণ বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী প্রতিবারই ক্লাবে সুশীতলকে খাইয়েছেন, এই প্রথম বাড়িতে নিমন্ত্রণের সৌভাগ্য।"

"সেকালের জমিদার বাড়িতে প্রাইভেট অতিথি আপ্যায়ন, নিশ্চয় এলাহি ব্যাপার কিছু হবে," আমার মনের আশাটা সুশীতলের কাছে চেপে রাখলাম না।

সুশীতল ঠোঁট বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি স্পেশাল আপ্যায়ন

আশা করছেন?"

আমি বললাম, "মস্ত এক সাহেবের প্রাইভেট পার্টিতে গিয়েছিলাম একবার। শুনলাম, ওই ভোজের জন্য স্পেশাল চিংড়ি এসেছে কোচিন থেকে, তিতির পাখি এসেছে জয়পুর থেকে, আম এসেছে বোম্বাই থেকে এবং কুলফি এসেছে খোদ রাজধানী দিল্লী থেকে। কলকাতার আইটেম বলতে কেবল চিকেন এবং দহি!"

সুশীতল বললেন, "ভালো একটা পার্টি দিতে গেলে একটু আধটু মাথা খাটাতে তো হবেই। আজকাল বাঙালি বাড়িতে তো নেমন্তন্ন খাবার উপায় নেই। দু'খানা কেটারিং কোম্পানির একঘেয়ে মেনু জাতটার জিভ প্যারালিসিস করে দিল। আমি তো, ফর এ চেঞ্জ, নিরামিষ খাবার জন্যে ল্যাংড়া মহারাজ এবং ইংলিশ ডিশের জন্যে স্কাইরুমের ওপর নির্ভর করছি।"

সুশীতলের প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করলাম, খুব নামকরা বনেদী পরিবারে মধ্যাহ্ন ভোজের অভিজ্ঞতা নেই আমার। একবার কেবল এক পাকাদেখার নেমন্তন্নে গিয়েছিলাম, পাত্রীর বয়স একুশ এবং পাত্রীর গার্জেন গুনে গুনে একুশ রকমের ডিশ পরিবেশন করলেন আমাদের। এইটাই আমার লাইফে আপ্যায়নের এভারেস্ট! মেয়ের বয়স আঠাশ হলে আমাদের কী অবস্থা হতো তা এখনও মাঝে-মাঝে হিসেব করি।

সুশীতল জিজ্ঞেস করলেন, "খেয়েছিলেন কী ভাবে?"

"কার্পেটের আসনে বসে কাচের প্লেটে।"

করুণায় ঠোঁট উল্টোলেন সুশীতল চট্টরাজ। "এই জন্যে হাই-সোসাইটি সম্পর্কে আপনার লেখা অতো জোলো হয়। জয়নগরের কুমার রাজার বাড়িতে আমরা তিনবার খেয়েছি—প্রতিবারই আলাদা বাসনপত্তর। প্রথমবার শ্বেতপাথর, দ্বিতীয়বার পিংক পাথর, তৃতীয়বার জয়পুর ব্লু। আমরা খেতে বসেছিলাম দশজন। নুনের পাত্র থেকে জলের গেলাস পর্যন্ত সব একই ধরনের পাথর। শুধু জয়নগরের কুমাররাজা একখানা খাগড়াই কাঁসার বাসনে খেলেন, ওঁর ঠাকুমার কী এক নির্দেশ আছে। কোথাও নেমন্তন্ন করলেও, ওই খাগড়াই বাসন আগাম পাঠিয়ে দিতে হয় কুমার রাজাকেও!"

সুশীতল চট্টরাজের ওখান থেকে ফেরবার আধঘণ্টা পরেই বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর ফোন এসেছিল। সুশীতল অন্য এনগেজমেন্ট সত্ত্বেও ডোমজুড় হাউসে আসছেন জেনে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী আশ্বস্ত হলেন। বললেন, "রবিবারেও একটু খাটতে হবে, ব্রাদার। সুশীতলকে সঙ্গে নিয়ে আসবার দায়িত্ব তোমার। তুমি দেখো বিশেষ ফাংশনটা যেন মাঠে মারা না যায়।"

সুযোগ বুঝে বললাম, "অনুষ্ঠানেব কারণটা যদি একটু বলেন, মিস্টার রায়চৌধুরী।"

"কেন? সুশীতল কিছু জিজ্ঞেস করছিল নাকি?" জানতে চাইছেন বিশ্বনাথ।

"না, কৌতূহলটা আমার দিক থেকে। কোনো একটা শুভকারণ হলে সামান্য কিছু উপহার-টুপহার নিয়ে যাওয়া দরকার।"

হাহা করে হেসে উঠলেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। "খিদেটা ছাড়া সঙ্গে অন্য কিছু আনতে হবে না, ব্রাদার। তবে অবশ্যই এসো। অনেক অভিজ্ঞতা তোমার, কিন্তু এরকম লাঞ্চের পার্টি যে তুমি অ্যাটেন্ড করোনি তা প্রায় জোর করেই বলতে পারি।"

কথাটা আমার মনে লেগে গেল। রবিবার দুপুরে সুশীতল চট্টরাজকে নিয়ে ডোমজুড় হাউসে যেতে-যেতে ব্যাপারটা ওঁকে বললাম।

ঠোঁট বেঁকালেন সুশীতল চট্টরাজ। "টপ কিছু করবার মতো মুরোদ তো এইসব জমিদারী হাউসের আর নেই। হয়তো কিছু রুপোর বাসন আছে, সেগুলো বিক্রি করে দেবার আগে একবার দেখাবে আমাদের। কিন্তু তাতে কী এসে যাবে? সেদিন মিস্টার দয়ারাম সিংহানিয়ার বাড়িতে এই অধমের নেমন্তন্ন ছিল। ওঁদের হল্যান্ড রিপ্রেজেনটেটিভ সেদিন সকালের ফ্লাইটে সাত রকমের চিজ নিয়ে এলেন কলকাতায়। নিউ ভ্যারাইটির ব্যাঙের ছাতা এল ফ্রান্স থেকে, আর কী একটা স্পেশাল ইঁচড় এলো চায়না থেকে ভায়া কানাডা! ভেজিটারিয়ান ফ্যামিলি— এখনও নিউজিল্যান্ডের মাখন ছাড়া ব্যবহার করেন না। ভীষণ স্বদেশী মাইন্ডেড মানুষ এই মিস্টার সিংহানিয়া—সায়েবদের সমস্ত ব্যবসা থেকে তাড়িয়ে তবে এঁরা ছাড়বেন!"

আমি বললাম, "বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর ওপরেও আপনার প্রভাব

পড়েছে। বলেছেন, মধ্যাহ্নভোজনের পর 'বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী নিবেদিত' বিশেষ অনুষ্ঠান। এই নিবেদন কথাটা আমাদের ছোটবেলায় শোনা যেত না। যাঁর ফাংশন এবং যে হল-এ অনুষ্ঠান এই দুটোই প্রচারিত হতো।"

সুশীতল চট্টরাজ বললেন, "যাঁর টাকায় আর্টিস্টদের এতো লপচপানি তাঁর নাম থাকবে না তা কেমন করে হয়? এখন বরং কে অভিনয় করবেন বা গান গাইবেন তার থেকে অনেক ইম্পর্টান্ট কে নিবেদন করছেন। তা বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী কী আর নিবেদন করতে পারেন? হয়তো কোনো আনকোরা শখের ম্যাজিসিয়ানকে প্রেজেন্ট করবেন। আগেকার দিন হলে বা কথা ছিল! নতুন কোনো বাঈজীকে উপস্থিত করা হলো। কিন্তু সেওতো সন্ধ্যাবেলা—সূর্য না ডুবলে তো বাঈজীদের সঙ্গ পাত্তা পাওয়া যেত না।"

বিশ্বনাথ চৌধুরীর বাড়িতে ড্রিংকস-এর ব্যবস্থা থাকবে না তা বুঝেই সুশীতল চট্টরাজ বেরুবার আগে ঝটপট স্পেশাল 'আহ্নিক' সেরে নিয়েছেন। আহ্নিক ঝটপট হলেই হুইস্কি মাথায় চড়ে বসে। সুশীতল তাই একটু-আধটু বেফাঁস কথা বলছেন।

ওঁর টাকার গর্ব নতুন হাঁড়িতে রাখা কেউটে সাপের মতোই ফোঁস-ফোঁস করছে।

গাড়িতেই সুশীতল মনে করিয়ে দিলেন, "ইন্ডিয়াতে টাকাই ভগবান। এদিক ওদিক চাঁদি ছুঁড়তে পারলে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী থেকে বাজারের বেশ্যা পর্যন্ত সবই আপনার বশংবদ হয়ে থাকবে!"

সুশীতল চট্টরাজের এইরকম লেকচার শুনতে-শুনতেই আমি ডোমজুড় হাউসে পৌঁছে গেলাম। অন্য কয়েকজন অতিথি ইতিমধ্যেই উপস্থিত হয়েছেন: আমাদের দু'জনকে দেখে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

"না এলে খুব অসুবিধে হতো—শিবহীন যজ্ঞ হয় না," বিশ্বনাথের এই প্রারম্ভিক মন্তব্য শুনে খুব খুশি হলেন সুশীতল চট্টরাজ।

ফিস ফিস করে সুশীতল আমাকে বললেন, "মনে হচ্ছে আমিই গেস্ট অফ অনার! এত খাতির করছেন কেন? আমার সন্দেহ হচ্ছে হয়তো

শিগগির কোনো ধারটার চাইবেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী।"

"চাইলেই দিতে হবে এমন কোনো মানে নেই," আমি আশ্বাস দিই একটু রঙিন-হয়ে থাকা সুশীতল চট্টরাজকে।

সুশীতল আজ একেবারে জামাইসাজে এসেছেন। চুনোট করা দিশি ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, হিরের বোতাম লাগানো, হাতেও মহামূল্যবান দু-একখানা আঙটি। আর সেই স্পেশাল ফরাসি পারফিউমের গন্ধ যা কয়েক মিনিট অন্তর তিনি বাঁ হাতের চেটোতে ঘষে যাচ্ছেন।

সুশীতল বললেন, "নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালিদের জন্যে গল্প লিখে লিখে আপনার ঘটের বুদ্ধি কমে যাচ্ছে! জেনে রাখবেন, আমরা যে লেভেলে উঠে গিয়েছি সেখানে কেউ মুখ ফুটে চাইলে কিছু দিতে হয়। আরও জানবেন, বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর সঙ্গে একটা ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ রেখে যেতে চাই আমি—বাংলায় যাকে বলতে পারেন কার্যকর সম্পর্ক। সুতরাং উনি বড়মুখ করে কিছু ধার চাইলে আমি না বলতে পারব না।"

"হতে পারে," সুশীতলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমি স্বীকার করি হাই সোসাইটির তেমন কোনো খবর আমি রাখি না।

সুশীতল ফিস ফিস করে বললেন, "বুঝতে পারছেন না? আমাকে প্লিজ করবার জন্যে আমার দু'একজন আত্মীয়কেও বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী এখানে ইনভাইট করেছেন। ঐ দেখুন, আমার শালা অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ দু'জনেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়। ঐ দেখুন আমার শ্যালিকা, বেঢপ মোটা হবার আগে আমার ওয়াইফও ঐ রকম তন্বী ও অ্যাট্রাকটিভ ছিল।"

আমি ভাবছি, বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী কেন সুশীতলের স্ত্রীকে নেমন্তন্ন করেননি? চান্স পাওয়া মাত্র গোপনে জিজ্ঞেস করলাম ওঁকে। তিনি বললেন, "আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার বউদি কিছুতেই রাজি হলেন না। মেয়েদের মন বোঝা ভার।"

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর আরও দু'একজন বন্ধু নিমন্ত্রিত হয়েছেন এঁরা সকলেই দেখলাম সুশীতলকে চেনেন।

বিশ্বনাথবাবু আমাকে বললেন, "আজ সকালেও গিনি বউদিকে ফোন করেছিলাম। নিচের প্রেসারটা এখনও ১১০-এ রয়েছে, তাই আসতে বললাম না।"

"এলে তো ভালোই হতো, একটু রিল্যাক্সেশন হতো।" গিনিদির জন্যে আমার মন কেমন করছে।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী বললেন, "আমাদের যে ওই স্পেশাল ফাংশানটা রয়েছে খাওয়াদাওয়ার পর।"

রঙিন মেজাজে সুশীতল চট্টরাজ এবার আমাকে কাছে ডেকে পাঠালেন। "কোথায় উড়ে-উড়ে বেড়াচ্ছেন, মশাই? শুনুন আমার কথা। মানি ব্যাগে টাকা এবং ঘটে একটু বুদ্ধি থাকলে ইন্ডিয়াতে করা যায় না এমন কাজ নেই।"

"তাই বুঝি?" গৃহস্বামী বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী বিশিষ্ট অতিথির প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করলেন।

ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা সফ্‌ট ড্রিংকস্‌ এসে গিয়েছে। হাতে একটা গেলাস তুলে নিয়ে সুশীতল চট্টরাজ বললেন, "খরচাপাতি করলে এদেশে, মরামানুষ জ্যান্ত হয় এবং জ্যান্তমানুষ মরা হয়।"

আমাদের চুপচাপ দেখে সুশীতল একটু বিরক্ত হলেন।

"বিশ্বাস হচ্ছে না? শুনুন তবে। মড়া লোকের সম্পত্তি সেদিন কিনে ফেললুম—অন্য একটা লোক জ্যান্ত মালিক সেজে বেমালুম রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে সই করে এলো। পিওন থেকে সায়েব পর্যন্ত সবাই জানে—কিন্তু চাঁদি গলিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

"কী বুদ্ধি তোমার, সুশীতল। তোমার কোনো তুলনা নেই।" তারিফ করলেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী।

ইতিমধ্যে টেবিলে খাবার পরিবেশিত হয়েছে। মস্ত বড় দুটো তপসে মাছ সুশীতলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বিশ্বনাথ বললেন, "টেস্ট করে দেখো—তোমার জন্যে স্পেশালি আনিয়েছি উত্তরপাড়া থেকে। তুমি তো তপসে মাছের ভক্ত।"

এরপর এলো স্পেশাল চিংড়ি। বিশ্বনাথ বললেন, "এই চিংড়ি এসেছে ক্যানিং থেকে—আমার এক বন্ধু এক্সপোর্ট করে, সেই পাঠিয়েছে স্পেশাল রিকোয়েস্টে। সুশীতল তুমি তো ক্লাবে চিংড়ি মাছ ছাড়া অর্ডার দাও না!"

ফিক করে হেসে সুশীতল আর-একখানা চিংড়ি তুলে নিলেন। বললেন, "দাদার নজরই অন্যরকম—এর নাম টাইগার প্রন। বিলিতি

কোম্পানিগুলো মাঝে-মাঝে বড়-বড় কর্তাব্যক্তির বাড়িতে এক আধটা প্যাকেট পাঠায়।"

খাওয়াদাওয়া বেশ জমে উঠেছে। এবার এলো ইলিশ। বিশ্বনাথ বললেন, "বড় পেটি দু'খানা সুশীতলের প্লেটেই দাও।"

সুশীতল বললেন, "করেছেন কী দাদা?"

বিশ্বনাথ নরম স্বরে জানালেন, "এই ইলিশ বরফ কাকে বলে জানে না! শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপার আমার অনেকদিনের বন্ধু—ওখানে গাড়ি পাঠিয়ে, জেলেদের স্পেশাল রিকোয়েস্ট করে দু'খানি মাত্র ইলিশ পাওয়া গিয়েছে। নান্টু বলছিল, যখন থলেতে পুরছে তখনও ইলিশ জোড়া নড়ছে।"

"বোধহয় কর্তা গিন্নি ছিল—বলডান্স প্র্যাকটিশ করছিল।" রসিকতা করলেন সুশীতল চট্টরাজ।

এরপর পারসে মাছ। বড় দু'খানা পারসে মাছ সুশীতলের প্লেটে দিতে দিতে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী বললেন, "ভেড়ি কিং বিজয় ঘোষের নাম শুনেছো তো? আমাদের ক্লাবের পুরনো মেম্বার। ওঁকেই বলেছিলাম অন্তত সাড়ে সাত ইঞ্চি সাইজের পাঁচ ডজন পারসে পাঠিয়ে দিতে বাই ট্যাক্সি। রাত সাড়ে তিনটেয় বেরিয়ে ভোর সাড়ে চারটেয় এখানে ডেলিভারি দিয়ে গিয়েছে।"

"কী রকম লাগছে, সুশীতল? বিজয় ঘোষকে টেলিফোন করে তোমার মতামতটা জানাতে হবে।"

সুশীতল বললেন, "বড্ড ডেলিকেট মাছ এই পারসে! ভেড়িতে আর এক ঘণ্টা পড়ে থাকলে এর টেস্ট পালটে যেত। ওবেরয়তে সেবার পারসে ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল—কিন্তু হার মানছি দাদা, সে টেস্ট আর এ টেস্ট আকাশ পাতাল তফাত।"

আমার এবার একটু অস্বস্তি শুরু হয়েছে। সুশীতল ছাড়াও আমরা কয়েকজন অতিথি রয়েছি—কয়েকজন মহিলাও রয়েছেন। মিসেস রায়চৌধুরী তাঁদের অ্যাপায়ন করছেন বটে, কিন্তু গৃহস্বামীর সমস্ত নজরটা একজনের ওপরেই।

পারসে মাছের পর এলো রুই মাছ। বিশ্বনাথ বললেন, "সুশীতল, এ

মাছের টেস্ট তোমার অজানা থাকবার কথা নয়।"

মাছ খেয়ে সুশীতল বললেন, "চেনা-চেনা মনে হচ্ছে অথচ ধরতে পারছি না।"

"হাই লেভেলে উঠে গেলে অনেক সময় এইরকম হয়, সুশীতল। এই মাছ ডোমজুড়ের রায়চৌধুরীদের খিড়কি পুকুরের। প্রতিবছর এই পুকুরে একসময় একশ ঘড়া গোলাপ জল ঢালা হতো নিশ্চয় মনে আছে তোমার?"

"আহা! কী টেস্ট!" সুশীতলকে স্বীকার করতেই হলো। "এই পুকুরের মাছই পঞ্চাশ ষাট বছর আগে প্রিন্স অফ ওয়েলসকে খাওয়ানো হয়েছিল না?"

"উঃ সুশীতল। প্রিন্স টিন্স সবাইকে তুমি এবার টেক্কা দিতে পারবে। কাটবার পরে একশবার গোলাপ জলে ধোয়া হয়েছে এই মাছ—না-হলে এর স্পেশাল টেস্ট পাওয়া যায় না।"

এরপর চিকেন। এবারেও স্পেশাল হিসট্রি। রাঁচির কাছে নবাব এমদাদ খাঁয়ের নাতি এই চিকেন প্রতিপালন করেন।

"এই চিকেনের বৈশিষ্ট্য হলো, এঁরা পিওর গোবিন্দভোগ চাল খেয়ে বড় হন, সেই সঙ্গে পুকুরের মাছ। এই গোবিন্দভোগ যায় তোমার বউদির বাপের বাড়ি বর্ধমান থেকে। রাঁচি থেকে বাইপ্লেনে পাঁচটি মুরগি আজ সকালে পৌঁছেছেন। ট্রেনে বা ট্রাকে আনলে এঁদের টেস্ট নষ্ট হয়ে যায়।"

তারপরেও কত আইটেম। এবং প্রত্যেকটির এক একটি হিসট্রি। মিষ্টিরও অঢেল সাপ্লাই। কোনোটা এসেছে উত্তর কলকাতা থেকে, কোনোটা বড়বাজার, কোনোটা কেষ্টনগর, কোনোটা জনাই থেকে। দইটা এসেছে হাতিবাগান পেরিয়ে 'অমৃত' থেকে। এদের প্রত্যেকটিরই ইতিহাস যা শোনা গেল তা আমি ডাইরিতে লিখে রেখেছি, এখানে সবিস্তারে বলতে গেলে ছোটখাট উপন্যাস হয়ে যাবে।

খাওয়াদাওয়া সেরে, ডিনার টেবিল ছেড়ে আমরা এবার নরম সোফায় এসে বসলাম। সুগন্ধী মশলা তুলে নিলেন রুপোর আধার থেকে সুশীতল চট্টরাজ।

সেই মশলা বেশ তারিফ করে চিবোচ্ছেন সুশীতল চট্টরাজ, সেই সঙ্গে তাঁর পা দুটোও নাচছে। আমি একটু ঝিমিয়ে পড়েছি। যথেষ্ট খেয়েছি, কিন্তু বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী যেন সমস্ত অতিথিকে সমান চোখে দেখলেন না। আতিথেয়তার আইনে এটা নিয়মবিরুদ্ধ। আমার বাবা বলতেন, খাবার আসনে সবাইকে সমানভাবে দেখবে, গৃহস্বামীর এটাই প্রাথমিক কর্তব্য।

স্পেশাল আপ্যায়ন পেয়ে স্পেশাল ভোজের পর ফুলে ফেঁপে উঠেছেন সুশীতল চট্টরাজ। নিচুগলায় আমাকে বললেন, "বিশ্বনাথ যদি কিছু লোন চায় এখন আমার পক্ষে না বলা শক্ত হবে। লোকটা আমার মন জয়ের জন্য খুবই আদর আপ্যায়ন করেছে।"

এবার সুশীতল তাঁর ফেভারিট বিষয়, মানিব্যাগ থেকে শক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন। বড় এলাচ ও ভাজা মশলা চিবোতে-চিবোতে সুশীতল চট্টরাজ বললেন, 'টাকার লোভে মরা মানুষ বেঁচে ওঠার কথা বলেছি। আবার টাকার জোরে জ্যান্ত মানুষও খাতায় কলমে মরে যায়! বিশ্বনাথদা, আপনি দুঃখ করবেন না, আমার ডেথ সার্টিফিকেট পকেটে করে আমিই ঘুরছি।"

"সে আবার কী ব্যাপার?" আমরা হাঁ-হাঁ করে উঠি।

দাঁত বের করে হেসে উঠলেন সুশীতল চট্টরাজ। "সেবার গাড়ি চড়ে ওড়িশায় শিকার করতে গিয়ে বনের মধ্যে একটা লোককে গাড়ি চাপা দিয়ে বসলাম। এমনই রোগা প্যাং-পেঙে লোকটা যে সামান্য ধাক্কা সামলাতে পারল না, হাসপাতালে মারা গেল। তারপর বুঝতেই পারছেন, পুলিশের হাঙ্গামা। অ্যারেস্ট ফ্যারেস্ট করে মামলা-টামলা বাধিয়ে বসল। বুদ্ধি করে কেবল কলকাতার ঠিকানা না-দিয়ে ডোমজুড়ের গ্রামের ঠিকানা দিয়েছিলাম।"

"তারপর?" জিজ্ঞেস করলেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী।

"তারপর আর কি? খুব টেঁটি ম্যাজিসট্রেট—বড় একটা হাঙ্গামায় ফেলত আর কি। কলকাতায় এসে মোটা টাকা খরচ করে বাঘা উকিল পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। বললাম, যত টাকা লাগে লাগুক, কিন্তু আমাকে যেন হুট করে ওই উৎকট আদালতে ছুটতে না হয়। উকিল বলল, ক্যাশ একটু বেশি লাগবে। আমি বললাম, তা লাগুক। জিনিসপত্তরের দাম

বাড়ছে, ক্যাশ একটু বেশি না-ঢাললে চলবে কেন? তারপর আমার উকিল সরেজমিনে সব তদন্ত করে এলো। বলল, খুব ডিফিকালট্ কেস, ওই ম্যাজিসট্রেট আমাকে জেলে পাঠিয়ে ছাড়বে! তখন আমার উকিল মোক্ষম দাওয়াই-এর ব্যবস্থা করল।"

"দাওয়াইটা কী?" বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন।

"টাকা ফেললেই কিনতে পাওয়া যায়! ওই কোর্টে ডোমজুড়ের কাছাকাছি এক গ্রামের ডেথসার্টিফিকেট প্রোডিউস করা হলো, আসামী সুশীতল চট্টরাজ মারা গিয়েছে। বেমালুম মামলা খারিজ হয়ে গিয়েছে গতকাল। অবশ্য টেন থাউজেন্ড রুপি টোটাল লাগল। আমার পকেটেই আমার ডেথ সার্টিফিকেট রয়েছে।"

খুব হাসছেন সুশীতল চট্টরাজ, আর ওঁর অন্তহীন ক্ষমতার কথা ভেবে আমি বিস্মিত হচ্ছি।

সুশীতল চট্টরাজ এবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। একটু পরেই আকাদেমি না রাজভবনে ওঁর স্পেশাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

"বিশেষ অনুষ্ঠান যে বাকি রয়েছে," মনে করিয়ে দিলেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী।

"সে আরেক দিন হবে, হাতে আমার সময় নেই তেমন," বললেন সুশীতল চট্টরাজ।

"বেশি সময় লাগবে না—এখনই অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে। নিবেদন করবে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী।"

এবার মেয়েদের দিকে তাকালেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। বললেন, "আপনারা ইচ্ছে করলে পাশের ঘরে চলে যেতে পারেন। সবাই ওখানে একটু বিশ্রাম নিন।"

মেয়েরা অন্য ঘরে চলে যেতে সুশীতল ফিক করে হেসে উঠলেন। "মেন ওনলি অথবা অ্যাডাল্টস ওনলি অনুষ্ঠান মনে হচ্ছে।" খুশ মেজাজে সুশীতল এখনও ঠ্যাং নাড়াচ্ছেন।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী এবার উঠে দাঁড়ালেন। "এবার বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী নিবেদিত স্পেশাল ফাংশন শুরু হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানই আসল,

খাওয়াদাওয়াটা নিমিত্ত মাত্র। আপনাদের পাঁচজনকে না-পেলে এই ফাংশনের কোনো মূল্যই থাকত না। তা হলে ফাংশন শুরু করা যাক? আপনারা অনুমতি দিন।"

সুশীতল চট্টরাজ খুশ মেজাজে স্পেশাল স্টাইলে পা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, "সকলের হয়ে আমিই পারমিশন দিচ্ছি।"

এবার অবাক কাণ্ড। বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী হঠাৎ তাঁর কোমরের মোটা চামড়ার বেলট্ খুলে ফেললেন। বিশ্বনাথের চোখদুটো এবার বাঘের মতো জ্বলে উঠল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোঁ মেরে সুশীতল চট্টরাজকে সোফা থেকে তুলে নিয়ে শূন্যে কয়েক পাক ঘুরিয়ে মেঝেতে ফেলে দিলেন। তারপর আবার তুলে দাঁড় করিয়ে কানটা ধরে বিরাশি সিক্কার এক চড় লাগালেন।

কী হচ্ছে তা আমরা ঠিক মতো বোঝবার আগেই দ্বিতীয় চড় লাগালেন মত্ত হস্তীর মতো হিংস্র বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। বললেন, "এই পাজি ছুঁচোটাকে আপনারা চিনে রাখুন। লোকজন সাক্ষী রেখেই এই ছুঁচোটার কোমর ভেঙে দেব বলে আপনাদের আজ ডেকে এনেছি।"

সুশীতল চট্টরাজের ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার তখন অন্দরের নারীমহলেও প্রবেশ করেছে। মহিলারাও অজানা কোনো বিপদের আশঙ্কায় হুড়মুড় করে এখানে ছুটে এসেছেন। বিশ্বনাথ তখন কোমরের চামড়ার বেলট্ খুলে পটাপট পেটাচ্ছেন ওই সুশীতল চট্টরাজকে।

সুশীতল যেমনি মেঝে থেকে ওঠবার চেষ্টা করছেন অমনি আবার চামড়ার শপাং করে আওয়াজ হচ্ছে। "পাজী, ছুঁচো, তুমি ভেবেছ টাকার জোর এবং উকিলের বুদ্ধিতে সব কাজ সারা যায়।"

মহিলাদের দু'এক জন কাতর আর্তনাদ করে উঠেছেন। আমারও বুক ধুকপুক করছে। এমন অদ্ভুত ভোজসভায় আমি জীবনে উপস্থিত থাকিনি। আমি কাতরভাবে বললাম, "করেন কি? করেন কি বিশ্বনাথবাবু? লোকটা যে মরে যাবে।"

"হাড় ভেঙে, কোমর ভেঙে, মেরে ফেলবার জন্যেই তো এই স্পেশাল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে।"

বিশ্বনাথ এবার মহিলাদের দিকে তাকালেন। "মা লক্ষ্মীরা শুনুন এই

ছুঁচোর কাজ। আমার শালার মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া, একেবারে কচি মেয়ে, তার বাবা আমাদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন। এই ছুঁচোটা আমাকে দাদা বলে, বাড়িতে যাতায়াত করে। একদিন আমার গাড়ি খারাপ থাকায় ওর গাড়িতে কচি মেয়েটাকে কলেজে পাঠিয়েছিলাম। এই ছুঁচোটা তারপর ছোট্টমেয়েটাকে কী সব ভজিয়েছে, দু'দিন লুকিয়ে-লুকিয়ে কলেজের গেটে দেখা করেছে। ওকে আর্টিস্ট করে দেবে, না কী সব করবে, এই লোভ দেখিয়ে একদিন কলেজ থেকে বাইরে নিয়ে গিয়েছে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে। ছুঁচোটার বয়স পঁয়তাল্লিশ, আর এই মেয়েটার ষোলো। ছুঁচোটার বাড়িতে বউ আছে, ছেলেপুলে আছে। ভেবেছিল, আমি জানতে পারব না। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াই ওর পিসির কাছে সব বলেছে। আগামীকাল আবার বিষ্ণুপ্রিয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছে এই ছুঁচো। ছুঁচো মেরেই আমি হাত গন্ধ করব আপনাদের সামনে। ওর বড্ড বেশি বুদ্ধি, বড্ড বেশি টাকা, বড্ড উকিলের ওপর ভরসা। তাই সাক্ষীসাবুদ ডেকে এনে আমি নিগ্রহ করছি—ডোমজুড়ের রায়চৌধুরীদের রক্তটা কীরকম তার একটু টেস্ট পেয়ে যাক ওই ছুঁচো।"

আমি দেখলাম, ভয়ে কয়েকজন মহিলা কাঁদছেন। কিন্তু সুশীতল চট্টরাজের শ্যালকের স্ত্রী মোটেই কাঁদছেন না। তিনি বলছেন, "দাদা, ওকে ভালোভাবে একটু শিক্ষা দিয়ে দিন। আমার ননদের জীবনটা তছনছ করে দিয়েছে। মানিব্যাগের লোভ দেখিয়ে কত নিরীহ মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে, কেউ কিছু বলতে পারে না।"

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী বললেন, "মানুষের জন্যে মানুষের আইন, আর ছুঁচোদের জন্যে ছুঁচোদের আইন—এই নিয়ম না-করলে সংসার যে ছুঁচোয় বোঝাই হয়ে যাবে!" বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী আবার পিটতে শুরু করলেন সুশীতল চট্টরাজকে।

আর সুশীতল সত্যিই ছুঁচোর মতো কুঁই কুঁই করতে লাগলেন, "ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। আপনার পায়ে পড়ি। আর কখনও ওই কাজ করব না।"

"ছুঁচো, তোর মানিব্যাগ, তোর উকিল এখন কোথায়?" প্রচণ্ড বেগে আবার একটা থাপ্পড় মারলেন বিশ্বনাথ।

চোখের সামনে মানুষ খুন হতে চলেছে সম্পূর্ণ আদিম পন্থায়। এর

ফলাফল কী হতে পারে ভেবে আমি শিউরে উঠলাম।

"বিশ্বনাথবাবু প্লিজ, মানুষটাকে মেরে ফেলবেন না," আমি কাতর আবেদন জানাই।

"ছুঁচো মেরে ফেলবেন না তো কী করবেন?" সুশীতলকে আবার থাপ্পড় মারলেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। "ছুঁচো, তুমি গোপনে গোপনে যা করবার করো। আর বাপের ব্যাটারা সাক্ষীসাবুদ রেখে ছুঁচোকে মারে।"

কী আশ্চর্য। সুশীতলের শ্যালকের স্ত্রী তখনও বলছেন, "ওর কোমরটা চিরকালের মতো ভেঙে দিন। আমার ননদ আপনাদের কাছে চিরকালের জন্যে ঋণী হয়ে থাকবে।"

সুশীতলের কোমরটা সত্যিই বোধ হয় ভেঙে গিয়েছে। কারণ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না তিনি। ছুঁচোর মতো হামাগুড়ি দিয়েই সুশীতল চট্টরাজ এবার ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী চামড়ার বেলট্‌টা কোমরে জড়াতে-জড়াতে হুঙ্কার ছাড়লেন, "আবার আপনাদের বলছি, সবার জন্যে এক আইন হলে এই পৃথিবী চলবে না। মানুষের জন্যে মানুষের আইন এবং ছুঁচোর জন্যে ছুঁচোর আইন নেই বলেই ভারতবর্ষের এত দুর্গতি।"

সেদিন নতমস্তকে ডোমজুড় হাউস থেকে ফিরে এসেছি। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন এই আজব আপ্যায়নের কথা আমার মনে থাকবে।